শ্রীম-দর্শন

ভারতীয় সংস্কৃতি ও আত্মজ্ঞানের পথপ্রদর্শক
শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ

শ্রীম-র কথামৃত

[অষ্টম ভাগ]

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ



পরিবেশক :
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯, লেনিন সরণি, কলিকাতা-৭০০ ০১৩

প্রকাশিকা : শ্রীমতী ঈশ্বরদেবী গুপ্তা
সেক্রেটারী, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট
(শ্রীম ট্রাস্ট)
৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি
চণ্ডীগড়

দ্বিতীয় সংস্করণ
বিবেকানন্দ জন্মতিথি, ১৯৮০

জয়গুরু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌, ১৩/১ মণীন্দ্র মিত্র রো
কলিকাতা-৭০০ ০০৯ হইতে শ্রীঅমলেন্দু শিকদার কর্তৃক মুদ্রিত



সূচীপত্র

ভূমিকা

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের এক শ্রেষ্ঠ অবদান ধর্ম-সমন্বয়। এই ধর্ম-সমন্বয়ের বাণী তিনি সকলকেই শুনাইতেন—অন্তরঙ্গ-ভক্ত, বহিরঙ্গ-ভক্ত ও দর্শক-ভক্ত প্রভৃতি যে কেহ তাঁহার নিকট যাইত। ধর্ম-সমন্বয়ের এই উদার বাণী গ্রন্থাদি পড়িয়া বলেন নাই, অপর কাহারও নিকট শুনিয়াও বলেন নাই। বলিয়াছিলেন, নিজে অনুভব করিয়া, জগতের প্রধান প্রধান ধর্মগুলি সাধন করিয়া, নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া।

কেন তিনি এ সময় এই সর্বধর্ম-সমন্বয় নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিলেন? কি প্রয়োজন ছিল? ইহার উত্তর এই—বর্তমান সময়ে সায়েন্সের প্রভাবে সমস্তটি জগৎ এক হইয়া গিয়াছে। দূরত্ব, স্থান এবং সময় প্রায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। সমগ্র জগৎ যেন একটি পরিবারে পরিণত হইয়াছে। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এই সমগ্র জগৎ বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, পরিচ্ছদ, আহার এবং চিন্তা একটি সূত্রের দ্বারা গ্রথিত করিতে না পারিলে, বিবাদ বিসম্বাদ গুরুতর আকার ধারণ করিবে।

তিনি আবিষ্কার করিলেন, সেই সূত্রটি হইবে ধর্মসূত্র। জগতের প্রধান প্রধান ধর্মগুলি প্রচার করে,—মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি, অর্থাৎ আনন্দপ্রাপ্তি। মানুষমাত্রই আনন্দ চায়। আর, এই আনন্দের খনি হইতেছে জগতের পশ্চাতের মহাসত্যটি। এই মহাসত্যই আবার জীবের স্বরূপ—'স য এষঃ অণিমৈতদাত্ম্যং ইদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।' ঋষিরা ইহাও জানিতেন যে, ঐ আনন্দস্বরূপের এক বিন্দু আনন্দই জগতের সমগ্র বিষয়ানন্দের মূল। জগতের পশ্চাতের মহাসত্যটির অপর নাম আনন্দস্বরূপ—সচ্চিদানন্দ।

জীবের এই আনন্দস্বরূপতা-দ্বারা যদি বিভিন্ন দেশের লোককে ভ্রাতৃত্বসূত্রে বাঁধা যায়—সকলই একই স্থান হইতে উদ্ভূত, সকলেই

তাই একই পিতার সন্তান—তবে বিবাদ, কলহ, অশান্তি, অবিশ্বাস দূর হইতে পারে।

জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋক্‌বেদে আছে—'একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।' সত্যস্বরূপ আনন্দস্বরূপ বস্তুটি এক। সচ্চিদানন্দ এক। ভক্তগণ ইহাকে নানা নামে অভিহিত করে।

এই উদ্দেশ্য লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ নানা ধর্ম সাধনে প্রবৃত্ত হন এবং সিদ্ধিলাভ করিয়া ঐ প্রাচীন মহামন্ত্রের পূর্ণ সত্যতা উপলব্ধি করিয়া জগতে তারস্বরে ঘোষণা করিলেন, সকল ধর্মই সত্য। সকল ধর্মই এক একটি পথবিশেষ। সব পথ দিয়া ঈশ্বরের কাছে,—মানুষের নিজের স্বরূপের কাছে, যাওয়া যায়। যত মত তত পথ। মত পথ।

একটা পুকুরের অনেকগুলি ঘাট আছে। এক ঘাট হইতে আসিয়া হিন্দুরা বলিতেছে, জল লইয়া আসিয়াছি। মুসলমান অপর ঘাট হইতে আসিয়া সেই বস্তুকে বলিতেছে পানি। খ্রীস্টানরা আর এক ঘাট হইতে ঐ একই জিনিস আনিয়া বলিতেছে, ওয়াটার। একই জল তাহার বহু নাম।

দেশ কাল পাত্র ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করিয়াছেন। সব মতই পথ। কিন্তু মত ঈশ্বর নয়। একই সত্য বস্তুকে ঈশ্বর, গড্, আল্লা নানা নামে ভক্তরা বর্ণনা করিয়াছেন, যিনি, যেভাবে বুঝিয়াছেন।

বাড়ীতে মাছ আসিয়াছে। মায়ের পাঁচ ছেলে। মা এক এক জনকে এক এক রকম তরকারী রাঁধিয়া দিয়াছেন—ঝোল, ঝাল, কালিয়া, পোলাও, ভাজা, যাহার যেমন রুচি।

বিভিন্ন ধর্মের একই সমন্বয়-সাধনের সময় সর্বপ্রথমে তিনি হিন্দুদের শাক্তপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ক্রমে বৈষ্ণব পথ, পুরাণ পথ, তন্ত্র পথ, বেদান্ত পথ সাধন করিয়া একই মহাসত্যে পৌছিয়াছিলেন। তারপর বর্তমান জগতের আরও দুইটি প্রধান ধর্মপথ—খ্রীস্টান ও মুসলমান ধর্ম সাধন করিয়াও ঐ একই সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ মতকে তিনি হিন্দু ধর্ম-মতেরই প্রকারান্তর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই পৃথক ভাবে ইহার স্বতন্ত্র সাধন করেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের একজন অতি অন্তরঙ্গ অন্যতম পার্ষদ শ্রীম, কথামৃতের অমর লেখক। তিনি আবার শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট 'চাপরাস'-প্রাপ্ত একজন প্রধান বার্তাবাহক। জগদম্বার নির্দেশে তাঁহারই প্রদত্ত 'এককলা' শক্তি লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে লোকশিক্ষার জন্য 'ভাগবতে'র পণ্ডিতে'র ভূমিকায় তিনি গৃহস্থ সন্ন্যাসীরূপে গার্হস্থ্য আশ্রমে ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-দ্বারা অভিষিক্ত ব্রহ্মজ্ঞানের একজন বিশিষ্ট আচার্য শ্রীম। বহু ভক্ত তাঁহার নিকট ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ পাইয়া সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আবার শ্রীরামকৃষ্ণের অভিলষিত গৃহস্থাশ্রমের একটি 'মডেল' বা আদর্শ। গৃহস্থাশ্রমীর জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে শ্রীমর জীবনে পরিস্ফুট হইয়াছিল।

শ্রীমকে তাই শ্রীরামকৃষ্ণ উপরোক্ত ধর্ম-সমন্বয়ের উদার বাণী—যত মত তত পথ, বহুবার শুনাইয়াছিলেন। শ্রীগুরুর এই আদেশ ও উপদেশ কি ভাবে তিনি নিজ জীবনে পালন করিয়াছিলেন এবং ভক্তমণ্ডলীর নিকট পরিবেশন করিয়াছিলেন, তাহারই দুই চারিটি প্রমাণ আমরা এখন পাঠককে উপহার দিতেছি।

শ্রীম ভক্তসঙ্গে হিন্দুদের সকল সম্প্রদায়ের ধর্মমন্দিরে যাইতেন। আবার ব্রাহ্মসমাজের—আদি, সাধারণ ও নববিধান—এই তিনটি স্থানেই সর্বদা যাতায়াত করিতেন। সেইরূপ চার্চ, মসজিদ, বৌদ্ধবিহার, জৈন মন্দির, আর্য সমাজ, গুরুদ্বারায় সর্বদা যাতায়াত করিতেন।

১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে বড়দিনের সময় তাঁহার বাসস্থানের নিকটস্থ আমহার্স্ট স্ট্রীটের লং সাহেবের গীর্জায় (সেন্ট পল ক্যাথিড্রাল) গিয়াছিলেন ভক্তদের লইয়া। শ্রীম আবার ধর্মতলার মেথডিস্ট চার্চ ও অপর গীর্জাটিতেও ঐ সময় গিয়াছিলেন। তাঁহার সান্ধ্য সভায় ভক্ত-মণ্ডলীকে বলিয়াছিলেন, আমাদের কি এই উদার দৃষ্টি ছিল সকলকে আপন করিবার? ঠাকুর কৃপা করিয়া এই দৃষ্টি দিয়াছিলেন। ঠাকুর

বলিয়াছিলেন, 'ক্রাইস্ট, গৌরাঙ্গ আর আমি এক। তাই খ্রীস্ট-ভক্তগণ সব আমাদের আত্মীয় বলে মনে হয়।'

আবার ঐ বৎসরই ভগবান বুদ্ধের জন্মোৎসবে ত্রিশুভ দিবস বৈশাখী পূর্ণিমায় কপালিটোলা ও কলেজ স্কোয়ারের বৌদ্ধবিহারে সাধু ও ভক্তগণের সঙ্গে দর্শন করিয়াছিলেন।

১৯২২ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রার্থনায় ভক্তসঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন। বাহিরে আসিয়া বলিয়াছিলেন, এইখানে ঠাকুর কেশব সেনকে প্রথম দেখেন ধ্যানমগ্ন। তখন তাঁহার বয়স সাতাশ বৎসর। বলিয়াছিলেন, 'এই ছেলেটির ফাতনা ডুবেছে, বঁড়শীতে মাছ ঠোকরাচ্ছে।' এই আদি সমাজ আর একটি জিনিসের জন্য আমাদের মনকে টানে—বৈদিক সুরে বেদপাঠ আর বেদের ভাঙ্গা উচ্চাঙ্গের গান।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে প্রায়ই যাইতেন। বলিতেন, এখানেও ঠাকুর আসিয়াছিলেন। এখানকার গানও উদ্দীপন করে। অতগুলি ভক্ত একসঙ্গে ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন দেখিলে, ভগবানের কথা মনে হয়।

১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর জুম্মা মসজিদে দশ হাজার ভক্তকে একসঙ্গে নামাজ পড়িতে দেখিয়া খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন।

১৯২৫ সালে ১লা ও ৩রা জানুয়ারী মেছুয়াবাজার, হ্যারিসন রোড, ক্রশ স্ট্রীট ও কটন স্ট্রীটের চারিটি শিখ গুরুদ্বারা দর্শন করিয়াছিলেন। মেছুয়াবাজারের গুরুদ্বারার বাহিরে আসিয়া সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াইয়া অন্তেবাসীর কানের কাছে মুখ রাখিয়া বলিয়াছিলেন, আহা, ঠাকুর এমনি impetus (অনুপ্রেরণা) দিয়ে গিয়েছেন যে, এমন সব স্থানেও আসতে হচ্ছে আত্মীয়ের মত। ঐ impetus-টি (অনুপ্রেরণাটি) এই—সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। কটন স্ট্রীটের গুরুদ্বারায় যুক্ত করে আরতি দর্শন করিয়া 'আবদাস' শুনিয়াছিলেন। ক্রশ স্ট্রীটের বড়সঙ্গতে বসিয়া 'সুখমণির' পাঠ শুনিয়াছিলেন: সাধ কী মহিমা বরনোই কৌওন্ু প্রাণী। নানক

সাধ কী সোভা প্রভ্ মাঁহি সমানি॥ সাধ কী মহিমা বেদ ন জানহিঁ। নানক সাধ প্রভ ভেদু ন ভাঈ॥

শ্রীম আবার ঐ সান্ধ্য সভায় বলিয়াছিলেন, আমরা কাল চার জায়গার গুরুদ্বারায় গিছলাম। গুরু গোবিন্দসিংজীর জন্মোৎসব চলছে। আহা, কি সুন্দর করে সাজিয়েছে! একখানে দেখলাম ফুলের অপূর্ব সাজ। কত ভক্তি শ্রদ্ধাতে এটি হয়! গুরুদ্বারাই বটে! 'গুরু' মানে ভগবান। গুরুর উপর ভক্তি হলে বুঝতে হবে ভগবানের উপর ভক্তি এল। গুরু আর ইষ্ট অভেদ।

ঠাকুর আমাদের নানা স্থানে নিয়ে যাচ্ছেন। কেন? দেখাতে, ঈশ্বরই এইসব হয়ে রয়েছেন। ঠাকুর বলেছিলেন, আমি দেখছি মা-ই সব হয়ে আছেন। আমাদের চোখে এই চশমাটি পরিয়ে দিয়েছেন। তাই সব লাল দেখছি। সব আপনার বলে মনে হচ্ছে। কাল গুরুদ্বারায় গিয়ে মনে হয়েছিল যেন অমৃতসরে গেছি। ওখানে 'দরবার সাহেবে' দিনরাত উৎসবানন্দ। কি জ্ঞান ভক্তি দিয়ে মাতিয়ে রেখেছেন তিনি! দিনরাত পূজা পাঠ, আরতি ভজন। আবার কড়া প্রসাদ বিতরণ। পঞ্চভূতে জীব আবদ্ধ হয়। আবার তা দিয়েই মুক্ত হয়। তাঁর দিকে মোড় ফিরিয়ে দিলেই হলো। রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ—এই সবগুলি দিয়ে তাঁর পূজা। আহা, কি রকম সব ফুলের সাজ দেখা গেল! মানুষ যা ভালবাসে তাই তাঁকে দেওয়া। তাঁকে দিয়ে ভোগ করলে, প্রসাদরূপে ক্রমে মুক্তি হবে। নিজে ভোগ করলে বন্ধন বাড়বেই খালি।

১৯২৪ খ্রীঃ, ১৩ই আগস্ট, শুক্লা চতুর্দশীর রাত্রিতে আটটার সময় মর্টন স্কুলের সিঁড়ির ঘরে বসিয়া ভক্তদের শ্রীম বলিতেছেন—নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ থেকে ভাদ্রোৎসবের নিমন্ত্রণ এসেছে। আগামী কাল থেকে উৎসব আরম্ভ হবে। আপনারা যাবেন। ওখানে ঠাকুরের দৈবী স্পর্শ রয়েছে কিনা! কত বার এসেছেন এখানে। এটি একটি তীর্থ হয়ে রয়েছে। দর্শন করলে উদ্দীপন হয়। কেশববাবুকে কত ভালবাসতেন ঠাকুর। তাঁর ভিতর ঠাকুর নিজের উচ্চ উদার ভাব

ঢুকিয়ে দিছলেন নিজে। তাঁর জন্যই নববিধানের ভক্তগণ 'মা মা' বলে পরমব্রহ্মের উপাসনা করেন। ঠাকুরের ভক্ত আপনারা গেলে ঐ ভাব আরও জাগ্রত হয়ে উঠবে।

এই উৎসবে যাওয়ার অনিচ্ছা প্রকাশ করায় শ্রীম বড় জিতেনকে তিরস্কার করিতেছেন। বলিতেছেন, ঠাকুর রামবাবুকে বলেছিলেন, যেখানে ভগবানের কথা হয়, তাঁর উৎসব হয়, সেখানে বিনা নিমন্ত্রণেও যাওয়া যায়। আবার আছে, 'নাহং বৈকুণ্ঠে তিষ্ঠামি যোগীনাম্ হৃদয়ে ন চ। যত্র মদ্ভক্তাঃ গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।'

বড় জিতেন বলিলেন, ওদের কথা ভাল লাগে না। ঠিক ঠিক বলতে পারে না। শ্রীম উত্তেজিত হইয়া উত্তর করিলেন, তাঁকে ঠিক ঠিক কে বলতে পারে? I challenge it. (আমি এর প্রতিবাদ করছি।) তা কি কেউ পারে? তাঁকে প্রকাশ কেবল তিনিই করতে পারেন ঠিক ঠিক। অন্য কেউ নাই ত্রিভুবনে। 'ব্রহ্ম' উচ্ছিষ্ট হয় না, এই কথা ঠাকুর বলেছিলেন বিদ্যাসাগর মশায়কে।

ঠাকুরের জীবন্ত sparks (অগ্নিস্ফুলিঙ্গ) কেশববাবুর ভিতর ঢুকেছে। ও থেকে তাঁর শিষ্যদের কাছে এসেছে। Dim (হীনপ্রভ) হলেও তা ঐ অমৃতের কণিকা।

কলিকাতা সহরে বিভিন্ন মতের ভক্তগণ ঈশ্বরের জন্য কে কি করিতেছে শ্রীম তাহা একসঙ্গে দেখিতে চাহিতেন। কিন্তু তাহা তো সম্ভব নয়। তাই তাঁহার নিজের ভক্তগণের দ্বারা একটা এজেন্সি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ভক্তগণ ভিন্ন ভিন্ন মতের উপাসনা দেখিয়া আসিয়া তাঁহার নিকট বর্ণনা করিতেন।

অষ্টম ভাগ শ্রীম-দর্শন ঠাকুরের ধর্ম-সমন্বয়ের এই অমৃতময় উদার বাণী বহন করিতেছে—শ্রীমর জীবনে, কাজে ও বাণীর মাধ্যমে। এই উদার বাণী গ্রহণ করিলে ব্যক্তি, সমাজ, দেশ ও বিদেশ, সারা জগৎ শান্তি-সুখ লাভ করিতে পারে। এবারের উপহার ধর্মের এই উদার অমৃত বাণী।

প্রথম অধ্যায়

পরিক্রমা

১

গদাধর আশ্রম, ভবানীপুর। ব্রাহ্ম মুহূর্ত। এখন চারটা। ঠাকুরের মঙ্গল আরতি হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরের ফটো গরম বস্ত্রে অর্ধাবৃত বেদীর উপর স্থাপিত দক্ষিণাস্য। পূজারীর আসন পূর্বাস্য। গৃহে একটি ক্ষীণপ্রভ বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছে, নীলাভ। ধূপের সুগন্ধে চারদিক আমোদিত। অনেক সাধু ও ভক্ত ধ্যানমগ্ন। কেহ ঠাকুরঘরে, কেহ ধ্যানঘরে। ধ্যানঘর ঠাকুরঘরেরই দক্ষিণাংশ একটি রেলিং দিয়া বিভাগকৃত। ঠাকুরঘরে একটি প্রশান্ত গম্ভীর ভাব বিরাজিত। শ্রীম পার্শ্ববর্তী উত্তরদিকস্থ নিজ কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া ঠাকুরঘরে ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন। তারপর যুক্তকরে ধ্যান-মূর্তিগুলিকে একে একে প্রণাম করিতেছেন। এইবার নিজ কক্ষে ফিরিয়া গেলেন।

এখন সওয়া ছয়টা। সাধু ভক্তগণ একে একে শ্রীমর ঘরে আসিয়া প্রণাম করিতেছেন। আজ পৌষ সংক্রান্তি। শেষ রাত্রি হইতে বৃষ্টি হইতেছে। বঙ্গবাসীর সংখ্যা অধিক হইলেও ভারতের সকল প্রদেশের হিন্দু নরনারী বৃষ্টিতে ভিজিয়া আদি গঙ্গায় স্নান করিতেছে। 'গঙ্গামায়ী কি জয়'—মুহুর্মুহু এই ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত।

শ্রীম বারান্দায় দাঁড়াইয়া এই দেবদৃশ্য অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন পশ্চিমাস্য। সম্মুখেই গঙ্গা। শ্রীমর মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত, নয়নযুগল স্থির, অন্তরে নিবদ্ধ।

শ্রীমর সম্মুখে দলে দলে লোক আসিতেছে, দলে দলে যাইতেছে। অবিরাম। পথঘাট সিক্ত, কোথাও কর্দমাক্ত। বৃষ্টির প্রতি কাহারো ভ্রূক্ষেপ নাই।

শ্রীম মধুর কণ্ঠে সাধু ও ভক্তগণকে ডাকিয়া আনিয়া এই পবিত্র দৃশ্য দেখাইতেছেন। বলিতেছেন, আনন্দে আপ্লুত হইয়া, দেখুন দেখুন, ধর্ম কেমন মূর্তি গ্রহণ করেছে আজ! দেহের দিকে কারো লক্ষ্য নাই। ভগবদ্ভাবে সব বিভোর।

এইবার করুণ কণ্ঠে বলিতেছেন—ধর্মের জন্য, ভগবানের জন্য এত কষ্ট অম্লান বদনে সহ্য করছে! একে শীতকাল, তার উপর সকাল বেলা গঙ্গাস্নান, আবার অনবরত বৃষ্টিতে ভেজা। কিন্তু এতে যে অসুখ করবে!

শ্রীমর বদনমণ্ডলে দুইটি ভাবের খেলা চলিতেছে যুগপৎ—আনন্দ ও আশঙ্কা। ধর্মের উন্মাদনা দেখিয়া আনন্দ, আর অসুখের সম্ভাবনায় আশঙ্কা।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, দিঙ্‌মণ্ডল অন্ধকারাবৃত। শ্রীম স্বীয় কক্ষের মেঝেতে পূর্ব হইতে পশ্চিমে আনমনে পাদচারণ করিতেছেন। ধীরে ধীরে একটি ভক্তকে বলিতেছেন, মনটা দক্ষিণেশ্বর-দক্ষিণেশ্বর করছে। কিন্তু দিন দেখে সাহস হয় না। কপালে ঘটবে কিনা কে জানে!

পূর্বাকাশ ক্রমশঃ মেঘমুক্ত হইতে লাগিল। পশ্চিম আকাশে মেঘ সংক্রামিত হইতেছে। শ্রীম আর গৃহে থাকিতে পারিলেন না। একটি সেবককে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। এখন বৃষ্টি নাই, প্রায় আটটা। উভয়ে ট্রাম স্ট্যাণ্ডের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। একখণ্ড চলন্ত মেঘ আবার সূর্যকে ঢাকিতেছে। সেবককে উহা দেখাইয়া বলিলেন—দেখলে, মেঘের জোর কত বেশী সূর্য থেকে! কেমন করে সূর্যকে ঢেকে দিলে। তেমনি মায়া। অবিদ্যা মায়াতে এমনি করে ঢেকে দেয় মানুষের বিচারবুদ্ধিকে। কৃপা-পবনে মায়ামেঘ উড়িয়ে দিলে তবে সূর্য-দর্শন হয়। সূর্য মানে ভগবান।

একটু অগ্রসর হইয়া সেবককে বলিলেন, তুমি মন্দিরের নিকট স্ট্যাণ্ডে meet (দেখা) ক'রো। আমি ট্রামে আসছি। শ্রীম ট্রামে চলিতেছেন। সেবক দ্রুত পদক্ষেপে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

শ্রীম ট্রাম হইতে অবতরণ করিয়া গঙ্গাতীরস্থ রাস্তায় দক্ষিণমুখী মন্দিরের দিকে চলিতে লাগিলেন। রাস্তার দুই দিকের বিপণী-শ্রেণী দেখিতে দেখিতে এদিক ওদিক হেলিয়া দুলিয়া শ্রীম ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেবক শ্রীমর অলক্ষ্যে একটু দূরে পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহার গতিবিধি অবলোকন করিতেছেন। তিনি দেখিলেন, যেন একটি বালক আনন্দে চলিতেছেন। মুখমণ্ডলে প্রস্ফুটিত বিস্ময় ও কৌতুহল। তিনি কি সর্বভূতে লীলাময়কে দেখিতেছেন ?

শ্রীম একবার দেখিতেছেন ডানদিকের ছেলেদের খেলনার দোকান। আবার দেখিলেন বাম হাতের নানাবিধ মিষ্টান্নপূর্ণ খাবারের দোকান। এবার দেখিতেছেন নানা রঙ্গের বস্ত্রের দোকান, তারপর পাঁপর-পকোড়ার দোকান, মাটির নির্মিত শিব, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি দেব-দেবীর দোকান। সকল দোকানের সকল দ্রব্য সকল মানুষ, দোকানদার, যাত্রী, পথিপার্শ্বস্থ গাভী, কুকুরাদি সকল জীব, সকল দ্রব্য, সকল দিক, বায়ুমণ্ডল, সূর্য প্রভৃতি সকলের ভিতর কি লীলাময়কে দর্শন করিতেছেন—'সর্বভূতাশয়স্থিতঃ' আত্মাকে ?

শ্রীম সেবককে দেখিতে পাইলেন। নিমেষের মধ্যে শ্রীমর ঐ আনন্দময় বালকভাব বিদূরিত হইল। তিনি একটি সাধারণ ভক্তের মত মায়ের মন্দিরের দিকে আগাইয়া চলিতে লাগিলেন। সেবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, কতক্ষণ এসেছ ? অনেকক্ষণ, সেবক সবিনয়ে উত্তর করিলেন। আমাকে দেখতে পেয়েছিলে ? আজ্ঞে হাঁ, সেবক বলিলেন। লুকাইয়া কাজ করিবার সময় যদি অপর কেহ দেখিতে পায়, তখন মানুষের মুখে যে সঙ্কোচের ছায়াপাত হয়, শ্রীমর মুখেও সেই সঙ্কোচের প্রতিবিম্ব—কিন্তু, মুখমণ্ডল আনন্দময়।

কালীঘাট। শ্রীম মা কালীর মন্দিরের প্রাচীরের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন—উত্তর-পূর্ব কোণে পুকুর-পাড়ে। শ্রীমর আদেশে সেবক পুকুর হইতে হাতে করিয়া জল আনিয়াছেন। শ্রীম সেই জল স্পর্শ করিয়া মুখে ও মাথার উপর ছিটাইয়া দিলেন।

শ্রীম উত্তর-পূর্ব ফটক দিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। মন্দির ডান হাতে রাখিয়া পরিক্রমা করিতেছেন। মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্বদ্বারে আজ অসম্ভব ভীড়। আজ মকর সংক্রান্তি, তাই। মন্দিরের দক্ষিণ দরজা ও নাটমন্দিরের মধ্যবর্তী গলিতে দাঁড়াইয়া চলমান দর্শকগণের ফাঁক দিয়া মাকে দর্শন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অকৃতকার্য হইলেন। তাই গলির বাহিরে আসিয়া নাটমন্দির ডান হাতে রাখিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছেন। দক্ষিণ দিকের নবনির্মিত শিবমন্দিরের মেঝেতে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন নিচ হইতে। এবার বলির কাষ্ঠ ডান হাতে স্পর্শ করিয়া সেই হাত স্বীয় মস্তকে ধারণ করিলেন। শ্রীম আনন্দময়, কিন্তু গম্ভীর।

এইবার শ্রীম নাটমন্দিরের পশ্চিম দিকে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আদি গঙ্গায় যাওয়া স্থির হইল। এই রাস্তা ধরিয়া চলিতেছেন। অঙ্গনে রাস্তার ডান দিকে গোবিন্দজীর মন্দির। এখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, দর্শন করিবেন। একটি ভক্ত উকিল আসিয়া প্রণাম করিলেন। নাম নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাড়ী ২৯ নম্বর নকুলেশ্বর তলা। ফিরিবার পথে তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন।

শ্রীম গোবিন্দজীকে দর্শন করিয়া ফিরিয়া সেবককে পাঠাইয়া দিলেন। তারপর সেবক ফিরিয়া আসিলে উভয়ে গঙ্গার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ক্রসিং পার হইলে বাম হস্তের বাড়ীর সম্মুখে খুব ভীড় দেখিয়া দাঁড়াইলেন। মনে করিলেন এখানে ঠাকুর-দেবতার মন্দির, তাই অত ভীড়। একটি ১৮।১৯ বছরের যুবক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনারা কি চান?' শ্রীম উত্তর করিলেন, এখানে ঠাকুর আছেন? যুবক বলিল, 'আজ্ঞে, হাঁ।' এখানে ঠাকুররা (পাণ্ডারা) থাকেন। শ্রীম বলিলেন, না, ভগবান—ঠাকুর। যুবক এইবার বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া উত্তর করিল, 'আজ্ঞে না। তা'হলে না, এখানে নেই। এই সামনে আছে।'

শ্রীম গঙ্গার দিকে চলিতেছেন। এই বাড়ীর পরের বাড়ীটি

দেখাইয়া সেবককে বলিলেন, এখানে মা এসে থাকতেন। শ্রীম যুক্তকরে প্রণাম করিতেছেন।

২

গঙ্গার ঘাটে আজ প্রচণ্ড ভীড়। লোক সব স্নান করিতেছে। উত্তরের দিকের সিঁড়ি বাহিয়া শ্রীম ঘাটে নামিতেছেন। দশম সিঁড়িতে উপুড় হইয়া গঙ্গা জল স্পর্শ করিলেন। তারপর বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছেন। অর্ধ ঘণ্টা প্রায় সেবক তীরে দাঁড়াইয়া শ্রীমর পাদুকা রক্ষা করিতেছেন। তীরে উঠিয়া শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন। সেবক গঙ্গা স্পর্শ করিতেছেন আর ভাবিতেছেন, এই জল স্পর্শে কি লাভ? সাক্ষাৎ গুরু অবতারের পার্ষদ বলিয়াছেন তাই স্পর্শ করিতেছি, সর্বদাই করি লোকের দেখাদেখি। হয়তো বা বস্তুগুণ থাকিবে, কোনও অলৌকিক শক্তি থাকিবে। নচেৎ কেন শ্রীম নিজেও করিলেন, আমাকেও বলিলেন। সেবক আরও ভাবিতেছেন, এই একটু পূর্বে দেখিলাম শ্রীম পুকুরের জল মাথায় ছিটাইতেছেন মন্দির-অঙ্গনে প্রবেশ করিবার পূর্বে। তিনি কি পুকুরের জল ও গঙ্গাজল সমদৃষ্টিতে দেখেন?

শ্রীম ঘাটের উপর দক্ষিণ দিকের ধর্মশালায় প্রবেশ করিলেন। মহিলা-মহলের সকলের দক্ষিণের ঘরটি দেখিয়া প্রণাম করিলেন। সেবককে বলিলেন, এই ঘরেও মা ঠাকরুন থাকতেন।

ধর্মশালা হইতে বাহির হইয়া শ্রীম দক্ষিণের রাস্তা ধরিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলেন। সম্মুখে একটি ষোড়শী দেখিয়া অমনি প্রত্যাবর্তন করিলেন।

সপ্ততিবর্ষীয় এই বৃদ্ধ মহর্ষি। তাঁহার কি ভয়? বুঝি বা সঙ্গের সেবকের শিক্ষার জন্য এরূপ আচরণ করিলেন! তিনি সর্বদা concrete example (বাস্তব দৃষ্টান্ত) দিয়া শিক্ষা দেন ভক্তদের। যুবক ব্রহ্মচারীদের স্ত্রীলোক দর্শন করিতে নাই—ইহাই কি শ্রীমর নির্বাক উপদেশ?

শ্রীম ধর্মশালার সম্মুখ দিয়া চলিতেছেন পূর্বমুখীন। সম্মুখে একজন ভিখারী দাঁড়াইয়া আছে ধর্মশালার উত্তর-পশ্চিম কোণে। সেবককে শ্রীম কহিলেন, একে একটি পয়সা দাও।

এই স্থানেই সুযোগ বুঝিয়া সেবক একটি সংবাদ শ্রীমকে দিলেন। "দক্ষিণেশ্বরের কালী-বাড়ীতে ভক্তগণ আজ বোধ হয় বনভোজন করবেন। আপনাকেও তাঁরা ওখানে পেতে ইচ্ছা করেন।" শ্রীম উত্তর করিলেন, 'বোধহয়' কি?—সেবক বলিলেন, "এঁর কথা ঠিকই। রাত্রি থেকে বৃষ্টি হওয়ায় সংশয়, যদি বা, না হয়।" শ্রীম অনুযোগ দিয়া বলিলেন, "তাহলে আগে বলা উচিত ছিল—কালই বললে ভাল হতো।" সেবক বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, "শীত কাল, রাত্রি থেকে বৃষ্টি হচ্ছে দেখে আমি বলতে সাহস করি নি, পাছে গিয়ে অসুখ হয়। এখন দেখছি মেঘ কেটে গেছে, রৌদ্র দেখা দিয়েছে, তাই বলতে ভরসা হলো।"

আদি গঙ্গার ঘাট হইতে শ্রীম মন্দিরে আসিতেছেন। ক্রসিং-এর কাছে ডান হাতে যে ঘরে মা ঠাকরুন থাকিতেন তাহার সম্মুখে আসিয়া বালকের মত বলিতেছেন, কই বেগুনী, ফুলুরী কই? সেবক ডান হাতের দোকান দেখাইয়া উত্তর করিলেন, আজ্ঞে, এইখানেই আছে। ন্যাও দু' পয়সার, শ্রীম বলিলেন। এ যে ঠাণ্ডা—গরম নয়, সেবক বলিলেন। শ্রীম উত্তর করিলেন, তা হোক, আজের তো? আজ্ঞে আজেরই, দোকানদার বালক জানাইল। তাই দু'পয়সার বেগুনী ফুলুরী খরিদ করা হইল।

ঠাকুর বলিতেন, ভক্তদের মেলায় তীর্থে গেলে বেগুনী ফুলুরী খেতে হয়। শ্রীম গুরুদেবের সেই কথা আজও অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন।

শ্রীম পূর্ব দিকে চলিতে লাগিলেন। ক্রসিং পার হইলে সেবক বলিলেন, এই বাঁ হাতের রাস্তায় শীঘ্র ট্রামে যাওয়া যায়। না, এদিক দিয়েই যাওয়া যাক মন্দিরের ভেতর দিয়ে। মাকে দেখতে

এসেছি, তাই এ রাস্তায় যাওয়াই ভাল। এই বলিয়া শ্রীম মন্দির-অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। সেবক বুঝিলেন, মাকে না দেখিয়া যাইবেন না। ভীড়ের জন্য দেখিতে পান নাই। তাই আবার চেষ্টা করিবেন। সিদ্ধ সঙ্কল্প নিশ্চয় পূর্ণ হইবে।

মন্দিরে আরোহণ করার দক্ষিণ-পশ্চিম সোপানের নিকট শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন। এখন ভীড় কিছু কমিয়াছে। সেবককে বলিলেন, তুমি নিচে দাঁড়াও, এই রইল জুতো। আমি ওপরে উঠে পরিক্রমা করে আসি। সেবক বলিলেন, ওপরে ভীষণ ভীড়, ঠেলাঠেলি; পরিক্রমা করা খুবই কষ্টকর হবে।" তা হলে নিচেই পরিক্রমা করা যাক্—বলিয়া একাই পরিক্রমা করিতে লাগিলেন। মন্দির শ্রীমর ডান দিকে।

পূর্ব দিকের প্রধান দরজায় ভীড় একটু কম দেখিয়া প্রবেশ-দক্ষিণা তুইটি পয়সা দিয়া শ্রীম মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। রেলিং-এর পাশে দাঁড়াইয়া যুক্তকরে জগদম্বাকে প্রণাম ও প্রার্থনা করিলেন। বাহিরে আসিয়া নাটমন্দির ও মায়ের মন্দিরের মধ্যবর্তী গলিতে দাঁড়াইয়া মন্দির ভিত্তিতে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিতেছেন। ভূমিষ্ঠ প্রণাম না করিলে মন প্রসন্ন হইতেছে না, অথচ মন্দিরের অভ্যন্তরে বা বারান্দায় উহা করা অসম্ভব ভীড়ের জন্য—তাই, শ্রীম বাহিরে আসিয়া ঐ সঙ্কল্প করিলেন।

অন্তেবাসী এই সব দৃশ্য শ্রীমর পাদুকার কাছে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন আর ভাবিতেছেন, ঠাকুরই তো ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি, তিনিই মন্দিরস্থিত মা। শ্রীম সেই ব্রহ্মশক্তির প্রিয় সন্তান, চিহ্নিত পার্ষদ, 'চাপরাস'-ধারী 'ভাগবতে'র পণ্ডিত; কি করিয়া মা সন্তানের আকুল বাসনা অপূর্ণ রাখিবেন? তাই এই দারুণ ভীড়ে মা মন্দিরে লইয়া গেলেন আর দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিলেন। চোখে আঙ্গুল দিয়া এই সব অঘটন ঘটনা আমাদিগকে দেখাইতেছেন, তবু আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস হয় কই? বিশ্বাস আসে যায়, স্থায়ী হয় না। জীব-প্রকৃতি তুর্বার।

এইবার শ্রীম সেবককে বলিলেন, যাও. তুমি গিয়ে দর্শন করে এস। কৌতুক রসে আপ্লুত হইয়া মধুর অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে সেবককে কহিতেছেন, মাকে এমনি দর্শন করা যায় না। ছু'পয়সা, আবার থাক্কা—এ ছাড়া মাকে দর্শন করা যায় না। সেবক জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় দাঁড়াইয়া মাকে দর্শন করিব—রেলিং-এর পাশে দাঁড়াইয়া, কিম্বা রেলিং-এর ভিতরে গিয়া মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া? না, রেলিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে ছু' পয়সা দিয়ে দেখে এস। ভিতরে গেলে দক্ষিণা ছ'পয়সা। সেবক দশ মিনিটের ভিতর মাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া আসিলেন। মায়ের গলায় আজ জবাফুলের মালার স্তূপ, মস্তকে উজ্জ্বল স্বর্ণমুকুট।

শ্রীম নাটমন্দিরে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন মায়ের সম্মুখে। কিয়ৎক্ষণ পরে মাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। উঠিয়া পুনরায় মায়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। নাটমন্দিরের উত্তর প্রান্তে যেখানে দাঁড়াইয়া ভক্তগণ মায়ের ঝাঁকি দর্শন করেন, তাহারই সংলগ্ন পূর্বদিকের আর্চের কাছে দাঁড়াইয়া পুনরায় যুক্ত করে প্রণাম করিলেন।

শ্রীমর এই বালকের মত চঞ্চল ব্যবহার দেখিয়া সঙ্গী সেবক বিস্ময়ে পূর্ণ হইলেন। ভাবিতেছেন, এই কি প্রেম-ভক্তির লক্ষণ! লোকে তো একবার প্রণাম করিয়াই দর্শন ব্যাপার শেষ করে। কিন্তু মায়ের এই বৃদ্ধ আপ্তকাম মহর্ষির বুঝি দর্শনের আকাঙ্ক্ষা অফুরন্ত। জনম ভরিয়া দেখিলেও তৃপ্ত হয় না মায়ের অন্তরঙ্গ বালকগণ। এই জন্যই বুঝি, মায়ের নরদেহে অবতার রূপকে দেখিয়া শ্রীমর তৃপ্তিলাভ হইত না।

এইবার শ্রীম সেবকের স্কন্ধ ধরিয়া নাটমন্দির হইতে অবতরণ করিতেছেন পশ্চিমের সিঁড়ি বাহিয়া।

শ্রীম শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দাঁড়াইয়া আছেন, সঙ্গে সেবক। পুনরায় অর্ধ পরিক্রমা করিয়া মন্দির প্রাঙ্গণের বাহিরে আসিবেন এই ইচ্ছা। তাই গলির মুখে উত্তরমুখী হইয়া শ্রীম ও

সেবক চলিতে লাগিলেন। সেবক অগ্রে চলিতেছেন—শ্রীমর উপর ভীড় আসিয়া না পড়ে তাই। সেবকের সম্পূর্ণ মনোযোগ পিছনে শ্রীমর উপর। সেবক ও শ্রীম ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে চলিতেছেন ভীড় বাঁচাইয়া। হঠাৎ সেবককে আকর্ষণ করিয়া শ্রীম সেবকের মুখ স্বীয় বক্ষে স্থাপন করিয়া দুই মিনিট তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সেবক বিস্ময়াবিষ্ট।

যখন সেবক আলিঙ্গনমুক্ত হইলেন, তিনি দেখিতে পাইলেন নাটমন্দিরের পাশ দিয়া চার পাঁচটি যুবতী কুমারী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়াছে অর্থলোভে শেঠদের পিছনে। কুমারীগণ পরিক্রমার রাস্তার উল্টা দিক হইতে দৌড়াইয়া আসিতেছিল। সংকীর্ণ গলি, তাহাতে আবার বিপরীত হইতে বেগে আসা। কুমারীরা পাছে সেবকের উপর আসিয়া পড়ে, তাই কি শ্রীমর এই অদ্ভুত আচরণ? সেবক যুবক ব্রহ্মচারী।

Example is better than precept—মুখে না বলিয়া আচরণে শিক্ষা অধিকতর ফলপ্রসূ—এই চিরন্তনী নীতি শ্রীম সারা জীবন অতন্দ্রিত হইয়া পালন করেন। তিনি স্বীয় গুরুদেব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উত্তরাধিকারসূত্রে এই অমূল্য সম্পদ লাভ করিয়াছেন। তাই শ্রীম সর্বদা বলিতেন, হাজার লেকচারে যে কাজ না হয়, একটি মাত্র নির্বাক আচরণে—concrete exampleএ, তার চাইতে লক্ষ গুণ বেশী কাজ হয়। তাই আজ তিনি এই নির্বাক গভীর অর্থপূর্ণ আচরণ দ্বারা ব্রহ্মচারীর একটি শ্রেষ্ঠ কর্তব্য শিক্ষা দিলেন। পক্ষী-জননী নিজ পক্ষপুট দ্বারা স্বীয় সন্তানকে রক্ষা করে।

৩

মন্দির অর্ধ পরিক্রমা করিয়া যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই দ্বার দিয়া শ্রীম নির্গত হইলেন। সারা রাত্রি বৃষ্টি হইয়াছে। আশে পাশের ভূমি সব কর্দমাক্ত, তাই প্রবেশদ্বারের

সোপানও কর্দমাক্ত। শ্রীম দক্ষিণ হস্তে সেই কর্দম লইয়া আপন ললাটে তিলক অঙ্কিত করিলেন। সেবক নির্বিচারে উহার অনুকরণ করিলেন।

সাধারণ মানুষের মন নানা সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান। তাই তাহার চিত্ত চিন্তার অরাজকতায় শতধা বিক্ষুব্ধ। সেই মানুষই যখন কোন লোকোত্তর মহাপুরুষের নির্বাক আচরণ দেখে তখন সে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অভিভূত হইয়া সেই দৈবী আচরণের অনুকরণ ও অনুসরণ করে পূর্বজন্মার্জিত শুভ সংস্কারের অলক্ষ্য প্রভাবে।

নকুলেশ্বর মন্দির। তাহার সংলগ্ন দক্ষিণ পার্শ্বে রাজপথে শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন পশ্চিমাস্য। সেবককে বলিলেন, তোমার কাছেও পয়সা নাই, আমার কাছেও নাই—সবই টাকা। এখন কি করে শিব দর্শন হয়? পয়সা না দিলে বুঝি ঢুকতে দেয় না।—এই বলিয়া রাজপথে চলিতে লাগিলেন কলিকাতা যাইবার জন্য ট্রাম-স্ট্যাণ্ডের অভিমুখে। সেবক পশ্চাতে। ধীর পদক্ষেপে চলিতেছেন আর কি ভাবিতেছেন। প্রায় পঞ্চাশ পা অগ্রসর হইয়াছেন তখন সেবককে বলিলেন, শিব দর্শন হলো না। সেবক বলিলেন, পাণ্ডাদের কাছে চেঞ্জ (খুচরা) থাকতে পারে, ভাঙ্গিয়ে নেওয়া যাবে। উভয়ে ফিরিয়া গেলেন।

তিনজন পাণ্ডা প্রবেশদ্বারে উপবিষ্ট। তাহাদের বয়স পনের, বিশ ও ত্রিশ। শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের দু'জনের কত লাগবে? দু'জনে চার পয়সা লাগবে দ্বারদক্ষিণা, পাণ্ডারা বলিল। সেবক একটি পাঁচ টাকার নোট বাহির করিলেন। ইহার চেঞ্জ পাওয়া যাইবে না শুনিয়া পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিলেন। পাণ্ডারা বলিল, এরও চেঞ্জ নাই। তবে আর কি হবে? চল এখান থেকে প্রণাম করে যাই—শ্রীমর এই কথা শুনিয়া বয়োজ্যেষ্ঠ পাণ্ডা সঙ্গীদের বলিল, এঁদের দু'জনকে ছেড়ে দাও। (আমাদের প্রতি) যান আপনারা গিয়ে দর্শন করে আসুন।

শ্রীম দক্ষিণাস্য হইয়া শিব দর্শন ও স্পর্শন করিলেন। আর

মেঝেতে বসিয়া করে জপ করিতেছেন—চক্ষু নিমীলিত। পনর মিনিট পর ঘণ্টা নিনাদ করিয়া আসিলেন।

উভয়ে পুনরায় রাজপথে চলিতেছেন উত্তর দিকে। শ্রীম সেবককে বলিলেন, মা চার পয়সা ঋণ রেখে দিলেন। তুমি আর একদিন এসে দু' পয়সা দিও। আমিও দিয়ে যাব এসে আর একবার। এসব তিনি এইভাবে করিয়ে নেন। এমনি তো আর আসবো না। তাই ফন্দি করে জোর করে করিয়ে নেন।

২৯ নম্বর নকুলেশ্বরতলা রোড। নির্মলচন্দ্র চ্যাটার্জীর গৃহ। শ্রীম বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সেবক। ফরাসের উপর চৌদ্দ বছরের একটি মেয়ে আর বার বছরের একটি ছেলে বসিয়া আছে। তাহারা ভাইবোন, নির্মলবাবুর সন্তান। শ্রীম ক্লান্ত, তাই ফরাসের উপর বসিয়া পড়িলেন। মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়ীর কর্ত্তা বাড়ী আছেন? 'আজ্ঞে হাঁ' বলিয়া মেয়ে উঠিয়া একটি চেয়ার আনিয়া শ্রীমকে বসিতে অনুরোধ করিয়া অন্তর্বাটীতে প্রবেশ করিল। গৃহস্বামী নির্মল চ্যাটার্জী আসিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া শ্রদ্ধাবনতভাবে শ্রীমকে প্রণাম ও অভ্যর্থনা করিলেন। আজ সকালে কালীঘাট মন্দিরে শ্রীমকে দর্শন করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাঁহার গৃহে শুভাগমন করিতে। শ্রীম সেই অনুরোধ রক্ষা করিতে এখন আসিয়াছেন। নির্মলবাবু অতিথিদের ঠাকুরঘর দেখাইয়া প্রসাদ দিলেন। তারপর শ্রীমকে অন্তর্বাটীতে লইয়া গেলেন। সেবক বৈঠকখানায় ফরাসের উপর বসিয়া আছেন।

গৃহিণী শ্রীমকে প্রণাম করিয়া প্রসাদ দিলেন আবার। তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত। দুই একটি কথা কহিয়া শ্রীম পুনরায় বৈঠকখানায় আসিয়া চেয়ারে বসিয়াছেন। ছেলে ও মেয়ে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া শ্রীমকে প্রণাম করিতেছে। শ্রীম বলিতেছেন, মা আনন্দময়ী, মা আনন্দময়ী। শ্রীম প্রায় কাহাকেও পায়ে হাত দিতে দেন না। কিন্তু আজ পরিবারের সকলের ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়াছেন। তাই পায়ে হাত দিতে কোনও আপত্তি করেন নাই। গৃহস্বামীকে

বলিলেন, আপনার মেয়ে তো বেশ বড় হয়েছে! শ্রীম আবার উচ্চারণ করিতেছেন—মা আনন্দময়ী, মা আনন্দময়ী। এই আশীর্বাদ ও প্রার্থনা করিয়া শ্রীম গাত্রোত্থান করিলেন।

এখন বেলা দশটা বাজিতে দশ মিনিট বাকী। শ্রীম আনন্দে বলিতেছেন, আমরা দক্ষিণেশ্বর যাব—অনেক দূর। এই বলিয়া মুচকি হাস্যে গানের একটি কলি গাহিতেছেন—চল মুসাফির বাঁধ গাঠুরিয়া, বহুত দূর জানা হোগা। কলিটি নির্মল পুনরায় শুনিতে চাহিলেন। শ্রীম পুনরায় গাহিলেন। এইবার বিদায় লইলেন।

উভয়ে ট্রাম স্ট্যাণ্ডের দিকে চলিতেছেন। শ্রীম সেবককে আহ্লাদে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল দিকিন, আমাদের প্রসাদ দিলেন কে? সেবক চুপ রহিলেন। শ্রীমই উত্তর দিতেছেন, মা-ই প্রসাদ দিলেন, ওঁর হাত দিয়ে। মনটা কেমন করছিল প্রসাদ পেলাম না বলে। তাই মা প্রসাদ পাঠিয়ে দিলেন।

গদাধর আশ্রম, ভবানীপুর, কলিকাতা
১৪ জানুয়ারী, ১৯২৪ খ্রীঃ ২৯শে পৌষ, ১৩৩০ সাল
সোমবার, মকর সংক্রান্তি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পুনরায় বনভোজন দক্ষিণেশ্বর তপোবনে

১

শ্রীম আজ সকালে কালীমাতাকে দর্শন করিয়াছেন। এখন বেলা সাড়ে দশটা। দক্ষিণেশ্বর চলিয়াছেন, সঙ্গে সেবক। ট্রামে কালীঘাট হইতে এসপ্লানেড আসিতেছেন। শীতকাল, পৌষ সংক্রান্তি। গত রাত্রিতে ও সকালে খুব বৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীম আজকাল ভবানীপুর রহিয়াছেন গদাধর আশ্রমে।

শ্রীমর গায়ে গরম সোয়েটার। তাহার উপর একটি এ্যাশ কালারের ওয়ার ফ্লানেলের পাঞ্জাবী। পায়ে নিত্য ব্যবহার্য বার্ণিশ করা চটি। পরণে সাদা থান কাপড়ের ধুতি। কাঁধের উপর একটি মুগার কাজ করা চাদর। মাথায় কম্ফোর্টার। পকেটে একটি গামছা।

ট্রাম চলিতেছে। শ্রীম ও সেবক বসা। শ্রীম সেবককে বলিলেন, তুমি এক টাকার চেঞ্জ ন্যাও টিকিট কেনার সময়। আমিও নি এক টাকার। তা'হলে দু'টাকার চেঞ্জ হবে। এতেই কাজ চলবে। তাহাই হইল।

কালীঘাট হইতে ট্রাম স্টেশনে আসিবার সময় শ্রীমর পকেট হইতে গামছা পড়িয়া গেল। শ্রীম বা সেবক কেহই উহা দেখিতে পাইলেন না। একদল উৎকলবাসী যাত্রী মা-কালীর দর্শনমানসে যাইতেছিল। একজন যাত্রী উচ্চৈঃস্বরে কয়েকবার চীৎকার করিয়া বলিতেছে, 'বাবু লুগা পড়ি গেলা'। শেষবারের শেষ কথা সেবকের কর্ণে প্রবেশ করিল। সেবক দৌড়াইয়া গিয়া গামছা উঠাইয়া লইলেন। শ্রীম বলিলেন, দেখলে, ঠাকুরই মুসাফির বেশে এই এসে, এই কথা বলে চলে গেলেন। তিনি বলতেন কিনা, গামছা হারান খুব দোষের।

এসপ্লানেডে শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন। বাগবাজারের ট্রাম ছাড়িতেছে না, অথচ বেলা বাড়িয়া চলিয়াছে। 'হোয়াইটওয়ে লেডল'র টাওয়ার ক্লকে দেখা যাইতেছে এখন বেলা দশটা চল্লিশ। শ্রীম ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বলিতেছেন, দুপুর হয়ে যাবে দক্ষিণেশ্বর যেতে; তুমি বরং যাও। গিয়ে আমাদের কথা বল। আমরা পারি তো rest (বিশ্রাম) করে বিকেলে যাবার চেষ্টা করবো। আশা খুব কম যাবার। আর এখন গেলে মায়ের স্নান দেখতে পাব কি ? সেবক বলিলেন, আজ পৌষ পার্বণ, স্নান দেখার সম্ভাবনা আছে। উভয়েই বাগবাজারের একটি ট্রামে বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছেন। হঠাৎ এই ট্রাম চলিতে লাগিল, কিন্তু একটা সাইডিংএ গিয়া থামিল। আর চলিতেছে না।

শ্রীম স্থির করিলেন গদাধর আশ্রমে ফিরিয়া যাইবেন। পাশেই কালীঘাটের ট্রাম। দেখিতে দেখিতে উহা চলিতে লাগিল। শ্রীম তাড়াতাড়ি গিয়া সেকেণ্ড ক্লাসে চড়িলেন। সেবককে বলিলেন, তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাও। ভক্তদের বলো সম্ভব হলে বিকেলে চেষ্টা করবো যেতে।

ঠিক তখনই বাগবাজারের ট্রামও চলিতে লাগিল। কি বিচিত্র খেলা! এক মিনিটের মধ্যে শ্রীম ও সেবক দুইজনে দুই দিকে চলিতেছেন। সেবক দুঃখিত হইয়া বাগবাজারে আসিয়া ট্রাম ছাড়িয়া আলমবাজারের বাসে উঠিলেন। সেখানে ডাক্তারবাবুর ঘোড়ার গাড়ী শ্রীমর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। উহাতে চড়িয়া সেবক দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে উপস্থিত। শ্রীমকে না দেখিয়া সকলে মর্মাহত। আজের উৎসবের মধ্যমণি শ্রীম। তাঁহার উদ্দেশ্যে এই আয়োজন। প্রচুর আয়োজন। শ্রীমর অভাবে সকলই বিফল।

পূর্ব হইতে স্থির ছিল সেবক শ্রীমকে বেলা আটটার মধ্যে লইয়া আসিবেন। সকালে বৃষ্টির জন্য আর শ্রীমর কালীঘাটে মায়ের দর্শনের জন্য তাহা সম্ভব হয় নাই। দেরী দেখিয়া ভক্তগণ উদ্বিগ্ন হইলেন। ছোট অমূল্যকে বেলা নয়টার সময় ভবানীপুর পাঠাইয়া দিলেন। ছোট অমূল্য গদাধর আশ্রমে বসিয়া আছেন শ্রীমর অপেক্ষায়। এদিকে সেবকের মুখে শ্রীমর বাণী শুনিয়া ভক্তগণ একেবারে বিষণ্ণ। তাই বেলা দেড়টার সময় সুখেন্দুকে তাঁহারা পাঠাইয়া দিলেন। সুখেন্দু ভবানীপুর পৌঁছিবার পূর্বেই শ্রীম দক্ষিণেশ্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ছোট অমূল্য সঙ্গে। ভক্তগণ শ্রীমকে পাইয়া আনন্দসাগরে ডুবিয়া গেলেন। তাঁহাদের মুখকমলের সহিত হৃদয়কমল প্রস্ফুটিত—সূর্যোদয়ে ফুল্ল সরোজের ন্যায়।

গাড়ী হাঁসপুকুরের উত্তর তীরে থামিল। শ্রীম ভক্তসঙ্গে বিল্বতল হইয়া পঞ্চবটীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন। পথিমধ্যে একটি ভক্তের সঙ্গে দেখা হইল। সস্নেহে ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের কিছু আহার হয়েছে তো? 'আজ্ঞে হাঁ, সকালে ঠাকুরকে হালুয়া

ভোগ দেওয়া হয়েছিল। সকলে সেই প্রসাদ পেয়েছেন,' ভক্ত বলিলেন।

ঠাকুরের তপোভূমি বটবৃক্ষতলে রন্ধন হইতেছে ; বেদীর উত্তর দিকে আম্র বৃক্ষ, তাহার উত্তরে ক্রোটনের সারি। উহাই আজের উৎসবের রন্ধন-স্থলী। ভক্তগণের ঐকান্তিক ইচ্ছা, পঞ্চবটীর এই পবিত্র স্থলে রন্ধন করিয়া ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করেন। কিন্তু মন্দিরের খাতাঞ্জী ঘোষাল ইহাতে আপত্তি করিলেন। ভক্তগণও নাছোড়বান্দা। ছোট জিতেন বাগবাজার গিয়া মন্দিরের ম্যানেজার কিরণ দত্তের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া আসিলেন। আর রামলাল দাদাও সমর্থন করিলেন।

শ্রীম রন্ধন-স্থল ও রন্ধনের দ্রব্যাদি পরিদর্শন করিয়া পঞ্চবটী ক্ষেত্র প্রদক্ষিণ করিতেছেন। প্রথমে ঠাকুরের সাধনস্থল। সিদ্ধপীঠ বট-বেদিকা প্রদক্ষিণ করিলেন। তারপর ঠাকুরের স্বহস্তরোপিত পঞ্চবটী ও সাধন-কুটীর প্রদক্ষিণ করিলেন। পঞ্চবটী মূলে উত্তরাস্য হইয়া শ্রীম ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিতেছেন। এবার ঠাকুরের শ্রীহস্ত রোপিত মাধবীলতাকে স্পর্শ, আলিঙ্গন ও প্রণাম করিলেন। মাধবী এখন বেশ বড় হইয়াছে। ঠাকুর বৃন্দাবন হইতে উহা আনাইয়া এখানে রোপণ করিয়াছিলেন। মাধবী স্থূলকায়—ঊর্ধ্বে আরোহণ করিয়া সিদ্ধ বটবৃক্ষ ও পঞ্চবটীর অশ্বত্থকে যেন তুইটি বলিষ্ঠ লতা-বাহুতে নিবিড় আলিঙ্গন করিতেছে। মাধবীর পবিত্র পদতলে জ্ঞানমূর্তি পরমহংস তোতাপুরী স্বামীজী দীর্ঘ একাদশ মাস ধুনি রচনা করিয়া আসন স্থাপন করিয়াছিলেন। ঠাকুর নিত্য তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিতে আসিতেন। আর সুদীর্ঘ সময় ধরিয়া বেদান্ত আলোচনায় ভজন ও সমাধিতে অতিবাহিত করিতেন।

শ্রীম সাধনকুটীরের দরজা যুক্ত করে স্পর্শ করিলেন এবং মস্তক সংলগ্ন করিয়া দরজার গায়ে প্রণাম করিলেন। এই সাধনকুটীরেই শ্রীতোতাপুরী ঠাকুরকে বেদান্তের চূড়ান্ত সাধনফল নির্বিকল্প সমাধি লাভে সহায়তা করেন। সামান্য চেষ্টায় ঠাকুরের নির্বিকল্প অবস্থা

দেখিয়া তিনি বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, 'এ কেয়া রে, এ কোন্ হ্যায়'? যে সমাধি তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর অভ্যাসের পর লাভ করিয়াছিলেন, ক্ষণমাত্র সময়ে এই যুবক তাহাই লাভ করিল! তিন দিন ধরিয়া এই যুবক ব্রহ্মসাগরে ডুবিয়া রহিল। কে এ যুবক?

শ্রীম বলিতেছেন, পূর্বে এই কুটীরটি ছিল মৃন্ময়। তখনই এই ঘরে ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধি হয়। পরে হয় এই ইঁটের ঘর; ঐ ঘরে তখন কিছুই ছিল না। এখন এই শিবমূর্তি স্থাপন করেছে। কালে কত কিছু হবে। আর ঠাকুরের নামে চালাবে। সর্বত্রই এইরূপ হয়। Pure (শুদ্ধ) জিনিসটি থাকে না—খাদ এসে মিলিত হয়। শ্রীম কুটীরের অভ্যন্তর দর্শন করিলেন দক্ষিণের জানালা দিয়া একটি সোপানের উপর দাঁড়াইয়া।

শ্রীম হাঁসপুকুরের দক্ষিণ ঘাটের চাতালের উপর দাঁড়াইয়া আছেন—যুক্ত করে। পুষ্করিণীর জল, সোপানশ্রেণী, চত্বর ও পার্শ্ববর্তী বৃক্ষসমূহ অনিমেষ নয়নে দর্শন ও প্রণাম করিতেছেন। যেন কি খুঁজিতেছেন—মনের অতীত স্তরের অভ্যন্তরে। স্মৃতিমধুর চিত্র বুঝি অঙ্কিত করিতেছেন। এই স্থানে দাঁড়াইলে বামহস্তে থাকেন জাহ্নবী ও পঞ্চবটি, আর সম্মুখে বিল্বতল ও পশ্চাতে কুঠী। এ সমস্তই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহচর। একটি ভক্তকে চোখে ইঙ্গিত করিলেন পুকুরের জল আনিতে। ভক্তটি অঞ্জলি করিয়া জল আনিলেন। শ্রীম ডান হাতে সেই জল মস্তকে ছিটাইয়া দিলেন আর অল্প জল পানও করিলেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া নিত্য এই ঘাটে আসিতেন জল লইতে। এই জলেই শৌচকার্য সম্পন্ন করিতেন। গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি। গঙ্গাজলে শৌচাদি কার্য চলে না। একদিন এই চত্বরে দাঁড়াইয়া নরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন, 'ঘন ঘন আসতে হয়। দেখিস্ নি নয়া পিরীতে কি করে স্ত্রীপুরুষে? এতে প্রেম গাঢ় হয়, গভীর হয়।'

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥

শ্রীমর অনুকরণ করিয়া ভক্তগণও এই পবিত্র জল মস্তকে সিঞ্চন করিতেছেন আর কিঞ্চিৎ পান করিতেছেন।

শ্রীম কুঠিতে দাঁড়াইয়া আছেন, দক্ষিণ বারান্দায় দক্ষিণের সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া, দক্ষিণাস্য। তাঁহার ডান হাতে মায়ের বাসস্থল নহবতখানা, বকুলতলার ঘাট ও সুরধুনী। বাম হাতে শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বেকার নিবাস-কক্ষ। এই গৃহেই ঠাকুর স্বীয় জননীর সহিত বাস করিতেন। ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যু এই গৃহেই হয়। তাহার শোকে চন্দ্রাদেবী এই গৃহ ত্যাগ করিলেন। আর বর্তমান সুপরিচিত ঠাকুরঘরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কুঠিতে ষোল বছর, আর এই ঘরে চৌদ্দ বছর ছিলেন ঠাকুর। এই ঘরেই তিনি অবতারলীলা প্রকাশ করেন—অন্তরঙ্গগণ ও কেশবাদি বহিরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে।

ভক্তগণ কুঠির বাসগৃহের দরজা খুলিয়া দিলেন আর জানালাগুলিও খুলিলেন। শ্রীম সভক্ত মেঝেতে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া জানালা দিয়া গঙ্গা দর্শন করিতেছেন যুক্ত করে। শ্রীম এইবার বাহির হইয়া আসিলেন ঠাকুরঘরের উত্তর পাশের রাস্তায়। উত্তরের সংলগ্ন বারান্দার পূর্ব-উত্তর কোণে মস্তক স্থাপন করিয়া প্রণাম করিতেছেন। এই স্থানে দাঁড়াইয়া ঠাকুর ভক্তদের বিদায় দিতেন।

শ্রীম মায়ের ঘর নহবতে গিয়া সিঁড়িতে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিলেন। অন্তেবাসী তাঁহার ইঙ্গিতে ঘরের দরজা খুলিয়া দিলে তিনি উঁকি দিয়া অভ্যন্তর দর্শন করিলেন। শ্রীম এবার বকুলতলা ঘাটের দক্ষিণের পোস্তার উপর দিয়া পশ্চিম দিকে চলিতেছেন, তারপর দক্ষিণে শ্রীমর ডান হাতে গঙ্গা, সম্মুখে বেলুড় মঠ। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পুনরায় ঐ পথেই ফিরিলেন। উত্তর ও পশ্চিম সংযোগ স্থলে দাঁড়াইয়া আছেন। গঙ্গায় এখন ভাটা। নিম্নে গঙ্গা-মৃত্তিকা দেখা যাইতেছে। চোখের ইশারায় আজ্ঞা পাইয়া ছোট জিতেন এই

মৃত্তিকা লইয়া আসিলেন। শ্রীম কপালে তিলক কাটিতেছেন। ভক্তগণও তিলক কাটিতেছেন। এই পোস্তার উপর ঠাকুর বেড়াইতে বেড়াইতে অনাহত ধ্বনি শুনিতেন গভীর রাতে।

এবার ঠাকুরের ঘরে। শ্রীম নিজ হাতে পশ্চিমের দরজা খুলিয়া গঙ্গা দর্শন করিতেছেন। আর একজন ভক্ত উত্তর দিকের দরজাও খুলিয়া দিলেন। শ্রীম আসন গ্রহণ করিলেন মেঝেতে, শ্রীমর সম্মুখে গঙ্গা। শ্রীমর ডান হাতে বসিলেন রমণী, ছোট অমূল্য, যোগেন, পরে বড় অমূল্য। পিছনে উকিল ললিত ব্যানার্জী। বাম হাতে বসিয়াছেন, গদাধর, ডাক্তার ও জগবন্ধু। শ্রীহট্টের তিন জন ভক্ত ও বহিরাগত ভক্তে গৃহ পরিপূর্ণ। এখন বেলা পৌনে চারটা। শ্রীম বলিলেন, কই গাইয়েরা কোথায়? জগবন্ধু রমণীকে দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু শ্রীম ললিতকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বলিলেন, গান না আপনার শিবের গানটি। ললিত গাহিতেছেন, 'মহাদেব পরমযোগিন্ মহতানন্দে মগন।'

রমণী সুশিক্ষিত শান্ত ও সুকণ্ঠ। এইবার তিনি সকলকে মধুর রসে মুগ্ধ করিয়া গাহিতে লাগিলেন—

গান। তাই শিবের মন মজেছে (মা)।
তা না হলে ত্রিলোচন পরম যতনে কেন
ঐ চরণ হৃদে ধরেছে॥ ইত্যাদি।

এই গানটি সমাপ্ত হইলে শ্রীম বলিলেন, ঐটি হোক না—কখন কি রঙ্গে থাক মা। রমণী গাহিতেছেন—

কখনও কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধা তরঙ্গিণী।
তুমি রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে
অনঙ্গে ভঙ্গ দাও জননী॥
লম্ফে ঝম্পে কম্পে ধরা অসিধরা করালিনী।
গান। তুমি ত্রিগুণা ত্রিপুরা তারা ভয়ঙ্করা কালকামিনী॥
সাধকের বাঞ্ছা পূর্ণ কর নানা রূপধারিণী।
কভু কমলের কমলে নাচ মা পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী॥

গান। শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা মা। ইত্যাদি।

গান। মজলো আমার মনভ্রমরা শ্যামাপদ নীল কমলে। ইত্যাদি

গান। শ্যামাধন কি সবাই পায়, (কালীধন কি সবাই পায়)
অবোধ মন বোঝে না এ কি দায়।
শিবের অসাধ্য সাধন, মন, মজ না (ঐ) রাঙ্গা পায়,
ইন্দ্রাদি সম্পদ সুখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়,
সদানন্দ সুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র যে চরণ ধ্যানে না পায়,
নির্গুণ এ কমলাকান্ত, তবু সে চরণ চায়।

এই গানটি সকলে মিলিয়া গাহিতেছেন। শ্রীমও মাঝে মাঝে যোগদান করিতেছেন। গান শেষ হইল। শ্রীম পূর্ব দরজা দিয়া বাহির হইতেছেন। দেখিলেন, দুইটি ভক্ত গুনগুন করিয়া গান গাহিতেছেন। শ্রীম বলিলেন, গান না আপনারা। শ্রীম আসনে বসিলেন। ভক্তরা গাহিতেছেন সকলে—

গান। জয়তু জয়তু রামকৃষ্ণ ভবভয়হারী হে।
জয়তু জয়তু পরমব্রহ্ম জয় নবরূপধারী হে॥
কাম কাঞ্চন আধারে ধরণী ডুবিল হেরে,
উদিল সূর্য অমিত বীর্য যুগে যুগে অবতরী হে।
মহাসমন্বয় রবে, রামকৃষ্ণ একাধারে,
ডাকছ কেন সকাতরে, জগতের নরনারী হে।
শুনেছি অভয়বাণী তুমি জগ চিন্তামণি,
তোমারি দ্বারে অতিকাতরে, এসেছি দীন ভিখারী হে॥

২

শ্রীম পূর্ব-দক্ষিণ বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। যেখানে হাজরামহাশয়ের আসন ছিল সেখানে আজও একটি মাদুর পাতা থাকে। ভক্তরা আসিলে কেহ বসেন। শ্রীযুক্ত রামলালদাদা, শিবরাম-দাদা বসিতেন, তাঁহাদের ছেলে নকুল প্রভৃতিও বসেন ইদানীং।

আজ ঐ আসনে একটি বলিষ্ঠ প্রৌঢ় ভক্ত বসিয়াছেন—ব্রাহ্মণ ও আনন্দময়। শ্রীমকে দেখিয়াই উনি দাঁড়াইয়া যুক্ত করে অভ্যর্থনা করিলেন ও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। করজোড়ে বলিতেছেন, আজ আমি ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি বেদব্যাসকে দর্শন করলাম। আমি ধন্য। আর একদিন চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু দর্শন হয় নাই। শ্রীম সহাস্যে উত্তর করিলেন, তা' ভাল হলো। ভাল জায়গায় দর্শন হলো।

শ্রীম উত্তর দিকের ছয়টি শিব মন্দিরে উঠিবার সিঁড়িতে প্রণাম করিলেন। একদিন ঠাকুর এই সিঁড়িতে বসিয়াছিলেন সমাধিস্থ—গভীর সমাধিস্থ—সেই অবস্থায় তাঁহার ফটো নেওয়া হয়। এই ফটোই এখন সর্বত্র পূজিত হইতেছে।

বিষ্ণুঘরে উঠিবার সিঁড়ির নিম্নে ঠিক মধ্য স্থানে অঙ্গনে শ্রীম প্রণাম করিতেছেন। এখানে উত্তরাস্য হইয়া ঠিক এইরূপে প্রণাম করিতেন ঠাকুর কেশব সেন প্রভৃতি যখন আসিতেন। নবীন শিক্ষিত ভক্তেরা ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানে না। তাই ঠাকুর ও শ্রীম করিতেন ভক্তদের শিক্ষার জন্য। যে জানে তাহাতেও আবার লজ্জা হয় অনেকের—প্রণাম করিতে। তাই এই আচরণ। কেশব সেনরাও পরে ঐরূপ ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিতেন। গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া রাধাকৃষ্ণকে একটি টাকা প্রণামী দিলেন। তারপর চরণামৃত লইয়া নিচে নামিয়া গেলেন। অন্তেবাসী আসিয়া টব হইতে শ্রীমর হাতে গঙ্গাজল দিলেন।

শ্রীম ভবতারিণীর পদপ্রান্তে যুক্ত করে দাঁড়াইয়া আছেন। তারপর মেঝেতে বসিলেন দেবীকে ডান হাতে রাখিয়া। মায়ের অনুমতি পাইয়া গললগ্নকৃতবাসে মাকে বারংবার ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিতেছেন টলিতে টলিতে। শ্রীম ভাবে বিভোর, মুখে আনন্দের মধুর আভা বিকশিত।

প্রথম যৌবনে শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে সন্ন্যাসব্রত চাহিয়াছিলেন। ঠাকুর বলেন, জগদম্বা আমাকে বলিয়াছেন ঘরে

থাকিয়াই তোমাকে তাঁহার একটু কাজ করিতে হইবে। লোককে 'ভাগবত' শিখাইতে হইবে। তবুও শ্রীম বারবার পীড়াপীড়ি করায় একদিন সন্ধ্যার পর সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া অস্ফুট স্বরে বলিয়াছিলেন, কেউ মনে না করে, আমি না হলে মায়ের কাজ বন্ধ থাকবে। মা এক টুকরো তৃণ থেকে বড় বড় আচার্য সৃষ্টি করেন। সেই দিন হইতেই শ্রীম ঠাকুরের আদেশ পালনে বদ্ধপরিকর হইলেন।

গান গাহিয়া শ্রীমকে মায়ের পদে সমর্পণ করিলেন—'ভবদারা ভয়হরা নাম নিয়েছি তোমার'। আবার মায়ের কাছ হইতে চাহিয়া এক কলা শক্তি শ্রীমকে দিলেন। মাকে বলিলেন, এক কলা দিলি? আচ্ছা, এতেই তোর কাজ হয়ে যাবে। ঠাকুরের ইচ্ছা ছিল আরও বেশী দেন। ইহা ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ঘটনা।

আবার ঠাকুর প্রার্থনা করিলেন, মা সব ত্যাগ করাস না। ঘরে যদি রাখিস তবে এক একবার দেখা দিস। নইলে কি নিয়ে থাকবে।

শ্রীম পিতৃভক্ত গুরুভক্ত শিষ্য সন্তানের ন্যায় আজ চল্লিশ বছর ধরিয়া নিষ্ঠার সহিত ঐ আদেশ পালন করিয়া আসিয়াছেন। এখন তিনি বৃদ্ধ। তাই শ্রীম আজ মায়ের কাছে এতো আনন্দময়,—লোকশিক্ষারূপ কঠিন ব্রত উদ্‌যাপনজনিত আনন্দ, আর মায়ের ছেলে মায়ের চরণপ্রান্তে উপস্থিতজনিত আনন্দ!

শ্রীম মায়ের সম্মুখে বসিয়া আছেন ধ্যানস্থ। ঠাকুরের দৌহিত্র নকুল আসিয়া বলিলেন, জ্যেঠামশায়, এই মায়ের চরণামৃত ও সিন্দুর। শ্রীম একটি টাকা প্রণামী দিয়া পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন। আজ পৌষসংক্রান্তি, খুব ভীড়, সারাদিনই মন্দির খোলা। তবুও প্রহরীগণ যাত্রীগণকে সুসংযত রাখিয়াছে, যাহাতে শ্রীমর ধ্যানে বিঘ্ন না হয়। অনেকক্ষণ পর পুনরায় প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। শ্রীমর মুখমণ্ডল জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে সুমধুর আনন্দে, মাতৃস্নেহে।

শ্রীম গঙ্গার বড় ঘাটে বসিয়া আছেন। এখন ভাটা, শীতকাল, তাই গঙ্গা বহু নিম্নে নামিয়া গিয়াছে। শ্রীম আগমন করিয়া সিঁড়িতে প্রথমে দক্ষিণাস্য পরে উত্তরাস্য প্রণাম করিলেন। দুই দিকে দুইবার প্রণামের অর্থ কি এই! দক্ষিণাস্য প্রণাম—বেলুড় মঠের উদ্দেশ্যে, আর উত্তরের প্রণাম—পঞ্চবটী, বিল্বতল, নহবত, ঠাকুর ঘর, মা কালী, এ সকলের উদ্দেশ্যে। গঙ্গামাতাকে প্রণামই মূল উদ্দেশ্য—সহকারী উদ্দেশ্য তীর্থ—তীর্থসমন্বিত মা গঙ্গা। শ্রীমর আচরণ ভক্তগণ সর্বদাই অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়া থাকেন। শ্রীম ভক্তসঙ্গে ধ্যানমগ্ন। বিনয় ও ছোট অমূল্য রন্ধনরত ছিলেন। এইবার আসিয়া ধ্যানে যোগদান করিলেন। ডাক্তার, বড় ও ছোট অমূল্য চলিয়া গেলেন পরিবেশন-ব্যবস্থার জন্য পঞ্চবটীতে।

শ্রীম গঙ্গার ঘাটের উপর উঠিয়া উত্তরাস্য দাঁড়াইয়াছেন। তারপর পঞ্চবটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন—পিছনে ভক্তগণ। ডান হাতে প্রথমে ঠাকুরের ঘর, পরে মায়ের নহবত অতিক্রম করিলেন। শ্রীমর বাম হাতে গঙ্গার দিকে একটি ইষ্টকনির্মিত উচ্চ বেঞ্চ আছে। ঠাকুর উহাতে কখনও বসিতেন। শ্রীম হস্তদ্বারা উহা স্পর্শ করিয়া মস্তকে লাগাইলেন। ঠাকুর যেখানে দাঁড়াইয়াছেন, যেখানে বসিয়াছেন—ঐ স্থান শ্রীমর নিকট বড় পবিত্র মহাতীর্থ, নবীন ভারতের নবীন তীর্থ।

পঞ্চবটী। পুরাতন বটবেদিকা। তদুত্তরে বিশাল আম্রবৃক্ষ। তাহারই নিম্নে পঙ্গদ্ বসিয়াছে। দুই সারিতে ভক্তগণ ও সাধুগণ, শ্রীমর সঙ্গে উপবিষ্ট সামনাসামনি। দুইজন অভ্যাগত সাধুও আসিয়া বসিয়াছেন।

শ্রীম বসিয়াছেন কম্বলাসনে পঞ্চবটিমুখী। তাঁহার সঙ্গে বসিলেন বঙ্কুবাবু ও লালবিহারীবাবু। সাধু ভক্তের সংখ্যা ত্রিশ জন—ডাক্তার, বিনয়, ছোট অমূল্য ও ছোট নলিনী, রমণী, বড় নলিনী, যোগেন ও তাহার পুত্র খোকা, শ্রীহট্টের তিনজন ভক্ত, বড় অমূল্য, ছোট জিতেন, সুখেন্দু, জগবন্ধু প্রভৃতি।

রন্ধনকারী ভক্তগণ, পরিবেশক ভক্তগণ, প্রসাদভক্ষক ভক্তগণ, কার্যসহায়ক ভক্তগণ।

ভোগের জন্য রন্ধন হইয়াছে নানাবিধ দ্রব্য। খিচুড়ি, আলু-কপির ডালনা, আলুবকরার চাটনী, পাঁপরভাজা, বেগুনভাজা প্রভৃতি। ঘি, দই, সন্দেশ, মোয়া, রসগোল্লা—এ সবই ভোগের দ্রব্য।

শ্রীম কহিতেছেন, সুখেন্দুবাবুকে না পাঠালে ভাল হতো। আজের আনন্দ উপভোগ করতে পারলে না। কথা শেষ না হইতেই সুখেন্দু আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীম বলিলেন, দিন্ দিন্, একে সব প্রসাদ দিন্।

এস্থানে কয়েকবার ভক্তগণ ঠাকুরের সময় রান্না করে আনন্দোৎসব করেছেন। একবারের কথা মনে পড়ছে মাত্র দুই টাকা চাঁদা উঠেছে। এতেই কত আনন্দ।

এ স্থানটি বড়ই পবিত্র। ঠাকুর এখানে পড়ে কাঁদতেন মায়ের দর্শনের জন্য। সারা রাতদিন পড়ে থাকতেন। প্রতি ধূলিকণায় তাঁর স্পর্শ।

এই উৎসবানন্দের সঙ্গে তাঁর দিব্যলীলার কথা স্মরণ করা উচিত। তবেই আনন্দ জীবন্ত হয়, আর গাঢ় হয়।

সওয়া পাঁচটায় শ্রীম উঠিয়া পড়িলেন। ঠাকুরের ঘরে প্রণাম করিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িলেন, সঙ্গে ডাক্তার বক্সুবাবু ও লালবিহারী।

ভক্তগণ মায়ের আরতি দর্শন করিয়া পদব্রজে আলমবাজার আসিলেন। একটি সম্পূর্ণ বাসে তাঁহারা কলিকাতায় রওনা হইলেন। তাঁহারা ভজন গাহিতে গাহিতে যাইতেছেন—

গান। গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চি কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায়। ইত্যাদি।

গান। পারি না ক্ষেপা মায়েরে ক্ষেপার মত না ক্ষেপিলে।
সিয়ান পাগল বুচকি বগল, কাজ হবে না এরূপ হলে॥

কলিকাতা, ৫০নং আমহার্স্ট স্ট্রীট
৭ই জানুয়ারী ১৯২৪ খ্রীঃ, ২৩শে পৌষ ১৩৩০ সাল, সোমবার।

তৃতীয় অধ্যায়

সর্বত্যাগী সাধুর সঙ্গ করিলে অনেকটা রক্ষা

১

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। জ্যৈষ্ঠ মাস, অপরাহ্ন পাঁচটা। শ্রীম চেয়ারে বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য। সম্মুখেই অন্তেবাসীর ঘর। হেমেন্দ্র মহারাজ আসিয়া প্রণাম করিয়া শ্রীমর সম্মুখে বসিয়াছেন। ইনি বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ। বিদ্যাপীঠের বাৎসরিক রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়াছেন। উহার পাণ্ডুলিপি শ্রীমকে দেখাইয়াছেন। এখন উহা ছাপা হইতেছে। হাতে প্রুফ। শ্রীম অন্তেবাসীকে উহা সংশোধন করিয়া দিতে বলিলেন। ধীরে ধীরে ভক্তগণ একত্রিত হইতে লাগিল ময়ূরের মত মৌতাতের আশায়।

ক্ষণকাল মধ্যে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। চারিদিক অন্ধকার। ঝুমঝুম করিয়া আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রবল বারিপাত হইতে লাগিল। শ্রীম ও ভক্তগণ উঠিয়া গিয়া সিঁড়ির ঘরে বসিলেন চেয়ারে দক্ষিণাস্য দরজার পাশে। বড় জিতেন, বিনয়, ছোট রমেশ, ছোট জিতেন, ছোট নলিনী, বলাই, মনোরঞ্জন, গদাধর, জগবন্ধু প্রভৃতি ভক্তগণ বসিয়া আছেন বেঞ্চিতে, শ্রীমর বাম পাশে ও সম্মুখে। বৃষ্টি মাঝে মাঝে থামিতেছে আবার হইতেছে। এখন রাত্রি প্রায় আটটা। স্বামী সদ্ভাবানন্দ প্রেসে প্রুফ দিয়া আবার আসিয়া বসিলেন। শ্রীম কথামৃত বর্ষণ করিতেছেন ঘরের ভিতরে আর বরুণদেব বারিবর্ষণ করিতেছেন ঘরের বাহিরে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—মহামায়া সব ভুলিয়ে দেন। অবতার এসে এই সেদিন অত সব কথা বলে গেলেন, অত সব আচরণ করে গেলেন, চোখে আঙুল দিয়ে সব দেখিয়ে গেলেন, তবুও লোকের চৈতন্য হয় কই ?

আহা, কি অবস্থাই গেছে ঠাকুরের—চব্বিশ ঘণ্টা মুখে কেবল 'মা, মা'! রাত্রে ঘুম নাই। পাঁচ দশ মিনিট একটু চুপ করে আছেন। আবার 'মা, মা' করে জেগে উঠছেন। নিশ্বাসে প্রশ্বাসে 'মা, মা'। ঠিক যেন ছেলেমানুষ। মা ছাড়া সে থাকতে পারে না। তার মা চাই।

শ্রীম (ছোট রমেশের প্রতি)—দেয়ালকে যদি তুমি কিছু বল, দেয়াল শুনবে কি তোমার কথা, কি বল?

এব্রাহাম ঠিক কথা বলেছিলেন ল্যাজারাসকে—'তুমি যদি নরকবাসী এই ধনীর বাড়ীতে গিয়ে বলে আস—স্বর্গ নরক সত্য, তার আত্মীয়স্বজন কি তোমার কথা শুনবে? বলবে imposter (প্রতারক) এসেছে। কত prophets (দেবমানব) এসে কত কথা বললেন। তাঁদের কথাই বা কে নিচ্ছে? আর তোমার কথা নেবে?

বড় জিতেন (দীনভাবে)—কৃপা করে একবার দেখা দিলেই তো সব মিটে যায়!

শ্রীম (সহাস্যে)—হাঁ তা' হয়। তা' টাকাটা সিকেটা হলে হয়। কে যায় তোমার বদ্রীনারায়ণের ভাড়া দিতে (হাস্য)?

শ্রীম (স্বামী সম্ভাবানন্দের প্রতি)—ত্রিগুণাতীত (স্বামী) বলেছিল এ কথা। একবার তার বৈরাগ্য হলো। কাউকে কিছু না বলে মঠ থেকে পালিয়ে গেল। আলমবাজারে তখন মঠ। সকলে চিন্তিত, কোথায় গেল। আট দিন পর হঠাৎ ফিরে এল। তখন সকলে নিশ্চিন্ত হল। তাকে নিয়ে সকলে আনন্দ করছে। গুরুভাইরা নানা রকম রঙ্গরস করছে। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাঁ রে সারদা, তোর বৈরাগ্যের দৌড় কতদূর?' সে হাসতে হাসতে উত্তর করলো—'কোন্নগর পর্যন্ত।' 'তারপর কি হলো?' 'আর কি হবে, বৈরাগ্যের অবসান'—আবার হাসতে হাসতে উত্তর করলো। 'বল্ না তোর বৈরাগ্যের কাহিনীটা—কি করে উদয় হলো, আবার সঙ্গে সঙ্গেই অস্ত হল'—আর একজন গুরুভাই জিজ্ঞাসা করলো।

'তা হলে শোন'—সারদা সে নির্মল হাস্যরসে ডুবে বলতে লাগলো। 'প্রথম—তীব্র বৈরাগ্যোদয়, তারপর মঠ ত্যাগ ও গঙ্গা উত্তরণ। পদব্রজে কোন্নগর গমন, এক ভক্তের বাগানে অবস্থান, ভিক্ষান্নে উদর পূরণ। কয়দিন বেশ আনন্দেই কাটলো। তারপর শ্রীবৃন্দাবন যাবার ইচ্ছা হল। ভক্তদের কাছে সেই শুভ ইচ্ছা যে-ই প্রকট করা হলো আর বলা হলো, তাহলে আপনারা বৃন্দাবনের ভাড়াটি দিয়ে দিন। তখন একজন রেগে বললো, অত কে দেবে মশায়—টাকাটা সিকেটা হলে হয়' (সকলের উচ্চহাস্য)।

একজন ভক্ত—ঠাকুরের কথা আছে আন্তরিক ডাকলে তিনি 'বৃন্দাবনের ভাড়া'ও দেন—দর্শন দেন।

শ্রীম—হাঁ, তা' বলেছেন। তা' ধ্রুব সত্য। কিন্তু আন্তরিক বলা চাই। আর্ম-চেয়ারে বসে—হয়তো হোক-না, বললে হয় না। ব্যাকুল হয়ে বলা চাই। অন্নজল ছেড়ে দিয়ে—যায় যাক শরীর, তোমায় দর্শন না করে উঠবো না—এরূপ সঙ্কল্প, এই ব্যাকুলতা চাই। বুদ্ধদেবের এটি হয়েছিল। বলেছিলেন, এই আসনে বসলুম। এখান থেকে উঠবো না। যায় যাক শরীর—হাড় মাস সব চূর্ণ হয়ে হাওয়ায় উড়ে যাক্। তবুও উঠবো না—'অপ্রাপ্য বোধিং বহুজন্মদুর্লভাম্'।

ভক্ত—আজ্ঞে ল্যাজারাসের গল্পটা কি ?

শ্রীম—ল্যাজারাস একজন ভক্ত ছিলেন, দরিদ্র ও কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত। ভিক্ষা করে খান। একজন ধনীর বাড়ীতে উৎসব, বহু লোকজন খাচ্ছে। ভিখারী ল্যাজারাসও দ্বারে উপস্থিত। তাঁকে খেতে দেয় নাই। সেখানেই মরে গেল অনাহারে। দেবদূত এসে তাঁকে স্বর্গে নিয়ে গেল। বড় আনন্দে রয়েছেন। সেখানে এব্রাহামও রয়েছেন। একদিন ইনি খুব আর্তনাদ শুনতে পেলেন। চেয়ে দেখেন, ঐ ধনী যম-যন্ত্রণায় ঐরূপ আর্তনাদ করছে। অমনি তার কাছে গিয়ে তাকে স্বর্গে নিয়ে আসতে চাইলেন। রওনা হচ্ছেন, তখন এব্রাহাম বললেন, তুমি দেখছো বটে তাকে, কিন্তু যেতে পারবে না। মাঝে একটা

impassable gulf (দুস্তর সাগর) রয়েছে। তখন ঐ ধনী তাঁকে আর একটি অনুরোধ করলো—তুমি আমার বাড়ী গিয়ে বলে এসো আমার আত্মীয়-স্বজনকে—স্বর্গ-নরক সত্য। ল্যাজারাস রওনা হলেন, অমনি এব্রাহাম্ বাধা দিয়ে বললেন ঐ কথা—তুমি যদি নরকবাসী ঐ ধনীর বাড়ীতে গিয়ে বলে আস—স্বর্গ-নরক সত্য, তার আত্মীয় স্বজন কি তোমার কথা শুনবে?

যদি তাই শুনবে, তবে সংসার থাকে কি করে? মহামায়ার কাজ যে শেষ হয়ে যাবে। তাই মা-ই তাঁর অবিদ্যা-শক্তি দিয়ে ভুলিয়ে দেন, ভেলকি লাগিয়ে দেন। পুত্র মিত্র ধন ঐশ্বর্য—এ সবে ভুলে যায় ঈশ্বরকে।

তাই ঠাকুর সর্বদা প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন, 'তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় ভুলিও না মা—আমায় ভুলিও না'।

সর্বত্যাগী সাধুর সঙ্গ করলে অনেকটা রক্ষা। তাই ঠাকুর সদা সাধুসঙ্গ করতে বলেছেন। শুধু কি বলেছেন, নিজে সাধু তৈরী করে গেছেন। এঁরা সব মঠে থাকেন। এ সাধু পাবে কোথায়? এঁরা কেবল ঈশ্বরকে চান—অন্য কিছু না। নৈকষ্য কুলীন। যেমন চাতক বৃষ্টির জল ছাড়া কিছু খাবে না—ফটিক জল।. যারা ওঁদের সঙ্গে মিশবে, সেবা করবে তারাই ওপরে উঠবে—ওপরে উঠেছে, ওপরে উঠবে। তা' করবে না, খালি ঘ্যানঘ্যান প্যানপ্যান আর আর্ম-চেয়ারে বসে খালি বচন-বিলাস করা—একবার দেখা দিলেই তো সব মিটে যায়।

দেখ না, কি দিব্য আনন্দরসে সাধুরা থাকেন। সারদা মঠ ছেড়ে পালিয়ে গেল, আবার ফিরে এলো। যাওয়াতেও আনন্দ, ফিরে এলেও আনন্দ। কি নির্মল রঙ্গরস গুরুভাইদের সঙ্গে। সবই সেই highest ideal (সর্বোচ্চ আদর্শ) নিয়ে। ভালমন্দ, জয়-পরাজয়, রঙ্গরস, সব তাঁকে নিয়ে।

কিন্তু যারা গৃহে রয়েছে তারা কি তা' করতে পারে? বিষয়ের চিন্তা করতে করতে, বিষয়ীর চিন্তাও এসে পড়ে। তাতে

আরও ডুবে যায়। তাই মন যাতে বিষয়ে না ডুবে যায় তার ব্যবস্থা তিনিই করেছেন। সাধুসৃষ্টিও তাঁর কাজ। Contrast (বিপরীত ভাব) না থাকলে শিক্ষা হয় না। তাই যেমনি তাঁর অবিদ্যা-মায়া সংসারে আবদ্ধ করে, সেইরূপ তাঁর বিদ্যা-মায়া জীবকে সেই সংসার-মায়া থেকে মুক্ত করে, ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। সাধুরা বিদ্যা-মায়ার পূজারী। তাঁদের মন সদা ঈশ্বরের দিকে রয়েছে। তাঁদের ঘড়ি ঠিক চলেছে। অন্যদের ঘড়ি বিশ্বাসযোগ্য নয়।

২

শ্রীম কিছুকাল চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, মন অন্তর্মুখ। এই অবসরে ভক্তগণ কেহ, 'কোচড়ের দাদ' চুলকাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। রাজনীতি, সমাজনীতি, পাশ্চাত্ত্যের যশোগীতি—এই সব বিষয় গুনগুন করিয়া আলোচনা করিতেছেন স্থান কাল পাত্র ভুলিয়া গিয়া। একজন শ্রীমকে বলিলেন, সার্ আশুতোষ চৌধুরীর অনেক গুণ। ইনি হাই কোর্টের জজ ছিলেন। তাঁর শত্রু নাই। সম্প্রতি তিনি দেহত্যাগ করেছেন। শ্রীম আনমনে বলিলেন, তা' হলে ভাল লোক, যার শত্রু নাই, যে সকলকে সন্তুষ্ট রাখে। এবার ভক্তগণ কোমর বাঁধিয়া আরও নানা বিষয়-রসের অবতারণা করিলেন। সকলে মুক্তকণ্ঠ। শ্রীম উহা দেখিতেছেন আর মুচকি হাসিতেছেন। যাদুকরের মত নীরবে যেন একটি সুইচ টিপিয়া দিলেন, কিংবা দুরন্ত বালককে যেন বাহির হইতে টানিয়া আনিয়া ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। শ্রীমর এই ম্যাজিক-স্পর্শে একটি সুখকর নূতন প্রবাহ—একটি প্রশান্ত গম্ভীরভাব নিমেষে আবির্ভূত হইল।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—ইংলণ্ডে কত বড় বড় চিফ জাস্টিস্ গেল। কত বড় বড় প্রাইম্ মিনিস্টারই বা গেল! কোথায় গেল, কেউ একটা খোঁজও আর নিচ্ছে না। এই কথাটাই নেপোলিয়ান বলেছিলেন সেণ্ট হেলেনায় যখন বন্দী। যার careএ (তত্ত্বাবধানে) ছিলেন তার ছেলেদের। ছেলেরা খুব সেবা করতো। ম্যাপ দেখিয়ে

বলেছিলেন, আমি যা করলুম তার এই পরিণাম। কিন্তু ইনি (ক্রাইস্ট) যা করলেন, তা-ই রইল। প্যালেস্টাইন point out (নির্দেশ) করে তিনি এই কথা বলেছিলেন। অর্থাৎ, ক্রাইস্টের কীর্তি অমর, চিরস্থায়ী। Religionকে (ধর্মকে) নিয়ে যারা কাজ করে, তাদের কথাই থেকে যায় চিরকাল—যারা Godকে (ঈশ্বরকে) নিয়ে কাজ করে। অন্য সব কাজ কোথায় যায় তার ঠিক নেই।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি)—উকীলরা কি সব কথা কয়—টাকাকড়ি, এ সবের কথা! ডব্লিউ. সি. বনার্জী জেরা করছেন, তোমার কি আছে? উত্তরে বলছে, এই অত বিঘা জমি, আর এই সব ফলের গাছ। পুনরায় প্রশ্ন হচ্ছে, আর কিছু? উত্তর হলো, না। এই তো এই সব তুচ্ছ কথা—টাকা আর সম্পত্তির কথা।

শঙ্কর নায়ারের 'কেস' হয়েছিল। জাস্টিস্ ম্যাককারডে বলছেন নায়ারের উকীল মোরলেকে, cite (উদ্ধৃত) করেছেন কিনা তাই—মোরেলের criminal experience (ফৌজদারী বিষয়ে অভিজ্ঞতা) কম ছিল। এই তো সব কথা জজ-উকীলদের—ও এটা জানে—সে ওটা জানে না। এই সব তুচ্ছ কথা বই আর তো কিছু কথা নয়।

একজন সাক্ষ্য দিচ্ছে। জজ কি এটা বুঝতে পারছে না যে, এটা cooked evidence (বানানো সাক্ষ্য)? অতদিন ধরে ওকালতি করে জজ হয়েছে যে! এটা বোঝা কিছু শক্ত নয়। কিন্তু technicalitiesএর (প্রয়োগের খুঁটিনাটি) জন্য, হয়তো যে wrong (অন্যায়) করে নি, তার শাস্তি হয়ে গেল—law-এর (আইনের) সঙ্গে মেলে নি বলে। আবার এদিকে বলা হয়েছে equityতে (সত্য ও ন্যায়) বিচার হচ্ছে। যদি তাই হয়, তবে যে wrong (অন্যায়) করে নি তাকে শাস্তি দিলে কেন?

টাকার এমনি মায়া! পারে না, সত্য ও ন্যায়ের মর্যাদা রাখতে। দেখ, এ সব নিয়েই জজ, আদালত—এই সব। ছেলেবেলায় হাই

কোর্টের জজ শুনলে কত বড় লোক মনে হতো। এখন দেখা যাচ্ছে এসব কিছুই নয়। সত্য, ন্যায়, নিরপেক্ষতা বহু দূর।

এক জজ একজন সাঁওতালকে জিজ্ঞাসা করছে, তোমার বয়স কত? সাঁওতাল বললে—আরে জজ, তুই এতো বড়ো হয়েছিস, এতো জানিস্ আর এটা জানিস না?—লিখলে। লিখলে—ষোল সাল (সকলের হাস্য)। ওর বয়স পঞ্চাশেরও উপর। সে এই হিসাব জানে না—unsophisticated mind (সরল নির্মল মন)। (সহাস্যে) অন্য সব লোক বললে—ওরে এরূপ বলিস্ না জজকে, জেল হবে।

জীবনের উদ্দেশ্য কি?—ঈশ্বরদর্শন। তাই যদি হয়, তবে ওরা কি নিয়ে আছে, কি সব করছে? চিত্তশুদ্ধি না হলে ঈশ্বরদর্শন হয় না। ওরা যা নিয়ে আছে তাতে চিত্তশুদ্ধি হয় না, মন মুখ এক হয় না—তা' কেমন করে তবে ঈশ্বরদর্শন হবে? তবে এই হয়—খাও দাও, আর মরে যাও। উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন হলে, এতে তা' হয় না।

জাস্টিস্ সারদা মিত্রের কাছে আমরা পড়েছিলাম। তখন তিনি উকীল। আমরা তখন মাঝে মাঝে হাই কোর্টে যেতাম বিচার দেখতে। একদিন গেছি, সারদাবাবু আমায় দেখে বললেন, তুমি এখানে এসেছ কেন? এখানে এলে লোক বদমায়েস হয়ে যায়। এটা বদমায়েসের আড্ডা। তিনি জানতেন কিনা, আমরা তখন ঠাকুরের কাছে আনাগোনা করছি।

ঠাকুর বলতেন কিনা, শেয়ালের গর্তে যাও, অন্য পশুর লেজটেজ দেখতে পাবে। সিংহের গর্তে যাও, সেখানে দেখতে পাবে গজমুক্তো, গজদন্ত এইসব।

শ্রীম (বড় জিতেনকে লক্ষ্য করে সকলের প্রতি)—তা' হলে দেখা যাচ্ছে, so long as death has not been abolished (যত দিন না মৃত্যু দূর হচ্ছে) ততদিন একটা লক্ষ্য চাই। লক্ষ্য কি? না, ভগবানদর্শন। Death abolish (মৃত্যু দূর) হলে অন্য কথা।

ঠাকুরবাড়ী হইতে প্রসাদী আম আসিয়াছে। সাধু ও ভক্তগণ আম প্রসাদ পাইতেছেন। এখন রাত্রি প্রায় নয়টা। শ্রীম আহার করিতে তিনতলায় গেলেন, ভক্তগণকে কথামৃত পাঠে নিরত রাখিয়া।

১৮৮২ খ্রীস্টাব্দ ১৬ই অক্টোবর। পাঠ চলিতেছে। জগবন্ধু পাঠক। নরেন্দ্র কয়েকজন ব্রাহ্ম বন্ধুসহ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আসিয়াছেন। ঠাকুরের খুব আনন্দ নরেন্দ্র আসায়। নরেন্দ্র প্রিয় প্রভৃতি বন্ধুদের সঙ্গে রাত্রিবাস করিয়াছেন। পরদিন সকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নরেন্দ্র ও বন্ধুরা ঠাকুরের ঘরে আসিয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর তাহাকে বন্ধুদের সঙ্গে বটতলায় ধ্যান করিতে পাঠাইলেন। সকাল নয়টা। কিছুক্ষণ পর ঠাকুর মাস্টারকে সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন।

এখন প্রায় সাড়ে দশটা। ভক্তগণ বেদীর নিচে আসিয়া ঠাকুরের কাছে দাঁড়াইয়াছেন। ঠাকুর উপদেশ দিতেছেন:

শ্রীরামকৃষ্ণ—ধ্যানের সময় ঈশ্বরে একেবারে ডুবে যেতে হয়। ওপর ওপর ভাসলে গভীর জলের রত্ন মেলে না।

শ্রীম আহারান্তে নিচে আসিয়াছেন। পাঠ শুনিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—'রত্ন' মানে ঈশ্বর। ব্রাহ্ম-সমাজের লোক এলে ঠাকুর একটা গান গাইতেন—'ডুব ডুব রূপসায়রে আমার মন। তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবে রে সে রত্ন ধন॥' ওরা খালি লেকচার দিত কিনা, তাই ঠাকুর ধ্যানে ডুবে যেতে বলতেন। লেকচার দিলে শুনবে কে? যদি নিজের অনুভব থাকে তবেই লোক শোনে।

মন তো বহির্মুখী বাইরে বাইরে ঘোরে। তাতেই আনন্দ। কিন্তু যদি তা বাইরে থেকে গুটিয়ে এনে ভেতরে অর্থাৎ ঈশ্বরে নিবিষ্ট করা যায়, তবে ধীরে ধীরে ঐশ্বর্য দেখতে পায়। জ্ঞান ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য শান্তি সুখ, প্রেম সমাধি—এই সব। তারপর তাঁর কৃপায় তাঁর দর্শন হয়।

মনের এক পারে সংসার, অপর পারে ঈশ্বর। এত বড় প্রসার মনের! ঈশ্বরচিন্তাতে মন শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ মনে তাঁর দর্শন হয়।

ব্রাহ্ম সমাজে খালি লেকচার হতো। আমরা মনে করতাম ঐ

লেকচার শুনে ঈশ্বর উপরে বহু দূরে। ঠাকুরের কাছে গিয়ে দেখি, ঈশ্বর হাতের কাছে। কেন? ওঁদের জ্ঞান বই-পড়া জ্ঞান। ঠাকুরের জ্ঞান বাজনার বোল হাতে আনার জ্ঞান। আকাশ পাতাল তফাৎ। তাই ব্রাহ্মদের ধ্যান করতে বলতেন।

পাঠ চলিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন—'মন্দিরে তোর নাইকো মাধব। পদো শাঁখ ফুঁকে তুই করলি গোল।'

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এই দেখ, ঠাকুর বলছেন, খালি লেকচার দিলে কি হবে? আগে হৃদয়-মন্দিরে মাধব অর্থাৎ ভগবান্‌কে প্রতিষ্ঠা কর অর্থাৎ জাগ্রত কর, দর্শন কর। তখন তোমার কথা জগৎ স্তম্ভিত হয়ে শুনবে। ঠাকুর বঙ্কিমবাবুকে বলেছিলেন, তুমি ব'কে যাচ্ছ, দুই দিন শুনবে। তারপর যা তাই। উপরি উপরি ভাসলে রত্ন মিলবে না।

(গদাধরের প্রতি) গোটাকয়েক কথা মুখস্থ করে নিয়ে খালি চোখ বুঁজে থাকলেই কি হলো? নিষ্কাম সেবা না করলে চিত্ত শুদ্ধ হয় না। রত্ন মেলে না।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—যদি না খেতে হতো তা' হলে এতো সব হতো? তাই, তাঁর কাণ্ড বোঝা যায় না। দেখ না, কেমন নিয়ম করে রেখেছেন সংসারে—খাও দাও procreation (সন্তান বৃদ্ধি) কর। এই তো নিয়ম।

কিন্তু এর মধ্যেও যারা চালাক তারা বিয়ে করে না। এরাই ঠিক ঠিক চতুর। বিয়ে করলেই পেটের চিন্তা, অর্থোপার্জন। তাতেই যোগভ্রষ্ট। পাঁচজনের মুখে অন্ন দিতে হবে যে! এক পেট হলে অতটা চিন্তা থাকে না। ভিক্ষা কর, মুখে দুটি দাও, আর দিনরাত তাঁর চিন্তা কর।

মানুষের পেটের চিন্তা না থাকলে সর্বদাই ঊর্ধ্বদৃষ্টি থাকতো। এই পেটের জন্য মানুষের নিম্নদৃষ্টি।

ঠাকুর বলেছিলেন, একটি লোককে দেখলাম ঊর্ধ্বদৃষ্টি, ফৌজদারী বালাখানার মোড়ে।

যে করেই হোক মাধব প্রতিষ্ঠা করা চাই। তবেই শান্তি, তবেই সুখ নিজের ও জগতের।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা, ২৩শে মে, ১৯২৪ খ্রীঃ
৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ সাল, শুক্রবার, কৃষ্ণা পঞ্চমী ২৮।১০ পল।

চতুর্থ অধ্যায়

অবিশ্রান্ত সংগ্রাম চাই মনের সঙ্গে

১

মর্টন স্কুল। চারতলার শ্রীমর শয়নকক্ষ। শ্রীম বিছানায় বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য। দক্ষিণের বেঞ্চেতে বসা অন্তেবাসী। এখন অপরাহ্ণ চারিটা। বাদলার পর হঠাৎ উজ্জ্বল সূর্যকিরণে পৃথিবী উদ্‌ভাসিত।

আজ ১৯শে জুলাই ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, ৩রা শ্রাবণ ১৩৩১ সাল, শনিবার কৃষ্ণা তৃতীয়া, ১৯।১৫ পল।

ডাক্তার বক্সীর প্রবেশ। কিয়ৎক্ষণ পর শ্রীম ডাক্তারকে বলিলেন, শুকলালবাবুর আড্ডাটা একবার দেখে এলে হয়। অনেকদিন থেকে ইচ্ছা হচ্ছে দেখতে। অন্তেবাসী বলিলেন—উত্তম কথা, চলুন আমি নিয়ে যাব। বহুদিন থেকে শুকলালবাবু আমাকে বলছেন, একবার আপনার পায়ের ধূলা যাতে ওখানে পড়ে। উনি তো খুব ভক্ত লোক। ডাক্তারবাবুর মোটর রয়েছে।

শুকলাল সঙ্গতিপন্ন সদাশয় লোক। অনেক ব্যবসা আছে। কলিকাতায় তাঁহার অনেক বাড়ী। লোকদের খাওয়ান-দাওয়ানতে তাঁহার খুব আনন্দ। বাড়ীতে নিত্য পূজা আছে। জ্যেষ্ঠা কন্যা বিধবা, তাই তাহার জন্য স্বতন্ত্র রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপিত। উৎসবাদি মাঝে মাঝে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবক সাধু ও ভক্তগণের সর্বদা সেবা

করেন। শ্রীমকে খুব ভালবাসেন। অতবড় স্থূল কায় লইয়া প্রায় নিত্য বেলেঘাটা হইতে আমহার্স্ট স্ট্রীটে যান শ্রীমকে দর্শন করিতে কখনও গাড়ী করিয়া, কখনও পদব্রজে তপস্যার ভাবে। বেলুড় মঠেও যাতায়াত আছে। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ খুব স্নেহ করেন। মঠের সাধুদেরও প্রিয়। ইঁহার কাছে থাকিয়া কেহ কেহ বেলুড় মঠের সাধু ও ভক্ত হইয়াছেন। শ্রীমর কাছে যে সব সাধু ও ভক্ত থাকেন বা সর্বদা যাওয়া-আসা করেন তাঁহাদিগকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করান। সাধুগণকে অর্থ দিয়াও সেবা করেন। শ্রীমর মিহিজাম বাসের সময় প্রায় নিত্য বিবিধ দ্রব্যপূর্ণ পার্শেল সেবার জন্য পাঠাইতেন। ঠাকুরের কুমার-ভক্ত মনোরঞ্জন তাঁহার কাছে থাকেন আর সম্পত্তি ম্যানেজ করেন।

শ্রীম মোটরে আরোহণ করিলেন। সঙ্গী হইলেন ডাক্তার ও অন্তেবাসী। ডাক্তার শ্রীমর পাশে পিছনের সিটে বসিয়াছেন। অন্তেবাসী বসিলেন ড্রাইভারের পার্শ্বে। তিনি পথপ্রদর্শক।

গাড়ী আমহার্স্ট স্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, লোয়ার সার্কুলার রোড দিয়া শিয়ালদহ স্টেশনের দক্ষিণে অবস্থিত বেলেঘাটা মেইন রোডে আসিয়া প্রবেশ করিল। তারপর পামারবাজার রোড অতিক্রম করিয়া সাউথ শিয়ালদহ রোড বা চূণাপট্টির ৯/১ নম্বর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহা শুকলালের অফিসবাড়ী, দোতলা টিনের ঘর, দক্ষিণে সদর রাস্তা, তারপর খাল। গৃহটি উত্তর দক্ষিণে লম্বমান। উত্তর দক্ষিণে প্রশস্ত বারান্দা, তাহাতে চওড়া বেঞ্চ পাতা।

শ্রীমকে হঠাৎ আসিতে দেখিয়া শুকলাল আনন্দে আত্মহারা। তিনি বারান্দায় বেঞ্চিতে বসিয়া ছিলেন, উঠিয়া বস্ত্রাঞ্চলে বিশাল শরীর ঢাকিয়া ক্ষিপ্রগতিতে মোটরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, আর যুক্ত করে গলবস্ত্রে নতশির হইয়া শ্রীমকে প্রণাম করিলেন। এইবার শ্রীমকে সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা করিয়া বারান্দার বেঞ্চেতে বসাইলেন।

শ্রীম বসিয়াছেন বেঞ্চের উত্তর প্রান্তে পশ্চিমাস্য। তাঁহার সম্মুখে

গৃহাভ্যন্তরে চৌকির উপর ফরাসে বসিয়া কর্মচারীগণ কাজ করিতেছেন। তাঁহাদের পশ্চাতে দেয়ালে শ্রীদুর্গার প্রাচীন তৈলচিত্র রহিয়াছে। তাঁহারই পাশে রহিয়াছেন ঐশ্বর্যের অধিকারিণী শ্রীলক্ষ্মী দেবী। ছবিগুলির সম্মুখে একটি তক্তাতে আছে পূজাদ্রব্য। কর্মচারীগণ উঠিয়া আসিয়া শ্রীমকে প্রণাম করিলেন।

এইবার শ্রীম শুকলালকে বলিলেন—চলুন, বাড়ীটি একবার দেখবো। যে আজ্ঞা, বলিয়া শুকলাল তাহার সঙ্গে চলিলেন। পূর্ব দিকে দুইখানা বাড়ীর পরই বার নম্বর সাউথ শিয়ালদহ রোড। ইহাই বসতবাড়ী, বাড়ীখানি দক্ষিণমুখী। উত্তরাস্য হইয়া শ্রীম বারান্দায় উঠিয়া পশ্চিমের দরজা দিয়া বাড়ীর বহির্ভাগে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর পূর্ব দিকের বৃহৎ একতলা গৃহের অভ্যন্তরে গিয়া চেয়ারে দক্ষিণাস্য উপবিষ্ট হইলেন। ইহাই শুকলালের শয়নগৃহ। ইহার উত্তর দিকে দুইটি প্রকোষ্ঠ। পূর্ব প্রকোষ্ঠে জ্যেষ্ঠ পুত্র থাকে, আর পশ্চিমেরটি ঠাকুরঘর। দুই ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, শিবদুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি দেব-দেবী ও দেব-মানবের ছবি আছে। শয়নগৃহের দেওয়ালেও বহু দেব-দেবীর ছবি বিলম্বিত।

এই একতলা গৃহের উত্তরে উঠান, তারপর রান্নাঘর। ইহার পশ্চাতে বাগান, গোশালা প্রভৃতি। একতলা গৃহের পশ্চিমে একটি বৃহৎ দ্বিতল গৃহ উত্তর-দক্ষিণ লম্বমান। উহার উপরে ও নিম্নে পরিজনগণ বাস করেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীম ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন ও উত্তরাস্য হইয়া সকল দেব-দেবীকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন—তাঁহাদিগকে বাম হাতে রাখিয়া। তারপর উঠান দিয়া বাগানে প্রবেশ করিলেন। শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, কয়টি গরু আছে? শুকলাল বলিলেন, গোশালা খালি, এখন গরু একেবারেই নাই। শ্রীম সহাস্যে বলিলেন—ও, আমার মামার বাড়ীতে কিন্তু এক গোয়াল ঘোড়া (সকলের হাস্য)।

শ্রীম ফিরিতেছেন। শুকলালের কনিষ্ঠ পুত্র ফণি আসিয়া প্রণাম করিল। তাহার বয়স সাত আট। শ্রীম তাহার স্কন্ধে হাত রাখিয়া চলিতে লাগিলেন। শ্রীম বাড়ীর দক্ষিণের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। সম্মুখে সাউথ শিয়ালদহ রোড, তারপরে খাল। এইবার জিতু আসিয়া শ্রীমকে প্রণাম করিল। তাহার বয়স ষোল বৎসর, শুকলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র। অন্তেবাসী তাহার পরিচয় বলিলেন।

শুকলালের শ্যালক যুবক অম্বিকাচরণ টায়ফয়েডে ভুগিতেছে। দ্বিতল গৃহের নিম্নতলের দক্ষিণের গৃহে তাহার রোগশয্যা। শ্রীম বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সময় উহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে ডাক্তার বক্সীকে বলিতেছেন—যান না, একবার দেখে আসুন। ডাক্তার অন্তেবাসীর সহিত রোগীর গৃহে প্রবেশ করিয়া পরীক্ষা করিতেছেন। রোগী এখন আরোগ্যের দিকে চলিয়াছে। মহিলাগণ সেবারতা। ডাক্তার আসিয়া শ্রীমকে সকল কথা নিবেদন করিলেন। শ্রীম বলিতেছেন, দেখেছি অবধি মনটা ঐখানে পড়ে রয়েছে। সামনে যেতে পারছি না—বড় কষ্ট হচ্ছে। তাই আপনাদের পাঠালাম।

শুকলাল বলিলেন, রমেশের পিতা বাসাবাড়ীতে অসুস্থ। শ্রীম বলিলেন, তা' হলে একবার ওঁকেও দেখে এলে হয়। এই বলিয়া শ্রীম উঠিয়া পড়িলেন। শুকলাল অনুনয় করিয়া শ্রীমর সম্মুখে মিষ্টির রেকাব ধরিলেন। শ্রীম কণিকামাত্র গ্রহণ করিয়া পুনরায় আসিয়া অফিসে বসিলেন। অন্তেবাসী ও ডাক্তার রমেশের পিতাকে দেখিয়া আসিয়া শ্রীমকে সব বলিলেন। শ্রীম এক্ষণে অফিসের দ্বিতলের দক্ষিণের বারান্দায় গোল চৌকির উপর বসা, পাশে শুকলাল। রমেশ কলেজে পড়েন, মায়ের মন্ত্রশিষ্য।

শ্রীম এইবার একতলায় বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছেন। এখন যাইতে হইবে। তিনি ডাক্তারকে ঘরের ভিতরের দুর্গাদেবীর তৈল-চিত্রখানা দেখাইয়া বলিলেন, এই ছবিখানা, মা দুর্গার লঙ্কাদ্বীপের ছবি। একশ' বছরের পুরানো, ভারি সুন্দর!

শ্রীম এইবার আসিয়া মোটরে উঠিলেন। শুকলাল অতি কৃতার্থ মনে শ্রীমকে নতশিরে প্রণাম করিলেন। এক ঘণ্টা পর গাড়ী পুনরায় পূর্বের রাস্তায় চলিল।

শ্রীম শিয়ালদহ রেল স্টেশন দেখিবেন। দশ মিনিটের জন্য গাড়ী স্টেশনের অঙ্গনে প্রবেশ করিতেছে উত্তরের ফটক দিয়া। শ্রীম গাড়ীতে বসিয়াই বাম হাতের মিষ্টির দোকান, রেষ্টুরাঁ প্রভৃতি বালকের ন্যায় কৌতুহল ও আনন্দের সহিত দেখিতেছেন। বাম হস্তে মেইন স্টেশন ছাড়াইয়া সাউথ স্টেশনের দিকে গাড়ী যাইতেছে। সম্মুখে অনেকগুলি যাত্রী স্ত্রীপুরুষ যাইতেছে। তাহাদের গা ঘেঁষিয়া গাড়ী যাইতেছে দেখিয়া শ্রীম ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, দেখ কি careless (অমনোযোগী)! সাবধানে যাওয়া উচিত দূর দিয়ে।

গাড়ী দক্ষিণের ফটক দিয়া সারকুলার রোড পার হইয়া বৌবাজার দিয়া চলিতে লাগিল। বাম হাতে গির্জার ঘণ্টা বাজিতেছে। বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরের ফটকে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইয়াছে। শ্রীম অন্তেবাসীকে বলিলেন, দেখে আসুন তো পটলবাবু আছেন কিনা। উনি থাকলে একবার নেমে দেখার ইচ্ছা আছে। উপেনবাবুর বাড়ী কিনা। উপেনবাবু ঠাকুরের ভক্ত। শরীর গেছে। ছেলে সতীশ খুব লায়েক হয়েছে। সেই এসব বাড়িয়েছে। সতীশ বুঝি এখানে নাই এখন।

শ্রীমর আগমনবার্তা পাইয়া পটলবাবু দৌড়াইয়া আসিয়া শ্রীমকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দ্বিতলে লইয়া যাইতেছেন। রাস্তার ডান হাতে নিম্নতলে লিনো মেসিন দেখাইয়া উপরে উঠিয়াছেন। সমগ্র দ্বিতল সর্বত্র পুস্তকরাশিতে পরিপূর্ণ। দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক বসুমতী এই স্থান হইতে বাহির হয়। দ্বিতলের পূর্ব দিকে দাঁড়াইয়া শ্রীম দেয়ালে বিলম্বিত বৃহৎ ছবিসমূহ দেখিতেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও পার্ষদগণের ছবি। পটলবাবুকে বলিলেন, কই, মা সরস্বতীর ছবি কোথায়? পটল বলিলেন, 'আজ্ঞে উপরে আছে।' শ্রীম উত্তর করিলেন, এখানে রাখলে বেশ হয়—বিদ্যামন্দির কিনা! পটল

সবিনয়ে বলিলেন, 'আজ্ঞে আচ্ছা—এখানেই রাখা হবে।' শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, উপেনবাবু কোথায় বসতেন? পটলবাবু উহা দেখাইলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে সতীশের ঘর, সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের ঘর দেখাইলেন। শ্রীম সব দেখিয়া বলিলেন, এই স্থান অতি পবিত্র।

পটলবাবু একটি বিরাট গ্রন্থ বিশ্বকোষ, পঞ্চম ভাগ শ্রীমর সম্মুখে আনিয়া ধরিলেন, আর বলিলেন, 'ইহা The Records of Imperial Visit (সম্রাটের ভারতদর্শন)।'

শ্রীম আসিয়া গাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। পটলবাবু ও দুই তিন জন ভক্ত ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। গাড়ীতে আসিবার সময় রাস্তার দুইধারে বোর্ডে অনেকগুলি দৈনিক বসুমতীর কপি রহিয়াছে। বহু লোক পড়িতেছে। শ্রীম একটু দাঁড়াইয়া অন্তেবাসীকে বলিলেন, দেখুন, কি রকম সব পড়ছে! সব ভুলে গেছে! এর ফটো নিলে হয়!

ইহারা সব অফিসের ফেরৎ। কেহ কোমরে হাত রাখিয়াছে। কাহারও হাত বগলে। কেহ পিছনে ছাতার উপর শরীরের ভার রাখিয়াছে। কেহ হেলিয়া দাঁড়াইয়াছে। কাহারও হাতে অফিসের ফাইল। কাহারও হাতে তরিতরকারির ঝোলা। সবাই যুবক ও মধ্যবয়সী। অফিসের খাটুনীতে শরীর ক্লান্ত, কিন্তু মনে অদম্য উৎসাহ। ইঁহারা বুঝি দেশপ্রেমিক রাজনীতিরসিক!

গাড়ী আমহার্স্ট স্ট্রীটে প্রবেশ করিয়া উত্তর দিকে চলিতে লাগিল। ডান হাতে মির্জাপুর পার্ক, লোকে পূর্ণ। এখানে বালকবালিকার খেলার অনেক রকম সরঞ্জাম রহিয়াছে। গাড়ী একটু থামিল। কেহ স্লাইডে ওঠা নামা করিতেছে, কেহ সুইঙ্গে দোল খাইতেছে, কেহ সি-সতে উঠিতেছে নামিতেছে, কেহ কেহ রেস খেলিতেছে, কেহ কুস্তি করিতেছে। শ্রীম এইসব দেখিয়া আনন্দে ভরপুর—চোখে মুখে বালকের ন্যায় আনন্দের ছটা। আনন্দে অন্তেবাসীকে বলিতেছেন, দেখুন দেখুন, কি আনন্দ ছেলেদের! এ সবই দেখতে হয়। তবে ধাত ঠিক থাকে। গাড়ী হ্যারিসন রোড

পার হইয়াছে। শ্রীমর চোখে মুখে আনন্দের হাসি। বলিতেছেন, যত দেখি ততই শিখি।

২

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। এখন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। ভক্তগণ শ্রীমর অপেক্ষায় বসিয়া আছেন—ভাটপাড়ার ললিত, ভোলানাথ, বসন্ত, ভীম, 'দীর্ঘকেশ' প্রভৃতি। ইঁহারা প্রতি শনিবার শ্রীমকে দর্শন করিতে আসেন অফিসফেরত।

শ্রীম ডাক্তারের মোটরে ডাক্তার ও জগবন্ধুকে সঙ্গে লইয়া বেলেঘাটা ও বসুমতী সাহিত্য-মন্দির ঘুরিয়া আসিয়াছেন দুই ঘণ্টার উপর। তাই ক্লান্ত হইয়া ছাদের উন্মুক্ত হাওয়াতে উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া কোনও কথা নাই, সকলে নীরব। ইতিমধ্যে নিত্যকার ভক্তগণ আসিয়া একত্রিত হইয়াছেন—বড় জিতেন, শচী, শান্তি, ছোট নলিনী, উকীল ললিত, বলাই, হিলিংবাম (দুর্গাপদ) প্রভৃতি। ডাক্তার বক্সী ও জগবন্ধু রহিয়াছেন।

শ্রীম আকাশের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। মনটি যেন ডিমে তা দিতেছে। কিছুক্ষণ পর কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ছেলেরা যখন ঘুড়ি ওড়ায় তখন তাদের মন উর্ধ্বদিকে, ঐ ঘুড়িতে। তেমনি যারা যোগী, তাদের দৃষ্টি সর্বদা উর্ধ্বদিকে। মানে, ভগবান ছাড়া তাদের আর কোনও দিকে লক্ষ্য নাই—আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত। তাই গীতায় আছে, তপস্বী, কর্মী ও জ্ঞানীর চাইতেও যোগী বড়। যোগীগণের মধ্যে যাঁর মনপ্রাণ সব অন্তরাত্মাতে মগ্ন তিনি শ্রেষ্ঠ যোগী, যেমন ঠাকুর।

এখানে একটি ক্রমের নির্দেশ রহিয়াছে। সাধারণ মানুষের অপেক্ষা তপস্বী, কর্মকাণ্ডী ও জ্ঞানী বড়। এরা শাস্ত্র মানছে,—এসব করছে। কিন্তু মন অন্তরে নয়—যেন mechanical (যন্ত্রচালিতবৎ) সব। এদের চাইতেও কর্মযোগী, ভক্তিযোগী, রাজযোগী ও জ্ঞানযোগী বড়। এদের সকলেরই নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক জন্মিয়াছে।

এরা তারই ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায়রূপে সজ্ঞানে এসব অভ্যাস করছে, নিষ্কাম হতে চেষ্টা করছে। এই অভ্যাসে যোগীদের চাইতে আত্মদ্রষ্টা যোগী, অর্থাৎ যাঁর ভগবানদর্শন হয়েছে তিনি বড়। ভগবৎদ্রষ্টাদের ভিতর অবতারাদি বড়। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'যোগিনামেব সর্ব্বেষাং'— তারপর কি ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার—যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

শ্রীম—'মদ্গতেনান্তরাত্মনা' মানে, মন প্রাণ সবই ভগবানে অর্পিত। সংসারে অন্য কিছু ভাল লাগে না। স্ত্রী পুত্র কন্যা ধনৈশ্বর্য, নামযশ, স্বর্গফলাদি কিছুতেই মন নাই। এই সব মিথ্যা বোধ হয়ে গেছে। তা' বলে কি তিনি একটা negative state (নাস্তিবাচক অবস্থা) প্রাপ্ত হয়েছেন ? না, তা' নয়। সকল আনন্দের উৎস, সকল রসের মূল যে ভগবান, তিনি কেবল সেই দিব্যরস উপভোগ করছেন। এটা positive state (বাস্তব অবস্থা)। বিষয়রসভোগে অরুচি আছে কিন্তু এতে তা' নাই। যত উপভোগ করবে আরও চাইবে—তার শেষ নাই।

ঠাকুর তাই একটি ভক্তকে বলেছিলেন, তাঁতে অরুচি হয় না, তৃপ্তিও মেটে না। যত খাও আরও চাই। তবে বিষয়ভোগের অতৃপ্তি, আর এই অতৃপ্তি এক নয়। এ অতৃপ্তি মানে, অতিশয় তৃপ্তি। যাঁর এ অতৃপ্তি এসেছে তিনি জীবন্মুক্ত; জন্মমরণচক্রের বাইরে চলে গেছেন।

ঐ ভক্তটি এক দৃষ্টিতে ঠাকুরের দিকে চেয়ে থাকতেন। তাই দেখে ঠাকুর বলেছিলেন, সবটা মন যদি কুড়িয়ে এখানে এলো তবে আর বাকী রইল কি ?

ক্রাইস্টও বলেছিলেন এই কথা মেরীর সম্বন্ধে। মেরী ক্রাইস্টের দিকে চেয়ে থাকতেন অপলক দৃষ্টিতে—কখনও ভাবসমাধি হয়ে যেতো—মন প্রাণ সব ক্রাইস্টে নিমগ্ন। বলেছিলেন, 'But one thing is needful: and Mary hath chosen that

good part. (একটিমাত্র দ্রব্য কাম্য এবং মেরীর সেই দুর্লভ বস্তুটি লাভ হয়েছে) অর্থাৎ তাঁতে প্রেম হয়েছিল।

বড় জিতেন—আমাদের দৃষ্টি সর্বদাই নিচে পড়ে আছে। যদিও বা ঘুড়িটা একটুখানি উপরে উঠলো অমনি গোপ্তা খেয়ে পড়ে যায়। উপায় বলে দিন।

শ্রীম (সহাস্যে)—হাঁ জী, উপায় বাতাইয়ে। কতবার তো বলেছেন তিনি এর উপায়। বলেছেন সাধুসঙ্গ কর, সাধুসেবা কর। অর্থাৎ যাদের মন সর্বদা উপরে থাকে, তাঁতে লগ্ন, তাঁদের সঙ্গ করলে তোমার মনও ঐরূপ ওপরে উঠবে ক্রমে ক্রমে। নড়বো না, চড়বো না—কিছুই করবো না, আর অমনি ঘরে বসে মন উপরে উঠে যাবে?

আমাদের সামনে কতবড় ideal (আদর্শ) রয়েছে। আরে ঠাকুর তো এলেনই এই জন্য লোকের মনকে উপরে ওঠাতে। যা শাস্ত্রে বলা হয়েছে সেই সব দেখাতে এসেছেন তিনি। 'যুক্ততমো' যোগী তিনিই। দেহের হুঁস নাই, দিবারাত্রি জ্ঞান নাই, মন ব্রহ্মে লীন।

আমরা সব অত বড় ঘরের ছেলে, কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নাই। খালি বলে, উপায় বলুন। চেষ্টা কর, যোগীদের সেবা কর, পানতামাক খরচা কর, তবে হবে।

কঠিন বটে, তবে তাঁর শরণাগত হয়ে কাঁদলে তিনি সব করে দেন। কলিকালের জন্য এই সহজ রাস্তা দেখিয়ে গেছেন ঠাকুর—কাঁদ আর বল, দেখা দাও।

ভিজে কাঠের মত দিন রাত জলে পড়ে থাকলে কি করে হবে? আগুনের কাছে, জল সব শুকিয়ে যাবে, মন-ঘুড়ি তখনই 'শ্যামাপদ-আকাশেতে' উড়বে। তখন তার স্বভাবই হয়ে যায় ঐ ব্রহ্মাকাশে ওড়া। কেন? না, ও যে মানুষের birthright (জন্মগত অধিকার)। ওদিকে যে মনের নিবাসস্থল! সমাধি তো জীবের normal (স্বাভাবিক) state (অবস্থা)। বিষয়ে ডুবে গিয়ে মনের এ দুর্গতি। মাকে বললে, ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে, তিনি

এই ভিজা দেশলাইকেই আবার শুকিয়ে দেন। তখন ঘষলেই আগুন জ্বলে।

তপস্যা চাই। সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য বুঝতে হলেও তপস্যার দরকার। তপস্যা মানে, এই environment (পরিবেশ) থেকে বাইরে যাওয়া। তখন একা থাকলে নিজের এই দুরবস্থা বোঝা যায়। তখন প্রতিকারের চেষ্টা আসে।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—ঠাকুর বলতেন, আকাশের দিকে দৃষ্টি থাকা ভাল। মানে, এতে ঈশ্বরকে মনে পড়বে।

উঃ কি অদ্ভুত কাণ্ড.আ করেছেন। Relentless war declare (অবিশ্রান্ত যুদ্ধঘোষণা) না করলে হয় না। ওঠাপড়া সর্বদা হবে, কিন্তু চেষ্টা ছাড়বো না, যাবৎ না কাজ হাসিল হচ্ছে, এই সঙ্কল্প চাই।

ধনলাভের জন্য কত চেষ্টা করে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অনবরত চেষ্টা করে। আবার যখন ঘরে আসে তখন বগলে করে কাগজপত্র নিয়ে আসে। বাড়ী বসে ঐ সব দেখে। যদি ধনলাভেই অত চেষ্টার দরকার তা' হলে পরম ধন লাভে কত বেশী চেষ্টার দরকার? ভাবে, ওটা ফাঁকতালে মেরে নেবো। তা হয় না। পড়ে পড়ে কাঁদ আর বল, করে দাও। ঠিক ঠিক শরণ নিলে তিনি সব করে দেন।

শ্রীম স্বামীজীর সম্বন্ধে মাসিক বসুমতীতে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহার প্রথম পরিচ্ছেদ পাঠ হইল। শ্রীম এবার ভাষ্য করিতেছেন।

শ্রীম—দেখ, স্পষ্টভাবে বলছেন স্বামীজী, ভারতকে ওঠাতে হলে শ্রীরামকৃষ্ণকে আদর্শরূপে গ্রহণ করতে হবে। ভারতের জীবনীশক্তি আত্মজ্ঞান। সেই আত্মজ্ঞান আবার সকল জ্ঞানের আকর। কেবল রাজনীতিজ্ঞানে ভারত উঠবে না। ঠাকুরের এক কথা—ঈশ্বরদর্শন মানুষ-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ও কর্তব্য। ভারতের বৈশিষ্ট্য এই ঈশ্বরদর্শন, আগে ঈশ্বর পরে জগৎ। ভারত উঠেছিল এই জ্ঞান অবলম্বন করে। আবারও উঠবে এই পথ দিয়েই।

আর একটি কথা বললেন, ঠাকুরকে পূর্ণরূপে জেনেছেন কেবল ঠাকুর। অপর কেউ জানে না। তিনি অসীম সমুদ্র, এর এক ঘটিতে অপরের হেউ ঢেউ হয়ে যায়। জগতের মুকুটমণি—ভারত।

আজ সোমবার, ২১শে জুলাই, শ্রীনাগপঞ্চমী তিথি, ১৫ দণ্ড, ৪৩ পল। মর্টন স্কুলের ভক্তরা আজ শ্রীমর জন্মদিন বলিয়া উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন। শ্রীমকে গতকাল রাত্রিতে জানানো হইয়াছে। গতকাল সারাদিন ভক্তগণ উৎসবের দ্রব্যাদি খরিদ করিয়াছেন দেখিয়া শ্রীমর সন্দেহ হওয়ায়, জগবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? তিনি সাহসে ভর করিয়া সকল কথা বলিয়া দিলেন। শ্রীম সব শুনিয়া উদাসীন রহিলেন। তিনি কখনও নিজের নাম প্রচার চাহেন না। 'গুপ্ত' গুপ্তই থাকিতে চান। তিনি চাহেন, তাঁহার আরাধ্য দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচার, পূজা ও উৎসব।

ভক্তরা শ্রীমকে আরও বলিলেন, আজের এই উৎসবের আসল প্রেরণাদাতা জ্ঞান মহারাজ প্রভৃতি মঠের সাধুগণ। তাঁহারা এই উৎসবে যোগদান করিবেন। আগামী কাল সকলে আসিবেন। এই কথা শুনিয়া শ্রীম শান্ত হইলেন। ভাবিলেন, তা' বেশ, ঠাকুরের পূজা হইবে আর সাধুগণের সঙ্গ ও সেবা। ইহা উত্তম।

উৎসবস্থল ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বক্সীর গৃহ। উহা কাশীপুর পল্লীর সদাগরপট্টিতে অবস্থিত। এখানে পশ্চিমাঞ্চলের আহিরগণ গরু ও মহিষ রাখিয়া দুগ্ধের ব্যবসা করে। বহুদূর পর্যন্ত চারিদিকে খোলার ঘর। তাহার মাঝে ডাক্তারের দ্বিতল গৃহ। ডাক্তার থাকেন দ্বিতলে। রাস্তা হইতে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি আছে।

এখানে ঠাকুরের নিত্য পূজা প্রতিষ্ঠিত। নিত্য ফল মিষ্টি নিবেদন করা হয়। কখনও অন্নভোগ হয়। সাধুরা ইহার নাম রাখিয়াছেন 'কাশীপুর আশ্রম'। সাধু ও ভক্তগণের সর্বদা আসা যাওয়া আছে; তাঁহাদের সেবা হয় এখানে। পীড়িত হইয়া কখন কখন সাধু ও ভক্তগণ আসিয়া এখানে থাকেন।

ডাক্তারের ধর্মপত্নী দেশের বাড়ীতে রহিয়াছেন কৃষ্ণনগরে।

ডাক্তারের একটি কন্যা আছে। মহিলারা এখানে না থাকায় সাধু ও ভক্তগণের অবাধ গতি।

আজ নানারকম রান্না হইতেছে—পোলাও প্রভৃতি। কেন না, ঠাকুরের ভোগ হইবে, আর সাধুভক্তগণ প্রসাদ পাইবেন।

ঠাকুরঘর পত্রপুষ্পে সুশোভিত। ঠাকুর, মা, শ্রীমর ছবি বড় বড় গোলাপের মালা দিয়া সজ্জিত। সুগন্ধ দ্রব্য ও ধূপাদিতে সমগ্র আশ্রমটি আমোদিত। একদিকে পূজা করিতেছেন মঠের একজন সাধু, অপর দিকে ভজন করিতেছেন সকলে মিলিয়া। ঠাকুরের প্রিয় মায়ের নাম একটার পর আর একটা গীত হইতেছে হারমোনিয়াম, পাখোয়াজ আদি যন্ত্রসহযোগে।

বেলুড় মঠ হইতে আসিয়াছেন জ্ঞানমহারাজ, স্বামী গিরিজানন্দ, শান্তানন্দ, ধর্মানন্দ, রামানন্দ, রামেশ্বরানন্দ, অমলানন্দ, ওঙ্কারানন্দ, অশেষানন্দ প্রভৃতি সাধুগণ। আর কলিকাতা হইতে আসিলেন খোকা মহারাজ।

পূজা ও ভোগ সম্পন্ন হইলে, আরতির পর সাধুগণ প্রসাদ পাইলেন পরিতোষপূর্বক। ফল মিষ্টি দধি প্রভৃতির আয়োজন প্রচুর। তাহার পর বসিলেন ভক্তগণ, মর্টনের ও বাহিরের। সকলে মিলিয়া এক শত লোক হইবে।

এখন বেলা তিনটা বাজিয়াছে। উদ্বোধন হইতে স্বামী সারদানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শরীর ভাল না থাকায় আহার করিয়া আসিয়াছেন। এখানে ফল মিষ্টি প্রসাদ কিঞ্চিৎ লইলেন।

বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় শ্রীম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনিও আহার করিয়া আসিয়াছেন, শরীর ভাল নয়। ভক্তগণের খুব আনন্দ হইল। সংশয় ছিল আসেন কিনা। তিনি ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং চরণামৃত লইলেন। বড় অমূল্য ও ভক্তগণ তখন ভজনে মত্ত। গাহিতেছিলেন—ঠাকুরের প্রিয় সঙ্গীত 'মজলো আমার মন ভ্রমরা'। শ্রীম ধ্যানস্থ, নিশ্চল। যোগাসনে বসিয়া শুনিতেছেন। 'গয়াগঙ্গা', 'কখনও কি রঙ্গে থাক

মা'—এসব সমাধিপ্রসূ সিদ্ধসঙ্গীতও ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল। শ্রীমর প্রশান্ত গম্ভীর মুখমণ্ডলে, একটি দিব্য শান্তি—প্রেমানন্দ তরঙ্গায়িত। ভক্তগণ কেহ কেহ উহা দর্শন করিতেছেন অনিমেষ নয়নে। ডাক্তারগৃহ আজ পুণ্যতীর্থ ভক্ত সমাগমে। ওঁ শান্তিঃ।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা। ২১শে জুলাই ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ,
৫ই শ্রাবণ ১৩৩১ সাল, সোমবার, নাগপঞ্চমী।

পঞ্চম অধ্যায়

ভারত আবার উঠবে আত্মজ্ঞান মহিমায়

১

মর্টন স্কুল। চারতলার শ্রীমর কক্ষ। অপরাহ্ণ চারিটা। শ্রীম শয্যার উপর বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য। বামদিকে বেঞ্চিতে বসা অন্তেবাসী, উত্তরাস্য।

গতকাল নাগপঞ্চমীতে ভক্তগণ কাশীপুরে ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বক্সীর বাড়ীতে শ্রীমর জন্মোৎসব করিয়াছেন। স্বামী সারদানন্দ, সুবোধানন্দ প্রভৃতি ঠাকুরের সন্তানগণের সহিত মঠের অনেক সাধু ঐ উৎসবে যোগদান করেন ও প্রসাদ পান। এই উৎসব মঠের সাধুদেরই প্রেরণায় হয়। ভক্তগণ গোপনে সকল আয়োজন করিয়া শ্রীমকে শেষ মুহূর্তে জানান। শ্রীম নিজে গুপ্ত—গুপ্ত থাকিতেই ভালবাসেন। বলেন, প্রকাশ করতে হয় ঠাকুরকে প্রকাশ কর। এতে নিজের ও জগতের কল্যাণ।

শ্রীম অন্তেবাসীর সঙ্গে ঐ উৎসবের কথা কহিতেছেন—প্রধান উদ্যোক্তা কে কে, প্রেরণা দিল কে, খরচা হ'ল কত, টাকা দিল কে কে—এইসব সংবাদ।

শ্রীম—আমার খুব আহ্লাদ হয়েছিল কাল ঠাকুরঘরে গিয়ে।

বেশ সাজিয়েছিল। আহা, কি সব দুর্লভ গোলাপ—সুগন্ধে ঘর একেবারে আমোদিত। এ না হলে কি আর উৎসব হয়? তার উপর মঠের অত সব সাধু এসেছিলেন—শরৎ মহারাজ, খোকা মহারাজ প্রভৃতি। (সহাস্যে) জ্ঞান মহারাজই বুঝি প্রেরণাদাতা? তাঁর বেশ originality (মৌলিকতা) আছে। অনেক রকম প্রেরণা দেন যুবকদের। অপরের মনে হয়তো এসব ভাব ওঠেই না। কিন্তু উনি ও সব আবিষ্কার করেন।

ঐ বাড়ীটি তীর্থ হয়ে গেল আর কি। কিছু প্রসাদ অদ্বৈতাশ্রমে পাঠান উচিত ছিল। উৎসবে যা' খরচ হয়েছে তা' লিস্ট করে রাখা ভাল। আগামী বৎসর ঐ দেখে estimate (ফর্দ) করা যাবে।

'মজলো আমার মন ভ্রমরা'—ঐ গানটিতে মন টেনে রেখেছিল। অমূল্যবাবু গেয়েছিলেন বুঝি?

অন্তেবাসী—সকলের আনন্দ হয়েছে বটে, কিন্তু ডাক্তার-গৃহিণী যোগদান করতে পারেন নি বলে দুঃখিত। তাঁর বাড়ীতে উৎসব, তিনিই অনুপস্থিত।

শ্রীম—হাঁ, তা'তো হবারই কথা। আপনি যেমন বলেন, তা' হলে ভক্তেরা উৎসবই করতেন না ওখানে।

সন্ধ্যার মজলিশ বসিয়াছে ছাদে। বড় জিতেন, শুকলাল, জগবন্ধু, মনোরঞ্জন, ডাক্তার বক্সী, বিনয়, গদাধর, ছোট নলিনী প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়াছেন। শ্রীম চেয়ারে বসিয়া আছেন দক্ষিণাস্য। সন্ধ্যার আলো আসিতেই ভক্তসঙ্গে ধ্যান করিতেছেন। কিয়ৎকাল পরে উঠিয়া গিয়া উত্তর প্রান্তে পায়চারী করিতেছেন। আবার আসিয়া বসিলেন আসনে। এবার কথা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুর বলেছিলেন, সর্বকর্ম ত্যাগ করে সন্ধ্যার সময় ঈশ্বরচিন্তা করতে হয়। নিত্য নিয়মিতভাবে এই ধ্যানচিন্তা অভ্যাস করতে হয়। একবার অভ্যাস হয়ে গেলে তখন আর না করে পারা যায় না—না করলে মন খারাপ হবে। সকাল সন্ধ্যায় আসনে বসা কেন? মনকে বাঁধতে। মন দিনরাত চলছে বাইরের

দিকে, সংসারের বিষয়ের দিকে—বাঁদরের মত চঞ্চল। এই চঞ্চল মনটাকে ধরে এনে অন্তরে ভগবানের পাদপদ্মে বাঁধার চেষ্টা করা। অভ্যাস নিত্য করা চাই, তখন সহজ হয়। প্রথমে তো একটু খারাপ লাগবেই। মনের সঙ্গে যেন যুদ্ধ ঘোষণা করা। পরে অভ্যাস ও তাঁর কৃপাতে বশীভূত হয়। বাইরে যাচ্ছে ছেলেটা বার বার, তাকে ধরে এনে ঘরে বসান—এই আর কি!

অবতার এলে খুব সুবিধা। তখন ধ্যান-চিন্তার যেন জোয়ার এসে যায়, চার দিকে হৈ চৈ—যেন উৎসব আর কি, যেমন রাজা এলে রাজ্যময় সাড়া পড়ে। ঠাকুর আসাতে কত ভাল ভাল সাধু দেখা যাচ্ছে। এই বাংলা দেশে কোথায় ছিল, এই সব সাধু, আশ্রম, মঠ? নেড়ানেড়িতে দেশ ছেয়ে গিছলো! এখন কত আশ্রম দেখা যাচ্ছে।

আমরা শকুন্তলা প্রভৃতি কাব্যে আশ্রমের কথা কত পড়তাম আর কল্পনা করতাম। এখন আর কল্পনা করতে হয় না—চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে আশ্রম, সাধু এই সব—খুব ভাল ভাল সাধু এঁরা। কত বিদ্যা, কত গুণ—এ সব ছেড়ে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল। এই সাধুদের দিয়েই দেশ উদ্ধার করবেন আর ধর্মের পুনরায় প্রতিষ্ঠা করবেন, তাই এঁদের আগমন।

এঁরাও এখানকারই লোক—এতদিন নিদ্রিত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সূর্যের আগমনে কমল বিকশিত হয়ে গেছে—হৃদয়কমলস্থিত সুপ্ত ভগবান জাগ্রত হয়েছেন। তাই, এই সব মধুকর মধুর সন্ধানে ছুটে এসেছে শ্রীরামকৃষ্ণচরণকমলে। কত কৃতী সাধু সব—বি.,এ., এম. এ., বি. এল., ডাক্তার, কত সব আছেন এঁদের ভেতর। সব ছেড়ে এঁরা ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল। বাঁশীর ডাকে যেমন গোপীরা সব ছেড়ে এসেছিলেন, এও তেমনি।

কেন এই ডাক, এই সাধু সৃষ্টি? ঠাকুর বলেছেন, কলিকালে সাধুসঙ্গই ধর্মলাভের একমাত্র পথ। তাই বলেই ক্ষান্ত হন নি—সাধু সৃষ্টিও করেছেন। এই সাধুদের সৃষ্টি করায় সংসারীরা শান্তির সহজ পথ পাচ্ছে।

গোপীদের তিনি বাঁশীর তানে সর্বস্ব ছাড়িয়ে ব্যাকুল করে কেন আনলেন? তা' না হলে যে রাসলীলা হয় না—প্রেমভক্তির গৌরবময় উজ্জ্বল সুমধুর দৃষ্টান্ত জগদ্‌বাসী লাভ করতে পারতো না। তেমনি এই সাধুদের টেনে এনেছেন সব ছাড়িয়ে—তাঁদের কল্যাণের জন্য, ভারতের কল্যাণের জন্য, আবার জগতের কল্যাণের জন্য। এই সাধুদের মুক্তি তাঁদের করতলগত। এঁরাই সব ভারতের লুপ্ত গৌরব—আত্মজ্ঞান লাভ করে ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করবেন। তখন ভারত উঠবে আবার। আবার তাঁর মহিমা জগতে প্রচারিত হবে—আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞানের মহিমা। তখন জগৎ শান্ত হবে। আবার সত্যযুগ আসবে।

তাঁর প্ল্যান কি মানুষ বুঝতে পারে? লোকে মনে করে পলিটিশিয়ানরা সব করছে। তা' নয়। এর পেছনে ঈশ্বরের একটা সুকল্পিত প্ল্যান রয়েছে। এই ভারতের পতন, পাশ্চাত্ত্যের উত্থান—এর পশ্চাতে একটা বলিষ্ঠ পরিকল্পনা রয়েছে। অনন্তকাল বসে বসে এই করছেন—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। আবার সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যুগ। ভারত এখন কলির কবলে। ঠাকুর এসে সত্য যুগের সূচনা করে গেলেন। স্বামীজী দেখেছিলেন 'শূদ্রযুগ' আসছে। তাই ঠাকুর পূর্বাহ্নেই ব্রহ্মযুগ বা সত্যযুগের বীজ ফেলে গেছেন। এই সাধুরা সত্যযুগের, ব্রহ্মযুগের অগ্রদূত। একদিকে এই পশুর ন্যায় ভোগ, অন্য দিকে এই বিরাট ত্যাগ। ভাঙ্গন ও গড়ন—এই তাঁর কাজ। তিনিই 'নররূপধর', আবার 'নির্গুণ গুণময়'।

বড় জিতেন—রত্নাকর দস্যু সাধুসঙ্গে মহর্ষি বাল্মিকী হয়েছিলেন।

শ্রীম (জনান্তিকে)—অনেকে মুখে খালি লেকচার দেয়, করে কই সাধুসঙ্গ? হাতে নাতে করতে হয় সাধুসঙ্গ। মুখে বললে কি হয়? নড়তে চায় না কেউ। ঠাকুর কখনও বলতেন, শালারা ডুব দেয় না (হাস্য), খালি মুখে কয়। তখন অনেকে ধর্মপ্রচার করতো কিনা। তারা খালি লেকচার দিত। ডুব না দিলে কি বোঝা যায়?

২

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—এই চেয়ে দেখুন না, কি কাণ্ডখানা আকাশে চলছে। অনন্তের অনন্তকাণ্ড চলছে!

ভাবতে হয়—অনন্ত সচ্চিদানন্দ-সমুদ্র! সব জলে জলময়। তাতে মীন হয়ে আমি, মানে জীব, বিচরণ করছি আনন্দে।

এইসব ধ্যানের কথা বলেছিলেন ঠাকুর। এইরূপ ধ্যান করার অভ্যাস করতে হয়। তাঁর কৃপা হলে এই ক্ষুদ্র জীবরূপী নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে সমুদ্র হয়ে যায়। জীবাত্মা পরমাত্মাতে মিলিয়ে যায়। তখন সব শান্ত। সংসার, স্ত্রী পুত্র কন্যা, নন-কোঅপারেশন, পলিটিক্স—কিছুই থাকে না। তখন কিন্তু সব একাকার। ও-টিই summum bonum of life (জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য)। তার জন্যই রোজ অভ্যাস দরকার।

বড় জিতেন—সে অবস্থায় তাহলে কোনই ভেদ থাকে না, গুরু-শিষ্য, ছোট-বড়?

শ্রীম—'সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্য দেখা নাই', বলেছিলেন ঠাকুর। সব দ্বৈত ভাব বিদূরিত হয়। বাইরের জগৎ সব রয়েছে, কিন্তু যোগীদের কাছে তার কোনও বোধ নাই। সব সচ্চিদানন্দ। এক দুই নাই সেখানে। তাই বেদে বলেছেন, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। এমন 'এক' যার 'দুই' নাই। তখনই 'মদ্গতান্তরাত্মা'।

এই সব অবস্থাই ঠাকুরের জীবনে দেখা গেছে। শরীরটা একটা কাঠের মত পড়ে আছে—মন কোথায় বিলীন হয়ে গেছে। অনেক নিচে নেমে এসে জগতের সীমাপ্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখতেন, এই নামরূপ সব। কিন্তু তখনও সচ্চিদানন্দে মনকে এত টেনে রেখেছে যে তখনও দেখতেন, সচ্চিদানন্দই নামরূপে বাইরে প্রকাশিত। সচ্চিদানন্দের এই অলৌকিক খেলা। মানুষ, জীবজন্তু, বৃক্ষলতা, ঘর বাড়ী—সব সচ্চিদানন্দে মোড়া। সব সচ্চিদানন্দ। সেই অবস্থায়ই ভোগের লুচি বিড়ালকে খাইয়ে দিছলেন।

বড় জিতেন—সে অবস্থায় ঈশ্বরীয় রূপাদি থাকে না কি?

শ্রীম (ব্যঙ্গচ্ছলে)—উঃ, অত দূর থেকে হয় না। হাটে ঢোক, তখন বুঝতে পারবে কোথায় কি—কোথায় আলু, কোথায় পটল। এ সব আর্ম-চেয়ারে বসে হয় না। তখন বোঝা যাবে কোথায় শ্যামপুকুর, কোথায় গড়ের মাঠ।

সিদ্ধি সিদ্ধি করলে নেশা হয় না। বেঁটে খাও, তবে হবে। বাজনার বোল মুখে বললে কি আনন্দ হবে?—যে বলে তার, কিংবা যে শোনে তার? হাতে আনলে তখন উভয়ের আনন্দ।

বড় জিতেন—না মশায়, ধ্যান হয় না। গভীর ধ্যান হলে তো তাতে ডুবে গিয়ে ঈশ্বরকে ধরা যেতো।

আজ একটি উকীল হাই কোর্টে বলেছিলেন, ধ্যান কর। অত পড়ে কি হবে? তাই তা দৈববাণী বলে মনে হয়েছিল। এখানেও তাই শুনছি।

শ্রীম অর্থপূর্ণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। নির্বাকভাবে যেন বড় জিতেনের কথার উত্তর দিতেছেন—মৌনব্রত ধারণ কর। মনন কর। তবে দৃষ্টি অন্তর্মুখীন হবে। তখন পরমাত্মার ধ্যান সম্ভব হবে।

শ্রীমর সহিত সকলেই মৌন। হঠাৎ এক মহা নীরবতার আবির্ভাব হইয়াছে। শ্রীমর মন অতি ঊর্ধ্বে পরমাত্মাতে বিলীন। সান্নিধ্যবশতঃ ভক্তদের মনও প্রভাবিত হইল। তাহাদের মনও অনায়াসে উপরে উঠিল। কিছুক্ষণের জন্য গভীর শান্তি বিরাজমান।

অনেকক্ষণ পর বড় জিতেন আহত হইয়াও সাহস অবলম্বন করিয়া শ্রীমর কাছে আত্মনিবেদন করিতেছেন অতি বিনীতভাবে।

বড় জিতেন—আচ্ছা, এখানে যে আমরা বসছি, এতে পূর্বজন্মের (শুভকর্ম) আমাদের কিছু ছিল?

শ্রীম ভিতর হইতে মনকে টানিয়া ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর করিলেন—ঠাকুর হলেন highest man: highest ideal (সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ)। তাঁর কথা শুনবার জন্য আপনারা আসছেন, তা আর ছিল না?

শ্রীম (সকলের প্রতি)—আহা, highest idealএর (সর্বোচ্চ

আদর্শের) জন্য ব্যাকুলতা। It is a sight for the gods to see (এটি দেবদৃশ্য)।

দেবতাদেরও এই ব্যাকুলতা হয় না। কেন? তারা যে ভোগ নিয়ে রয়েছে! ভোগ যদি আট আনা থাকে, তা হলে আট আনা ব্যাকুলতা কমে যাবে।

ঈশ্বরের জন্য মানুষের এই ব্যাকুলতা হয় কেন? তারা যে সম্মুখে মৃত্যুকে সর্বদা দেখছে! তাই ভাবে, মৃত্যু তো এই শরীর নিয়ে যাবে। অতএব এই নশ্বর শরীর দিয়ে নশ্বর ভোগ করে লাভ কি হবে? যেই এই ভাবনা এসে যায় অমনি মন বিদ্রোহী হয়ে যায়। ব্রহ্মানন্দ ভোগে লালায়িত হয়। এরই নাম ব্যাকুলতা।

আমরা এই ভাঙ্গা ভিজে বেঞ্চিতে বসে আছি বলে কিছু নই? তা' নয়। আমরা কত বড় ideal (আদর্শ) চিন্তা করছি। ঠাকুর কিনা আমাদের ideal (আদর্শ)। ঠাকুর মানে, যিনি দিবানিশি, চব্বিশ ঘণ্টা পরব্রহ্মে লীন। কোমর থেকে কাপড় খসে পড়ে গেল। তেমনি মন থেকে জগৎ ঝরে পড়লো—যেমন পাকা আম ঝরে পড়ে। মা, মা রব মুখে সদা যাঁর।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি)—ব্যাকুলতা মানে—struggle for the highest ideal, yearning for the goal। সর্বোচ্চ আদর্শের জন্য সংগ্রাম, লক্ষ্যে পৌঁছুবার তীব্র বাসনা।

ঠাকুরের কথা যাদের শুনতে ভাল লাগে, বুঝতে হবে, তারা struggle (সংগ্রাম) করছে for the realisation of the highest goal—সর্বোচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য।

ভগবানের জন্য struggle (সংগ্রাম) করছে, এ দেখতে বড় সুন্দর, বড় উদ্দীপক। It is a sight for the gods to see (এ দৃশ্য দেবগণেরও দর্শনীয়)।

এ দেশে এই ব্যাকুলতা সর্বদা দেখা যায়। ও দেশে (ওয়েস্ট) কোথায় তেমন ব্যাকুলতা? ক্রাইস্ট এসেছিলেন বলে ঐ সময় হয়েছিল। তা না হলে materialism (জড়বাদ)—সর্বদা ভোগের চিন্তা।

(গানের সুরে) 'এ হাটে বিকোয় না সুতো, বিকোয় কেবল নন্দরাণীর সুত।' 'সুতো' মানে symbol for ভোগ (ভোগের চিহ্ন)। 'নন্দরাণীর সুত', মানে highest ideal (সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ)।

বড় জিতেন—কোথায় মশায়—(ব্যাকুলতা) ?

শ্রীম (কথা শেষ না হইতেই, ধমক দিয়া)—'নাই', কি করে তুমি বলছো ? 'আছে'টা ধরতে পারছ না বলে কি ? তুমি কি সব জান ? কতটুকু তোমার দৃষ্টি ? তোমার অহংকারের মূল্য কি ? তুমি কি জানতে মায়ের পেটে ছেলে হয়ে কি করে এলে ?

তাই ঠাকুর বলতেন, রাতে যখন ঘুমিয়ে থাকে মানুষ, তখন যদি কেউ তার মুখে পেচ্ছাব করে দেয় সে টের পায় না—মুখ ভেসে যায়। সেই মানুষের আবার অহংকার।

দেখ না, কি helpless state (অসহায় অবস্থা) মানুষের।

৩

আহা, একটিবার চেয়েই দেখ না শরীরটার ভিতর কি কাণ্ডখানা চলছে। এই পৃথিবীর জিনিস দিয়েই এটা তৈরী। কোত্থেকে এই 'প্রাণ'টা এলো ? কি করে এলো ? তারপর 'মনবুদ্ধি'। এই মাটির তৈরী মনবুদ্ধি দিয়ে আবার highest ideal (সর্বোচ্চ আদর্শ) ঈশ্বরকে realise (দর্শন) করা যায়। কি অদ্ভুত যন্ত্র করেছেন।

এতে আবার কর্তাগিরি থাকে কোথায় ? এই helpless state (অসহায় অবস্থা) মানুষের।

তাই ঠাকুর আমাদের শিখিয়ে দিছলেন প্রার্থনা করতে মার কাছে—'মা তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।' চারদিকে এই মায়া—এই দৈবী দুরত্যয়া মায়া। রোজ প্রার্থনা করতে হয়।

একটি ভক্ত (বিস্মিত হইয়া স্বগত)—শ্রীমর ভক্তসঙ্গে খেলা, এও দেখছি বিচিত্র। বড় জিতেন কথা কইতে ভালবাসেন। ধমক

দিয়ে তাঁকে চুপ করতে বললেন। বড় জিতেনের মন ধমক খেয়ে নিরাশার মধ্যে নিমজ্জিত। আবার তাঁকে উপরে উঠাচ্ছেন। বললেন, তোমরা 'ভাঙ্গা ভিজে বেঞ্চিতে' বসে আছ বলে কিছু নও তা' নয়। তোমরা উত্তম মানুষ। কেন ? না, শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তা করছ। সচ্চিদানন্দ নররূপে শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমরা তাঁর জন্য ব্যাকুল। নইলে এখানে রোজ কেন আসবে তাঁর কথা শুনতে ? বড় জিতেন আপত্তি করলেন, 'কোথায় ব্যাকুলতা ?' অমনি আবার চাবুক। বললেন, তুমি কি 'নিজেকে' জেনেছ ? তবে কি করে বলছো ব্যাকুলতা নাই ? যারা 'নিজেকে' জেনেছে, তাদের কথা শুনে চল। 'নিজেকে' জানা মানে পরমাত্মাকে জানা।

এ যেন বিড়ালের ইঁদুর নিয়ে খেলা। প্রথমটা একটু খেলে শেষ জীবের অহংকারটাকে অবশ করে শ্রীভগবানের বৃহৎ অহংকারের সঙ্গে যুক্ত করে দেন। তখন এই অবশ জীবই ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বলীয়ান হয়—মৃত সঞ্জীবিত হয়।

শ্রীম (একজন যুবকের প্রতি)—যোগী মানে, যে সর্বদা এই sense world (বস্তু জগৎ) থেকে মনটাকে তুলে রাখে পাখীর মত। ডিমে তা-দেওয়া পাখীর সবটা মন ডিমে। তেমনি যোগীর মন ঈশ্বরে। সব দেখে কিন্তু ফ্যালফ্যাল নজর—দৃষ্টি অন্তরাত্মায়। এমন ভক্তও আছে—কেবল তাঁকে চায়—'নন্দরাণীর সুত'। অন্য কিছুতে মন নাই। সর্বদা highest ideal (সর্বোচ্চ আদর্শ) চোখের সামনে।

যুবক—অন্য রকম লোকের সঙ্গে থাকলে মন নেমে যায়।

শ্রীম—তা' আর নয়। বিবেকানন্দ থিয়েটার দেখতেন না। কেন ? না এতে মন অনেক নিচে নামিয়ে দেয় তাই। নামরূপের influence (প্রভাব) বড্ড বেশী। একটা রূপ দেখ। যদি ভাল হয় মন ঈশ্বরের দিকে যাবে। যদি অন্য রূপ হয় তবে ভোগের দিকে যাবে। এদিকে গেলেই মন ফেঁসে গেল। তাকে তুলতে আবার কত পরিশ্রম। তাই সাধকের অবস্থায় অত বাছবিচার।

তবে 'guardian tutor'-এর (গৃহশিক্ষকের, গুরুর) সঙ্গে সর্বত্র যেতে পারে। যেমন আমরা গিছলাম চৈতন্যলীলা দেখতে ঠাকুরের সঙ্গে। তা নইলে নয়। মন অ—নে—ক নামিয়ে দেয়।

এই যে শব্দ এ কি কম—খুব প্রভাব। শব্দের প্রতিপাদ্য তিনিই। চণ্ডীতে আছে পঞ্চাশৎ শব্দরূপিনী মা। এক একটা শব্দের কত বড় influence (প্রভাব) দেখ না। (ছোট রমেশের প্রতি) তুমি বল না 'সন্ন্যাসী'। দেখবে এতে তোমার মনের কত পরিবর্তন হয়ে যায়।

Realisation (ঈশ্বরদর্শন) হলে শব্দ বলা কমে যায়—চুপ হয়ে যায়। ঠাকুর বলতেন, কলসী পূর্ণ হলে ভগ্‌ভগানি থাকে না। মধুকর ফুলে বসলে ভন্‌ভনানি চলে যায়।

কথা বলিতে বলিতে শ্রীম ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া ঠাকুরের মহামন্ত্রস্বরূপ গান ধরিলেন। একটার পর একটা গাহিয়া চলিলেন। যেন ফোয়ারা খুলিয়া গিয়াছে।

গান। এ কি বিকার শঙ্করী।

গান। জীব সাজ সমরে রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।

গান। সুরা পান করি না আমি সুধা খাই জয় কালী বলে।

গান। প্রভু ম্যয় গোলাম ম্যয় গোলাম তেরা।

গানের সঙ্গে সঙ্গে একটি জগৎভোলা শান্তিময় ভাব গৃহের ভিতর ছড়াইয়া পড়িল। ভক্তগণ দেবদত্ত এই দৈবী আনন্দময় সম্পদ কিছুকাল ভোগ করিলেন।

গান শেষ হইলেও শ্রীম অনেকক্ষণ নীরব রহিলেন। তারপর আবার কথামৃত বর্ষণ করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—'গুরুদত্ত বীজ লয়ে',—মানে, যে নামটি দিয়েছেন সেটি। সে-টি সাধন করতে করতে highest idealএর (সর্বোচ্চ আদর্শের) দর্শন হবে। তখন সব চুপ। দেখতে বা শুনতে হয়তো দু'টি কথা। কিন্তু তারই ভিতর অনন্ত শক্তি রয়েছে। দেখ না, অশ্বত্থের বীজ—দেখতে কত সূক্ষ্ম, চোখে প্রায় দেখাই যায়

না। কিন্তু তার ভেতর কত বড় অশ্বত্থ বৃক্ষ রয়েছে। তেমনি 'নাম'। নামের ভেতর নামী অর্থাৎ ঈশ্বর রয়েছেন।

Potentiality (শক্তি) কত নামের। আবার highly explosive (অতিশয় বিস্ফোরক)। ভেতর থেকে burst (বিস্ফোরণ) ভোগবাসনা সব crush (বিনষ্ট) করে দেয়, সব জ্বলে ভস্ম হয়ে যায়। এ জ্বলনে জ্বালা নাই। আছে কেবল শান্তি, প্রশান্তি। শব্দ নাই। আছে কেবল এক সুমধুর নীরবতা।

যে কাণ্ড macrocosmএ (ব্রহ্মাণ্ডে) চলছে তাই microcosmএও (ভাণ্ডে, জীবে) চলছে।

বড় জিতেন (অভিভূত হইয়া)—পাগল না হলে এ হয় না।

শ্রীম—পাগল দু'রকম আছে। প্রথম, ঈশ্বরের জন্য পাগল। এটি ভাল। আর দ্বিতীয়, বিষয় নিয়ে পাগল। সকলেই তো পাগল বিষয় নিয়ে, ঈশ্বরের জন্য পাগল ক'জন?

বড় অমূল্য—চব্বিশ ঘণ্টাই তো পাগল (শ্রীমর হাস্য)!

শ্রীম (স্মিত হাস্যে)—কতক্ষণ?

বড় অমূল্য—চব্বিশ ঘণ্টা—সর্বদাই।

শ্রীম—হাঁ, সর্বদাই। কি নিয়ে রয়েছে লোক দেখ না।

Mutual Admiration Societyর (স্তাবক সংঘ) মেম্বররা ভাবে, আমাদের সব হয়ে গেছে। কিন্তু নিজে যে পাগল সে দিকে হুঁশ নাই।

কাম ক্রোধ লোভের হাতে সকলেই পাগল। বাঁদর-নাচা নাচে কামাদিতে। এই দুরবস্থা মানুষের। এ নিয়ে আবার অহংকার!

শরণাগত, প্রভো, শরণাগত। এই এক পথ বাঁচবার। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'—অন্য পথ নাই। মহাপুরুষগণ এই পথ দেখিয়ে গিয়েছেন—ঋষিগণ, অবতারগণ, দেবমানবগণ। Highest men (সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ) যা বলে গেছেন তাই আমাদের করা উচিত।

কলিকাতা, ২২শে জুলাই, ১৯২৪ খ্রীঃ
৬ই শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল। মঙ্গলবার, কৃষ্ণা ষষ্ঠী ১৫।৪১ পল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাধু শাস্ত্রের জীবন্ত ভাষ্য

১

কলিকাতা মর্টন স্কুল। তিন তলার পূর্বদক্ষিণ কোণের ঘর। শ্রীম মেঝেতে বিছানায় শয়ন করিয়া আছেন। অসুস্থ। আজ সকালে একটু ভাল ছিলেন।

গত ২২শে জুলাই রাত্রি হইতেই শ্রীম অসুস্থ। আমাশার ভাব পেটে। তাই শরীরে অল্প জ্বর এই কয়দিন চলিতেছে। কিন্তু শ্রীমর ঈশ্বরীয় কথামৃত বর্ষণের বিরাম নাই। নিত্য ভক্তগণ, সাধুগণ আসিতেছেন। ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ছাড়া শ্রীম থাকিতে পারেন না। তাই ভক্তগণকে সাদরে আহ্বান করিয়া তিনি নিজের বিছানার কাছে মাদুরে বসান।

আজ একটু ভাল আছেন। তাই মঠের কুশল সংবাদ লইবার জন্য জগবন্ধু ও ছোট জিতেনকে মঠে পাঠান। ইঁহারা এখানেই থাকেন। মঠের সংবাদ লইয়া ভক্তগণ ফিরিয়াছেন বেলা এগারটায়। তাঁহাদিগকে দেখিয়াই ব্যগ্রভাবে মঠের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—মঠের সব কুশল তো? কিছু কথাবার্তা হলো কারো সঙ্গে?

ছোট জিতেন—অনঙ্গ মহারাজ আমাকে বললেন, পূর্বের মত রাত্রিতে মঠে গিয়ে থাকতে, অন্তত মাঝে মাঝে। তা নইলে অগত্যা সকালে যেতে।

শ্রীম—আর কিছু কথা হলো কারো সঙ্গে?

ছোট জিতেন—আজ্ঞে না। সুধীর মহারাজের সঙ্গে অনঙ্গ মহারাজের বিচার বিলাস হচ্ছিল ব্রহ্মসম্বন্ধে।

শ্রীম—কি সব কথা হলো?

ছোট জিতেন—সুধীর মহারাজ বললেন, ব্রহ্ম সকলের বড়। অন্য কিছু বিশেষণ দিলে, অন্যভাবে বললে তাঁকে ছোট করা হয়। ব্রহ্ম ছাড়া অন্য সবই ছোট। অনঙ্গ মহারাজ এ কথা মানেন না। তিনি বলেন, সবই ব্রহ্ম—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' তিনি বড়র বড়, ছোটর ছোট। 'অণোরণীয়ান্ মহতোমহিয়ান্'। পুরাণ, ভাগবতাদিতে তাঁরই কথা বলা হয়েছে।

শ্রীম—বা, অনঙ্গের তো বেশ ভাবটি হয়েছে। (সহাস্যে) একটা কুয়োর ব্যাঙ জিজ্ঞাসা করেছিল—সাগর কত বড়, আর একটা সাগরের ব্যাঙকে। সে উত্তর করলো, অনেক বড়। কুয়োর ব্যাঙ একটা লাফ দিয়ে বললো, এত বড়? অপরটি বললো, না, আরও বড়। তখন কুয়োর ব্যাঙ এক লাফে কুয়োর এক দিক থেকে অন্য দিকে চলে গেল। এবারেও যখন উত্তর শুনলো, সাগর এর চাইতেও বড়, তখন সাগরের ব্যাঙকে গালি দিয়ে বললো, তোর চৌদ্দ পুরুষেও কখন সাগর দেখে নি। এর চাইতে, অর্থাৎ কুয়োর চাইতে বড় কিছু হতে পারে না (সকলের হাস্য)। আমাদের সকলেরই এই অবস্থা। ঈশ্বর অনন্ত সাগর। কিছু বলে তাঁর শেষ হয় না।

ঠাকুর বলতেন, তিনি নির্গুণ নিরাকার, তিনিই আবার ভক্তের জন্য সগুণ সাকার। একেরই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। এ বললেও তো বড়ই হলেন। তিনি সর্বদাই বড়। আমরা যাকে ছোট বলি, তাও যে তিনিই। কারণ 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। আবার ঠাকুরের মহাবাক্য, আমি দেখছি মা-ই সব হয়েছেন।

যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, বাক্যমনের অতীত, ব্রহ্ম—তিনিই লীলাচ্ছলে জীবজগৎ হয়েছেন তাঁর শক্তিকে আশ্রয় করে। শক্তি ব্রহ্ম অভেদ, ঠাকুর বলতেন।

এক এক stageএর (অবস্থার) কথা। এই stageএ (অবস্থাতে) এই ভাল লাগে। অন্য stageএ (অবস্থাতে) আবার আর এক রকম ভাল লাগে।

সুধীর মহারাজ খুব সাধু—তপস্যা করেছেন কত। স্বামীজীর

সমস্ত বই translate (অনুবাদ) করেছেন বাংলায়। অনঙ্গও খুব। এদিককার এম. এ. ফিলজফিতে, আবার তপস্যা করছে। মঠের সব ভার ওঁরই উপর বলতে গেলে।

এই সব ভাল ভাল সাধুদের বিচারও শোনা যায় মঠে গেলে। আবার ধ্যান ভজন তপস্যা এসবও দর্শন হয়। কত বড় privilege (সুবিধা) এটা। ঘরের কাছেই মঠ। ঠাকুর আসাতেই এ সব আয়োজন। লোকে বুঝতে পারে না কত বড় সৌভাগ্য। তাই তার advantage (সুযোগ) নেয় না। বিনা খরচায়, মনে কর, অমূল্য সম্পদের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে।

এই সব বিচারও কা'কে নিয়ে? সেই highest idealকেই (সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শকেই) নিয়ে। যা ভাবে তাই করে, আবার তাই বলে। চিন্তা কাজ কথা, সবের ভিতর দিয়েই বের হচ্ছে সেই একই বস্তু, ব্রহ্ম। এই সব বিচার সাধু ভক্তদের বচন-বিলাস।

অপর লোক কি নিয়ে আছে দিনরাত? সব নিম্ন চিন্তা, অন্ন কথা, পেটের দিকে দৃষ্টি। হদ্দ লোকমান্য! আর এঁরা চব্বিশ ঘণ্টা তাঁরই চিন্তা করছেন—whole time man! Amateur religion (সখের ধর্ম) নয় এঁদের। কখনও বিচার, কখনও কাজ, কখনও সেবা, কখনও ধ্যানভজন—এই নিয়ে কাটে এঁদের দিন। কি ব্যাকুলতা! কিসে তাঁকে লাভ হয় সর্বদা সেই চেষ্টা।

শ্রীম (ছোট জিতেনের প্রতি)—আপনি কিছু বিচার করলেন?

ছোট জিতেন—আজ্ঞে না। আগে করতাম। এখন করি না।

অপরাহ্ণ চারিটা। শ্রীম তিন তলার পূর্বদক্ষিণ কোণের ঘরেই শুইয়া আছেন। শরীর অসুস্থ, তাই। স্বামী শান্তানন্দ শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, সঙ্গে অদ্বৈতাশ্রমের ব্রহ্মচারী উপেন। উনি কাশীতে থাকেন, সম্প্রতি বেলুড় মঠে আসিয়াছেন। খুব তপস্বী লোক। শ্রীমর অতিশয় স্নেহভাজন প্রিয়জন। একবার শ্রীম ইঁহার সঙ্গে থাকিয়া কাশীতে তপস্যা করিয়াছিলেন—কাশী গিরির বাগানে। মঠ হইতে অদ্বৈতাশ্রম হইয়া এখানে আসিয়াছেন। শ্রীম তাঁহাকে

পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন। কাছে বসাইয়া তাঁহার সহিত নানা তীর্থ ও তপস্যার কথা কহিতেছেন।

স্বামী শান্তানন্দ—ভুবনেশ্বর খুব সাধন ভজনের স্থান। আমার বোধ হয়, আমাদের সকল মঠ, আশ্রমের মধ্যে ভুবনেশ্বর মঠ সাধন-ভজনের পক্ষে খুব অনুকূল। দোতালায় উঠলে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ মাঠ, তারপর পাহাড় দেখা যায়।

শ্রীম—বৌদ্ধযুগে ওখানে অনেক তপস্যা হয়েছে। কাছেই পুরী। এসব স্থান তপস্যার অনুকূল সর্বদাই। বেশ হয়েছে ওখানে মঠ হওয়ায়। রাখাল মহারাজের এদিকে খুব দৃষ্টি ছিল। তাঁরই একান্ত চেষ্টায় হয়েছে। আহা, তিনি চলে গেলেন! ঐ স্থানটি তাঁর খুব পছন্দসই ছিল।

কাশী, হরিদ্বার, ঋষিকেশ, উত্তর কাশী—এসব স্থানও তপোভূমি। বাতাবরণে তপস্যার ভাব রয়েছে। শ্রীমর আদেশে অন্তেবাসী সাধুদের জন্য মিষ্টি লইয়া আসিলেন—ছয় আনার সন্দেশ, ও ৪টি সিঙ্গারা। সাধুরা মিষ্টিমুখ করিয়া বিদায় লইলেন।

২

সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই নিত্যকার ভক্তগণ আসিয়া সমবেত হইতেছেন তিনতলার কোণের ঘরে। শ্রীম অসুস্থ, শুইয়া আছেন। ভক্তগণ শ্রীমর পাশে মাদুরে বসিলেন। শুকলাল, দুর্গাপদ, বড় জিতেন, ভৌমিক, মনোরঞ্জন, শান্তি, বড় রমেশ, জগবন্ধু শ্রীমর বিছানার পাশে বসিয়া আছেন। একটু পর আসিলেন বলাই, ছোট নলিনী, ডাক্তার ও বিনয়। এ কথা সে কথা হইতেছে। সন্ধ্যার আলো আসিতেই শ্রীম বসিয়া ধ্যান করিতেছেন—ভক্তগণ সঙ্গে। ধ্যানান্তে শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ভুবনেশ্বরে মঠ হয়েছে। শুনলাম, খুব অনুকূল সাধন ভজনের পক্ষে। সাধু ভক্ত আনাগোনা করলে শীঘ্র জেগে উঠবে। (জগদীশের প্রতি) আপনারা গিছলেন কি ওখানে?

জগদীশ—আজ্ঞে না। মঠে শুনলাম খোকা মহারাজের মুখে, ওখানে কূয়োর ভেতর থেকে একটা spring (ঝরণা) বের হয়েছে। তা'তেই খুব জল হচ্ছে, আর বেশ ভাল জল। খোকা মহারাজ যাবেন দেখতে।

শ্রীম (সহাস্যে)—বিকালে খগেন মহারাজ (শান্তানন্দ) আর একজন ব্রহ্মচারী এসেছিলেন। তাঁদের কাছে শুনলাম, সরিষায় আশ্রম হয়েছে ঠাকুরের। আমায় যেতে বললেন। আমি বললাম, আরও যদি বিশ বছর বাঁচি, তা'হলে সব একবার দেখতে পারা যায় (সকলের হাস্য)।

শ্রীম—কেন, আর এক রকমও হতে পারে। দেহ গেলে যদি ঈশ্বরের সঙ্গে মিশে যায় তাহলে কি হয়, তা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু যদি অন্য এক লোকে যায়, সেখান থেকেও তো দেখা যায়।

অশ্বিনী চক্রবর্তী ও জগদীশ আজও আসিয়াছেন। শ্রীমর কথায় ভক্তরা অনেকে চারতলার ছাদে উঠিয়া গিয়াছেন খোলা হাওয়াতে। শ্রীমর কাছে এখন বসিয়া আছেন অশ্বিনী, জগদীশ, ছোট জিতেন, দুর্গাপদ মিত্র ও জগবন্ধু। জগদীশ মহাপুরুষ মহারাজের কথা ও মঠের নানা কথা কহিতেছেন। কথায় কথায় নারাণ আয়াঙ্গারের কথা উঠিল।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আহা, আয়াঙ্গার মশায়ের কি অদ্ভুত জীবন! Slowly (ধীরে ধীরে) সব করে করে শেষে একেবারে সন্ন্যাস। এ-টি কি গৃহস্থদের পক্ষে কম শিক্ষা? ডেপুটি কমিশনার (জেলাধীশ) ছিলেন—কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু সব ছেড়ে দিলেন। ওঁর খরচেই বাঙ্গালোরে মঠ হয়েছে। আবার যাতে মাসে মাসে খরচ চলে, তারও জোগাড় করে দিয়েছেন। নিজের প্রায় সমস্ত property (সম্পত্তি) ঐ-তে দিয়েছেন।

তাঁর ছোট ছেলে ও জামাই এসেছিল। ছেলেটিকে দেখলাম ভাল—যেমন বাপ, তেমনি তাঁর ছেলে। বছর পনর ষোল বয়স।

জামাইটি কংগ্রেসম্যান, উকিল—খুব well-informed (বহুশ্রুত)। আমরা তখন গদাধর আশ্রমে ছিলাম। ওখানে দু'দিন ছিল।

আমরা বললাম, আজকালের সন্ন্যাস আর কি? এ ঘর ছেড়ে ও ঘরে থাকা। যেমন বোর্ডিং হাউসে থাকা (হাস্য)। পোস্টকার্ডে দু' পয়সা খরচ করলে সব খবর পাওয়া যায়। তার উপর আবার রেল, টেলিগ্রাম আছে। মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসা যায়। এ আর তেমন কি কঠিন? ওখানে (বাড়ীতে) থাকলে একটু কাজ করতে হতো। এই কাজটুকু আর করতে হবে না। এই যা। আগে সন্ন্যাস খুব কঠিন ছিল। বার বছর একেবারে নিরুদ্দেশ। এখন আর তেমন নাই। তা'হলে আর দুঃখ কেন?

আমার এ কথা শুনে তাদের খুব আহ্লাদ হয়েছে। পরের দিন এসে বললে, আপনার ঐ কথা রাত্রে শুনে আমাদের খুব আনন্দ হয়েছে। জামাইয়ের উপর সংসারের ভার পড়বে কিনা, তাই একটু unsympathetic (অসহানুভূতির) ভাব (হাস্য)।

শ্রীম (জগদীশের প্রতি)—একটা গল্প আছে, পড়েন নি? একজনের একটা ষাঁড় আর একটা ঘোড়া ছিল। ষাঁড়টা সারাদিন খাটে। ঐ লোকটি আবার পশুদের কথা বুঝতে পারতো। এখন ষাঁড় ঘোড়াকে বলছে—আমার বড় কষ্ট ভাই, সারাদিন খাটুনি আর ঘাড়ে লাঙ্গল। ঘোড়া বললে, কেন, তুই এক কাজ করতে পারিস্ না? কাল যখন জমিতে নিতে আসবে, তখন খুব পা ছুঁড়তে আরম্ভ করে দিস্। পরের দিন যেই লোক এলো নিতে, অমনি পা ছুঁড়তে লাগলো। তখন মালিককে খবর দেওয়া হলো। সে বললে, আচ্ছা তা'হলে ঘোড়াটাকে নিয়ে যাও। ঘোড়াকে সারাদিন খাটানো হলো। ঘোড়া বুঝতে পারলে, এ মহা মুস্কিল করেছি। সে তখন ষাঁড়কে আবার গিয়ে বললে, শুনছি তোমায় নাকি কসাইয়ের হাতে দেবে। বাঁচতে চাইলে আর পা ছুঁড়ো না (হাস্য)। ঘোড়া বেঁচে গেল। উকীল, ব্যারিস্টাররা দু'দিকেই বলতে পারে—এদিক ওদিক, দু'দিকে (সকলের হাস্য)।

অনাদি মহারাজ স্টুডেন্টস্ হোমে গীতার ক্লাস করেন সকালে। শ্রীম ভক্তদের সেখানেও পাঠান। অশ্বিনী সেখানে গিয়াছিলেন সকালে। তাহারই কথা কহিতে লাগিলেন।

একজন ভক্ত—গীতা পড়লেই হলো? বুঝবার শক্তি চাই তো।

শ্রীম—হাঁ, পড়ার চাইতে শোনা ভাল—তা' আবার সাধুমুখে শোনা।

যাঁর আত্মদর্শন হয়েছে তাঁর মুখে শোনাই উচিত। কেন না, এ যে মোক্ষশাস্ত্র। সাহিত্য বা অন্য বুদ্ধিপ্রসূত গ্রন্থ নয়। যাঁর সে অবস্থা হয়েছে তিনিই বুঝতে পারেন ভেতরের অবস্থাটি, মর্মকথাটি কি। এ অপরোক্ষ অনুভূতির বিষয়। সেরূপ লোক না পাওয়া গেলে অগত্যা সাধুর মুখে শোনা উচিত। সাধু মানে, যে সর্বস্ব ছেড়ে সর্বদা ঈশ্বরকে নিয়ে আছে, যার পরোক্ষ জ্ঞান হয়েছে, যে তাঁকে দর্শন করার জন্য ব্যাকুল। আকাশ পাতাল তফাৎ তাদের মুখে শোনা, আর সংসারী পণ্ডিতদের মুখে শোনা। সাধুর মধ্যে যার প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়েছে সে সাধু তো দুর্লভ। সে সাধু পেলে আর কথা কি? না পেলে ঐ পরোক্ষ অনুভূতিসম্পন্ন সাধুর মুখে শোনা।

গীতায় সর্বত্যাগের কথা রয়েছে কিনা—সর্বস্ব ত্যাগ ভগবান-লাভের উদ্দেশ্যে। যার মনে-ক্ষর, সংসারভোগে মন আছে আবার সংসারভোগও করছে—বরাবর ভোগ না করলেও কখনও তো ভোগ করছে—এরূপ লোক গীতার অর্থ কি করে বুঝতে পারে? কিন্তু সাধুরা সে ভোগ ছেড়ে দিয়েছে। যদি বল, বাহ্য ভোগ ছাড়লেও মনে তো ভোগবাসনা রয়েছে। তার উত্তর, তা' বটে। তবে তারা ভোগের দ্রব্য থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়েছে, আর চেষ্টা করছে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যেতে। তাই তাদের সুবিধা এই সব শাস্ত্রের অর্থ বুঝতে। তারপর তারা সৎসঙ্গে রয়েছে। আর সেই সৎসঙ্গে হয়তো এমন লোকও থাকতে পারে যার মন থেকেও ভোগবাসনা চলে গেছে। এরূপ সাধুর সদ্গুণে অপর সাধুর মনের ভোগবাসনা

শুকিয়ে যায়। যেমন আগুনের কাছে ভিজে কাঠ রাখলে ক্রমশঃ কাঠের জল শুকিয়ে যায়। এই তফাৎ।

একজন ভক্ত—সংসারে থেকে গীতার সাধন হয় না কি ?

শ্রীম—হবে না কেন ? তবে বড় কঠিন। ঠাকুর বলেছেন, আগে তপস্যা করে, ভক্তি লাভ করে, যদি সংসার কর তা' হলে হতে পারে। তবুও নিত্য সাধুসঙ্গ দরকার। কেন ? মানে পানাতে জল ঢেকে যাচ্ছে কি না সর্বদা, তাই।

(অশ্বিনীর প্রতি) দেখেন নি পুকুরে ? একটু ঢেউ দিলেন, অমনি জল দেখা গেল। আবার নাচতে নাচতে পানাতে সব জল ঢেকে দিল। ঠিক তেমনি হয় সংসারে। সর্বদা মোহ পেছনে লেগে আছে। বহু চেষ্টা করে মনটা একটু সাফ হলো তো অমনি আর একটা ঝাপটা এসে মনাকাশকে ঢেকে ফেললো—এখন সুর্যকিরণ আর দেখা যাচ্ছে না। তাই সৎসঙ্গ দরকার নিত্য। সাধুসঙ্গ যেন right (ঠিক) ঘড়ি, গৃহস্থ-জীবন যে wrong (বেঠিক) ঘড়ি। রোজ গিয়ে নিজের ঘড়িটা মিলিয়ে আসা আর কি। wrong (সংসার) নিয়ে থাকলে, কিছু করতে পারেন এটা যদি right (জীবনের উদ্দেশ্য ভগবানদর্শন) এ কথা মনে জাগ্রত থাকে। মানুষজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন করা কিনা। অর্থাৎ ঈশ্বর লাভ করে মানুষের ঈশ্বর হয়ে যাওয়া। 'ব্রহ্মদেব ব্রহ্মৈব ভবতি।' যেমন ভুলের সঙ্গে থেকে থেকে ভুলময় হয়ে যায়, তেমনি সাধুর সঙ্গে থেকে থেকে সাধু হয়ে যায়। সাধু মানে ঈশ্বর লাভ করেছেন যিনি। যিনি ঈশ্বর লাভ করার জন্য ব্যাকুল, সব ছেড়ে ছুড়ে তিনিও সাধু। তাঁহাদের সঙ্গ করাই আমাদের একান্ত কর্তব্য।

ভক্ত—অর্জুনকে তো ঘরে থেকেই মোক্ষলাভ করতে বলেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীম—ঘরে থেকে যে সব কাজ করে, কিন্তু ফলভোগ করে না, সে-ই তো মোক্ষ লাভ করবে। সে-ই তো কর্মযোগী। সেইটে

শিক্ষার জন্যই তো সাধুর কাছে যাওয়া নিত্য। সাধু ফল ত্যাগ করেছে।

ভোগের ভেতর থেকে থেকে মনে তার ছাপ পড়ে যায়। মনে করছে, নিষ্কাম কর্ম করছি। কিন্তু ভেতরে বাসনা রয়েছে। এই করে করে আটকে যায়। নিত্য সাধুসঙ্গ করলে অন্তরে হুঁস জাগ্রত হয়—মনে হয়, আমার অধিকার দিনরাত কর্ম করার একজন বিশ্বাসী ভৃত্যের মত, কিন্তু কর্মের ফল ভোগ করার আমার কোনও অধিকার নাই। দেহ ধারণের জন্য যা মালিক দেবেন তা'তেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আমি কাজ করছি আমার জন্য নয়, আমার পরিজনের জন্য—এই ভাবনাও মোহ, অজ্ঞান। আমি কাজ করছি ভগবান লাভ করার জন্য, ভগবানের জন্য। সেই ভগবান আমার সামনে রয়েছেন পরিজনরূপে; আমি তাঁরই সেবা করছি পরিজনের ভেতর—আমি যেন ঘরের দাসী। এ ভাবটি আনা চাই হাতে। এ-টি জ্ঞান, ঠাকুর বলতেন। এতে মোক্ষ লাভ হয়। নিত্য সাধুসঙ্গ করলে এ ভাবটি জাগ্রত হয়। সাধুদের এ ভাবটি জাগ্রত হয়েছে। তারা কত কাজ করে মঠ আশ্রমের জন্য কিন্তু এ সবই করে দাসীবৎ। আশ্রমের মালিক ভগবান, সাধুগণ সব তাঁর সেবক। নাম যশের একটু আধটু লেশ থাকলেও ক্রমে ক্রমে তা শুকিয়ে যায় সঙ্গগুণে। ত্যাগের কত বড় অগ্নিকুণ্ড সেখানে—দাউ দাউ করে জ্বলছে দিবানিশি। এর উত্তাপে বাসনা শুকিয়ে যায়, ঝরে পড়ে আপনিই। মন তখন শুদ্ধ হয়ে যায়। 'শুদ্ধ' মানে ঈশ্বরই কর্তা, মানুষ অকর্তা—এই জ্ঞান দৃঢ়বদ্ধ হয়ে যায়। তাই তো যারা গৃহে আছে, তাদের অবশ্য কর্তব্য সাধুসঙ্গ করা—যেতে যেতে তাদের বাসনাও শুকিয়ে যাবে ধীরে ধীরে। তবে একটু দেরীতে, এই যা। কেন দেরীতে? একটু দূরে আছে ঐ জ্বলন্ত ত্যাগের হোমকুণ্ড থেকে, তাই।

তাই সাধুসঙ্গ ছাড়া আর উপায় নাই। শাস্ত্র বুঝতে হলেও তাদের কাছে যেতে হয়। তারা শাস্ত্রের জীবন্ত মূর্তি, জীবন্ত ভাষ্য।

পাণ্ডিত্য এক জিনিস, আর মেধা আর এক জিনিস। মেধা মানে গুরুবাণী ও শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত ভাবটিকে আবিষ্কার করার শক্তি। ঐ ভাবটিকে ধরে থাকার শক্তি, আর নিজ জীবনে পালন করার শক্তি। ঠাকুর তাকেই বলতেন 'ধারণা'।

পণ্ডিতরা দেখে কেবল শব্দার্থ। সাধুরা ধরে মর্মার্থ মেধার সহায়ে। তারপর সেটা নিজ জীবনে ফুটিয়ে তোলে। একটা হচ্ছে, superficial intellection (বাহ্য অনুভব)। আর একটি deep concentrated intellection conviction (ঘনীভূত সুগভীর অনুভব—সুদৃঢ় বিশ্বাস)। অনেক তফাৎ।.

মর্টন স্কুল, কলিকাতা, ২৫শে জুলাই, ১৯২৪ খ্রীঃ
৯ই শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল, শুক্রবার, কৃষ্ণা নবমী।

সপ্তম অধ্যায়

জীবত্ব নাই অবতারে

মর্টন স্কুল। চারতলায় শ্রীমর কক্ষ। শ্রীম বিছানায় শুইয়া আছেন পূর্ব-শিয়রী। এখন সকাল আটটা। ছোট অমূল্য, মোটা সুধীর, জগবন্ধু, ছোট জিতেন প্রভৃতি শ্রীমর ঘরে বসিয়া আছেন দক্ষিণের বেঞ্চিতে ঘরের মধ্যস্থলে। একটি কাঠের পার্টিশান রহিয়াছে। শ্রীম কয়দিন অসুস্থ হইয়া তিনতলায় ছিলেন, সেবার সুবিধার জন্য। পরিবারের কেহ কেহ তিনতলায় থাকেন। আজ সকালে উপরে আসিয়াছেন। শরীর একটু ভাল। তবে বিছানায় অধিকাংশ সময় শুইয়া থাকেন তিনি। ভক্তদের বলিলেন, পার্টিশানটা উঠিয়ে দিলে হয়। জায়গাটা বেশ বড় হবে তা' হলে। ভক্তগণ স্বচ্ছন্দে বসতে পারবেন। ভক্তগণ পার্টিশানটা উঠাইয়া দিয়া একপাশে রাখিয়া দিলেন।

আজ শনিবার। তাই বেলা দুইটা হইতে শনিবারের ভক্তগণ আসিতেছেন। ধীরে ধীরে নিত্যকার ভক্তগণও আসিয়া সমবেত হইতেছেন। ভাটপাড়ার ললিত, সঙ্গী ভোলানাথ ('ভবরানী'), বসন্ত, সুশীল, একটি ছাত্র প্রভৃতি আসিয়াছেন। সকলেই শ্রীমর ঘরে গিয়া বসিয়াছেন। নিত্যকার ভক্তগণ—যতীন, শান্তি, অমৃত, ছোট জিতেন, শুকলাল, মনোরঞ্জন, ছোট নলিনী, বিনয় ও জগবন্ধু শ্রীমর ঘরে বসিয়াছেন। এখন অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটা।

একটু পর শ্রীম তিনতলায় নামিয়া গেলেন। আধঘণ্টা বাদে হাত মুখ ধুইয়া ফিরিয়াছেন। এবার আসিয়া বসিলেন ছাদে চেয়ারে উত্তরাস্য। ভক্তগণ শ্রীমর সম্মুখে তিনদিকে বসিয়া আছেন বেঞ্চিতে। ভক্তদের সকলের কুশল সংবাদ লইতেছেন। একজন বলিলেন, বড় সুধীর পাগল হইয়া গিয়াছে। ইনি মর্টন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—কে পাগল নয়? কাম ক্রোধ লোভ মদ মাৎসর্যের তাড়নায় সকলেই পাগল। একটু কিছু এদিক সেদিক বললে অমনি ক্রোধ।

একজনের মায়না পনর টাকা। সে ভাবছে, সাতাশ টাকা মায়না পাচ্ছে শ্যাম। তার নিচেই আমি। আহা, শ্যামের যদি মৃত্যু হয়ে যায় তা' হলে আমি এই কর্মটি পাই। এই সব করে না লোক? (ভোলানাথের প্রতি) কি বলেন?

মোহ,—আমার কিছুই নয়, সব ভগবানের। তবুও লোক 'আমার বাড়ী, আমার ছেলে' করে করে মরে।

মাৎসর্য অহংকারে যেন লোকগুলো ডুবে থাকে দিন রাত। এই সব লোক আবার অপরকে বলে পাগল।

এখন সাড়ে ছয়টা। বাহিরে প্রবল হাওয়া বহিতেছে। শ্রীম উঠিয়া সিঁড়ির ঘরে আসিতেছেন। বলিতেছেন, বুড়ো মানুষের অসুখ, মানে যন্ত্রগুলি আর work (কাজ) করতে পারছে না। পুরোনো হয়ে গেছে সব।

সিঁড়ির ঘর। শ্রীম বসিয়াছেন চেয়ারে উত্তরাস্য, সিঁড়ির পাশে। শ্রীমর ডান হাতে ও সম্মুখে ভক্তগণ বসা বেঞ্চিতে। তিনি কথামৃত বর্ষণ করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আজ খোকা মহারাজ এসেছিলেন। বললেন, ভুবনেশ্বর মঠে কুয়োর ভিতর একটা স্প্রিং বের হয়েছে। তাই দেখতে তিনি ভুবনেশ্বর যাচ্ছেন। পূর্ববঙ্গে গিছলেন। বললেন, ওখানকার মেয়ে ভক্তরাও ঠাকুরের কথা শুনবার জন্যে এক জায়গায় মিলিত হচ্ছে। পাঠ, আলোচনা হয় সেখানে। ঢাকায় দেখেছেন, আবার ময়মনসিং-এও দেখেছেন এইরূপ মেয়েদের সৎসঙ্গ। তাঁকে invite (নিমন্ত্রণ) করেছিলেন মেয়েরা। উনি বলেছিলেন, তোমরা পুরুষদের আসতে দাও না,—তা' হলে আমায় আসতে দিলে কেন? ভক্তরা বললেন, আপনার কথা ছেড়ে দিন। আপনি তাঁর (ঠাকুরের) ছেলে। এতো কাছের লোক।

ঠাকুর কিন্তু বলেছিলেন, স্ত্রীলোকের লজ্জাই ভূষণ। লজ্জা যদি গেল, তার রইলো কি?

কাম জয় করা কি যার তার কর্ম? লক্ষ্মণই কাম জয় করতে পারে—যে চোদ্দ বছর ফলমূল খেয়ে থাকতে পারে, যে নিদ্রাকে জয় করেছে। কি কঠোর তপস্যা! তবে কাম জয়।

কত বড় কঠিন কাজ। আর কোন ভাবনা নাই। কেবল রাম চিন্তা। কত বড় মহাযোগী লক্ষ্মণ। তবে কাম জয় হয়।

ঠাকুর প্রার্থনা করতেন, মা আমায় সীতার মত করে দাও। হনুমানকে রাম জিজ্ঞাসা করলেন, সীতাকে কেমন দেখে এলে লংকায়? হনুমান বললেন, দেখলুম সীতার দেহটা পড়ে আছে। আর যম আনাগোনা করছে। মনপ্রাণ সব বাঁধা পড়েছে রামের কাছে, নিরন্তর রাম-চিন্তায়।

যম আনাগোনা করছে, এর মানে, যম এই শরীর—এই স্থূল শরীর নেয় না। সূক্ষ্ম শরীর নেয়। মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার—সূক্ষ্ম শরীরের অঙ্গ। এ-সবই রামের কাছে বাঁধা। এখন

যম আর কি নেয়? তাই আসছে যাচ্ছে, যদি রাম-চিন্তা ছাড়া দেখতে পায়। আহা, কি অবস্থা! এরূপ হলে কামজয় হয়।

কিন্তু তাঁর মহামায়া চিনতে দেয় না। ভরদ্বাজাদি মাত্র বারজন ঋষি রামকে অবতার বলে চিনেছিলেন। অন্যরা অবতার বলে চিনতে পারেন নি। কেমন করে চিনবেন, না চেনালে? কি আশ্চর্য! তত্ত্বজ্ঞ ঋষি সব, তাঁরাই চিনতে পারেন নি। বললেন, রাম বড় জ্ঞানী, মর্যাদাসম্পন্ন। বড় পিতৃমাতৃ ভক্ত। কিন্তু ঋষিরা জীবন্মুক্ত হয়েও অবতারকে চিনতে পারেন নি। কি প্রহেলিকা!

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুর যার সঙ্গে মিশতেন তারই হয়ে যেতেন। একবার কামারপুকুরে গেলেন। পাড়ার যত মেয়েরা এসে ঘিরে থাকতো। ঠাকুর বলেছিলেন, আমি যেন তোদের সঙ্গে dilute (বিগলিত) হয়ে গেছি। না গা? (সকলের হাস্য)।

শেষ অসুখের সময় বলেছিলেন, মা আমায় আর রাখবেন না। আমার বালকের স্বভাব। সব বলে দিচ্ছি। তাই মা এখানে আর রাখবেন না।

সকলেরই যদি চৈতন্য হয়ে যাবে তবে এই কাণ্ডটা (সংসার) যে ফেঁদেছেন এটা চলে কি করে? তাই বলতেন, মা নিয়ে যাচ্ছেন। বলেছিলেন, আরও কিছুদিন থাকলে জন কতক লোকের চৈতন্য হতো।

একজন ভক্ত—তিনিই মা ব্রহ্মশক্তি, আর তিনিই মায়ের ছেলে, মায়ের ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ। একাধারে দুই। কি করে হয় বোঝা গেল না।

শ্রীম—একই ব্রহ্মশক্তি জীবজগৎ হয়েছেন। আবার প্রত্যেকের ভিতর রয়েছেন অন্তর্যামীরূপে—'বহুস্যাম প্রজায়েয়'—আমি বহু হব, এ-ও আছে বেদে, আবার ও-ও আছে 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' অর্থাৎ জীবজগৎ সৃষ্টি করে আবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আছেন। যদি এ হতে পারে তবে একই শরীরে অবতার ও ভক্ত কেন হতে পারবেন না?

বেদে আরও আছে 'দ্বা সুপর্ণা', দুটি পাখী একই দেহ-বৃক্ষে নিবাস করে, একই স্বাদু পিপ্পল খায়, অর্থাৎ সুখ দুঃখ ভোগ করে। অপরটি বসে সব দেখে, কিন্তু ফল খায় না। তাই উদাসীন।

তাঁর মায়া-শক্তিতে সবই সম্ভব হতে পারে।

অবতারের ভিতর যে ভক্তভাব, তা জীবভাবের মত দেখালেও জীব নয়। কারণ জীব কর্মফলের অধীন। অবতার তা নন। কর্মফলে তাঁর জন্ম নয়। ভক্তদের আকুল প্রার্থনায় তিনি মানুষ-রূপ ধরে আসেন। যতদিন ঐ প্রার্থনা-শক্তির বেগ থাকে ততদিনই মানব শরীরে থাকেন। তার পরই স্ব-স্বরূপে মিশে যান। ঠাকুর শরীর যাবার আগে বলতেন, এখন দুই দেখছি না—কম পড়ে যাচ্ছে। সবই দেখছি মা—ঈশ্বর ব্রহ্মশক্তি।

দেখাচ্ছে যেন জীব, কিন্তু বস্তুত জীবত্ব নাই অবতারে। অবতার সর্বদা জানেন আমি ঈশ্বর, জীবভাবের, মানুষের পোষাকের ভেতর। সাধারণ জীব তা জানে না—আমি ঈশ্বর। অবতার, অর্থাৎ ঈশ্বর জেনে শুনে জীবত্বের অভিনয় করেন। নইলে যে খেলা হয় না, তাই।

ক্রাইস্টেও পিতা ও পুত্রের অভিনয়, Father and Son আবার কখনও একত্ব—'I and my Father are one'—পিতাপুত্র এক।

গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই বলেছেন—জীবরূপতা, মানুষ ভাবটি আরোপিত মিথ্যা। পরমাত্মারূপ পিতা-টি সত্য। যে এ কথাটি জানে না, সে-ই আমাকে অবমাননা করে, সে অজ্ঞান। কি আছে গীতায়?

একজন ভক্ত—অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরম্ ভাবমজানন্তঃ মম ভূতমহেশ্বরম্॥

এ-টি ধরতে পারলেই মুক্তি। তিনি ধরা না দিলে মানুষ ধরতে পারে না। ঠাকুরের কৃপায় ভক্তরা তাঁকে ধরতে পেরেছিলেন। একজন ভক্তকে বলেছিলেন, একটা দিগন্তব্যাপী মাঠ। তাতে একটা উঁচু দেয়াল। তার গায়ে একটা বড় ছিদ্র। সেটা দিয়ে মাঠের

কতকটা দেখা যায়। বলতো দেখি সেটা কি? ভক্তটি বললেন, সেটা আপনি। অমনি খুব খুশি। কেন, না ভক্তরা তাঁকে ধরতে পেরেছে দেখে। তিনি নিশ্চিন্ত। যেমন পুত্র লায়েক হয়েছে দেখে নিশ্চিন্ত হয় পিতামাতা। তেমনি এ-ও। কেন নিশ্চিন্ত—মানে তাঁকে এঁরা প্রচার করবেন কিনা ঈশ্বর বলে। তা'তে জীবের কল্যাণ হবে, শান্তি হবে। তিনি নিজেকে নিজে জানেন—'স্বয়মেবাত্মনা-ত্মানম্ বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তমঃ'। পার্ষদরা জানেন তাঁর কৃপায়। তবেই জগতের লোক জানে—প্রথম পার্ষদদের দ্বারা, তারপর পার্ষদদের পার্ষদদের দ্বারা এই পরম্পরা চলতে থাকে। ক্রমে আন্তরিকতার অভাব হয়, মলিনতা আসে। তখন তিনি আবার শরীর গ্রহণ করেন —নূতন অবতার। এইরূপে জগতের প্রবাহও অনন্ত, অবতারের আবির্ভাবও অনন্ত। অনন্ত জগৎ অনন্ত অবতার।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—তপস্যা চাই। শুধু শুনে হয় না। নির্জনে এসে চিন্তা করলে এসব তত্ত্ব বোঝা যায়। False (মিথ্যা) অহংকারটা ধরা পড়লেই হয়ে গেল। তখন গুরুবাক্যে বিশ্বাস হয়। গুরুবাক্যে বিশ্বাস একমাত্র উপায়, ঠাকুর বলতেন। বিশ্বাসে চোদ্দ পনর আনা হয়ে যায়। বাকীটাও তাঁর কৃপায় ক্রমশঃ হয়ে যায়। তপস্যা চাই। দশ জনের সঙ্গে থেকে তা হয় না। 'কাঁচা আমি' 'পাকা আমি' বোঝা যায় না। তাই তপস্যা আর সাধুসঙ্গ।

শ্রীম (একজন যুবকের প্রতি)—কাল একজন সাধু এসেছিলেন। তিনি তপস্যা করেন। খুব শান্ত ভাব। নামটিও তাই শান্তানন্দ। খুব তপস্বী লোক। পুরোনো সাধু। তিনি বললেন, সাধনভজনের পক্ষে ভুবনেশ্বর অতি সুন্দর স্থান।

তিনি কাশীতে অনেককাল ধরে একটা বাগানে তপস্যা করেছিলেন। ইদানীং একটু বেরিয়েছেন। পুরীতে রথ দেখলেন। উল্টোরথও দেখলেন। তারপর কামাখ্যায় গিছলেন। তিনি চারধামই করেছেন—রামেশ্বর দ্বারকা কেদারবদ্রী আর পুরী। আবার কাশী গিয়ে বসবেন শুনছি। একটু ঘুরে তীর্থাদি দেখাশোনা হল।

এখন আবার গিয়ে শুধু ঈশ্বরের চিন্তা করবেন। আহা, কাশীর মত স্থান আছে।

(শ্রীম সকলের প্রতি)—আজ সকালে একজন সাধু এসেছিলেন মায়াবতীর আশ্রম থেকে, নাম প্রভু মহারাজ। উনি বললেন, ঠাকুরের একটি life (জীবনী) লেখা হচ্ছে। এর foreword (ভূমিকা) দেবেন গান্ধী মহারাজ।

অনেক দিনের কথা। গান্ধী মহারাজের দেশের একটি বৃদ্ধ উকীল Gospel of Sri Ramakrishna (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত) translate (অনুবাদ) করতে চান গুজরাটীতে। উনি এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। আমরা permission (অনুমতি) দিলাম। Suggestionsও (পরামর্শও) দিলাম। উনি বললেন, এই বইখানা গান্ধী মহারাজকে dedicate (উৎসর্গ) করবেন। তখন গান্ধী মহারাজ আফ্রিকায় work (সেবাকার্য) করছেন।

খুলনার ভক্ত—একজন লোক বলেছে, এই 'রাউলাট এ্যাক্ট' (নয়, ভারতীয় স্বাধীনতাসংগ্রাম) এসেছে পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে।

শ্রীম—পরমহংসদেবের নাম বোধহয় বলেন নি। আহা, তাঁর কি শত্রুমিত্র ভেদ ছিল? আত্মপর ভেদ তাঁতে ছিল না। কিম্বা, হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান, শৈব-শাক্ত-গাণপত্য—কোন ভেদই তাঁতে ছিল না। যে ভাবের লোক যাক, সকলের সঙ্গে সমভাব। আহা, এমনটি কি আর হয়? এমনটি কি আর কেউ কোন দিন দেখেছে?

সন্ধ্যা হইয়াছে। হ্যারিকেনের আলো আসিয়াছে। শ্রীম সকল কার্য পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতে লাগিলেন ভক্তসঙ্গে। তিনি চেয়ারে বসা উত্তরাস্য। তাঁহার পিছনে সিঁড়ির রেলিং। কিছুকাল পর শ্রীমর ইচ্ছায় ভাটপাড়ার ললিত রামস্তোত্র আবৃত্তি করিতেছেন।

তারপর ললিত সুর করিয়া মৃদুমন্দ গতিতে রামনাম কীর্তন করিতেছেন। কীর্তনান্তে শ্রীম পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ললিতের প্রতি)—শুনেছি, ঠাকুর এমনি করতেন। 'রাম রাম' বলতে বলতে নিঃশ্বাস একেবারে বন্ধ হয়ে যেতো। তখন পঞ্চবটীতে সাধন করতেন।

এখন রাত্রি সাড়ে আটটা। ভক্তগণ বিদায় লইলেন। শ্রীম ভোজন করিতে তিনতলায় নামিয়া গেলেন।

সিঁড়ির ঘরে এখন জগবন্ধু, শান্তি ও যতীন বসিয়া আছেন। ছোট নলিনী একটু পরে আসিলেন। অন্তেবাসী বেঞ্চির উপর শুইয়া 'কথামৃত' পড়িতেছেন। শ্রীমর গুরুগৃহবাস—দশম ও একাদশ দিন। ভক্তগণ পাঠ শুনিতেছেন। ইতিমধ্যে বলাই ও অমৃত পর পর আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কিছুক্ষণ পর ভক্তগণ তিনতলায় বড় জিতেনের কণ্ঠস্বর শুনিলেন। একটু পর শ্রীমর কণ্ঠস্বরও শুনিয়া সকলে তিনতলায় নামিয়া গেলেন। শ্রীম বারান্দায় সিঁড়ির সামনে বেঞ্চিতে বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছেন। বাহিরে টিপ টিপ করিয়া জল পড়িতেছে।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—আহা, কি স্বভাব ছিল ঠাকুরের, একেবারে 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্'। নিরঞ্জন—একেবারে সাদা চশমা পরা। যার সঙ্গে মিশতেন সম্পূর্ণরূপে তারই হয়ে যেতেন। সকলে মনে করতো, উনি আমাদেরই একজন। মথুরবাবুর বাড়ীর মেয়েরা মনে করতেন, আমাদেরই একজন। সেই অবস্থায় মেয়ে মহলে থাকতেন। তখন মধুর ভাবের সাধন চলছে কিনা—ব্রজগোপীনীদের ভাব, শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব। ব্রাহ্ম ভক্তরা মনে করতেন, পরমহংস মশায় তো আমাদেরই লোক। এদিকে গোঁড়া সনাতনীরা মনে করতেন তাঁদের—মাড়োয়ারী ভক্তরা। শৈব, শাক্ত, খ্রীস্টান, মুসলমান, যে এসেছে সেই মনে করতো আমাদের। মিশ্র সাহেব খ্রীস্টান, ঠাকুরকে দেখেছিলেন ক্রাইস্ট।

কিছুক্ষণ বিরতি।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—উপরে আপনারা কি করছিলেন সব বলুন।

অন্তেবাসী—'কথামৃত' পড়ে শুনাচ্ছিলাম—মণির গুরুগৃহবাস দশম ও একাদশ দিবস ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দ, ২৩ ও ২৪শে ডিসেম্বর।

মধ্যাহ্নভোজনের পর ঠাকুর ছোট খাটটিতে শুইয়া আছেন। মণি মেঝেতে বসা—মণিকে বলিতেছেন, ব্রহ্মই জীবজগৎ হয়েছেন।

বলিতেছেন, একজন বললো অমুক স্থানে হরিনাম নাই। অমনি ঠাকুর দেখছেন, ব্রহ্মই সব জীব হয়ে রয়েছেন। বর্ধমানের মাঠে দেখলেন, তিনিই পিঁপড়ে হয়ে রয়েছেন। সর্বত্র চৈতন্যময়। নানা প্রকার ফুল, পাতা—সব তিনি হয়ে রয়েছেন। সকল জীব জল-বুদবুদের মত—অসংখ্য জলবিম্ব—বড় বিম্ব, ছোট বিম্ব, সব তিনি হয়ে আছেন।

এর পরই বসে একেবারে সমাধিস্থ—'আমি হয়েছি', 'আমি এসেছি', এই কথা কইতে কইতে।

শ্রীম—এর মানে, তিনি ব্রহ্ম, তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন। আবার তিনিই নররূপ ধারণ করে অবতার হয়ে এসেছেন। এইটিই তাঁর জীবন্ত জাগ্রত ঘোষণা, তিনি অবতার। তবুও লোকের বিশ্বাস হয় কই?

অন্তেবাসী—সমাধি ভঙ্গের পর ঐ খাটে বসে জগন্মাতার সঙ্গে কথা কইছেন—মা, তুমি আমার মা, আমি তোমার ছেলে। বালকের মা চাই—মা ছেড়ে কেমনে থাকে?

মণিকে বলছেন, তুমি ও আমি এক সত্তা, আপনজন, যেমন পিতাপুত্র।

নরলীলায় অবতারকে চেনা মুস্কিল—চিনতে পারে না। ঠিক মানুষের মতো আচরণ। ক্ষুধা তৃষ্ণা, রোগ শোক ভয়—সব ঠিক মানুষের মত।

শ্রীম—আহা কি সব সিন্। অমুক অমুক উপস্থিত, অমুক স্থান, এই সময়। এইসব সিন্ যোগীরাও পায় না। যোগীদের উপযুক্ত এইসব সিন্।

আর কিরূপ স্পষ্ট উক্তি! যারা তাঁর মুখ থেকে এইসব শুনেছে

তারা ধন্য। তারা সাধারণ মানুষ নয়। তাদের তিনি সঙ্গে এনেছেন তাঁর কাজের জন্য।

যাকে বললেন, আমি হয়েছি, আমি এসেছি, তাকে একদিন এক কলা শক্তি দিয়েছিলেন মার কাছ থেকে চেয়ে। উনি আরও বেশী দেওয়াতে চেয়েছিলেন—মা বললেন এক কলাতেই হবে কাজ। তা ভগবানের এক কলা শক্তি কম? সেই শক্তি দিয়ে তিনি ভক্তদের দ্বারা তাঁর অবতার লীলার প্রচার করিয়ে নিচ্ছেন। ভগবানের শক্তি ছাড়া প্রচার হয় না—লোক শোনে না।

অন্তেবাসী—শিবসংহিতা পাঠ করতে মণিকে ডেকেছিলেন—যোগের কথা এতে আছে।

শ্রীম—হাঁ, শিবসংহিতা পাঠ আর হলো না, তিনি নিজেই কথা কইতে লাগলেন।

অমৃত—আগে আপনি রোজ একটি করে সিন্ বলতেন। বাউলের সিন্‌টি বেশ। বাউলের দলের মত অবতার এসে চলে গেলেন, কেউ চিনলো না।

শ্রীম—হাঁ, হাঁ। ঠিক ঠিক। অতি সুন্দর কথাটি স্মরণ করিয়ে দিলেন। কেউ চিনতে পারলো না। কেমন করে চিনবে? গেয়ে চলে গেল। গোটা কয় লোক সঙ্গে, অন্তরঙ্গ যারা।

সকলে চিনলে তো আর এদিককার কাণ্ডটি থাকে না। তাই চিনবার যো নাই। গোটা কয়েক লোককে চেনা দিয়ে গেছেন। তাঁদের কাছ থেকে অপর কতকগুলি চিনবে—চিনেছে।

রাত্রি সাড়ে নয়টা। বাহিরে হইতেছে জলবর্ষণ, ঘরের ভিতরে হইতেছে কথামৃত-বর্ষণ। শ্রীম অসুস্থ, তথাপি কথামৃত-বর্ষণে তাঁহার ক্লান্তি নাই। ভক্তগণ কষ্ট হইবে ভাবিয়া কয়বার উঠিতে চাহিলেন। কিন্তু উঠিতে দিবেন না—অবিশ্রান্ত কথামৃত বর্ষণোন্মুখ। বারি-বর্ষণের মত থাকিয়া থাকিয়া কথামৃত-বর্ষণ চলিয়াছে অতক্ষণ। শ্রীম কহিতেছেন, আহা, ডাক্তারবাবু এ সময় এলে বেশ হতো।

ভক্তরা ভাবিতেছেন, ধন্য ডাক্তার কার্তিকবাবু! তুমি অবতারের

অন্তরঙ্গ পার্ষদের হৃদয়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছ। নহিলে, উত্তম খাদ্য পরিবেশনের সময় মায়ের মত তোমাকে কেন স্মরণ করিতেছেন এই মহর্ষি। ভাই ধন্য তুমি!

মর্টন স্কুল, কলিকাতা। ২৬শে জুলাই ১৯২৪ খ্রীঃ
১০ই শ্রাবণ ১৩৩১ সাল শনিবার, দশমী ২৭।৫৩ পল।

অষ্টম অধ্যায়

তখন এই মানুষই হয় দেবমানুষ

আজ রবিবার। সকাল আটটা। মর্টন স্কুলের সাপ্তাহিক সৎপ্রসঙ্গ সভা নিম্নতলে বসিয়াছে। শিক্ষক ও ছাত্রগণ একত্রিত হইয়া কোনও মহাপুরুষের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। অন্তেবাসী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বেয়ারা সহদেবকে দিয়া শ্রীম নিজ কক্ষে চারতলার ঘরে ডাকাইয়া আনাইয়া অন্তেবাসীকে বলিলেন, এই শেলফটা আপনার ঘরে নিয়ে যান। কথামৃতের এই-সব কাগজপত্র আপনার জিম্মায় থাকবে। অন্তেবাসী সারাদিন ধরিয়া উহাতে সব পুস্তক ও কথামৃতের কাগজপত্রাদি সাজাইয়া রাখিলেন। অপরাহ্ণে শ্রীম ঐ ঘরে চুপি দিয়া বলিলেন, বা, অতি সুন্দর হয়েছে তো ঘর, কি পরিষ্কার!

এখন বেলা দুইটা। শ্রীম আপন ঘরে বসিয়া আছেন বিছানায়। একখানা পুস্তক পড়িতেছেন। বেলুড় মঠ হইতে ব্রহ্মচারী মহেশ চৈতন্য আসিয়াছেন শ্রীমকে দর্শন করিতে। তাঁহাকে সাদরে নিজের কাছে বসাইয়া কুশল প্রশ্নাদি করিতেছেন। প্রথমে মঠের সংবাদ লইলেন। তারপর কাশীর আশ্রমের সকল সাধুদের নাম করিয়া সংবাদ লইলেন। কথাপ্রসঙ্গে লাটু মহারাজের সম্বন্ধে নানা আলোচনা হইতেছে। তিনি সর্বদাই নিজের ভাবে থাকিতেন, প্রায় ধ্যানস্থ। কেহ গেলে ঠাকুরের কথা বলিতেন—দক্ষিণেশ্বরের লীলা-

প্রসঙ্গ। কখনও সাধু ব্রহ্মচারীদের জীবন সংগঠনের উপদেশ দিতেন। অল্প বয়স্ক সাধুদের স্ত্রীলোক থেকে সাবধান হইতে বলিতেন। মহেশ চৈতন্য শেষের দিকে লাটু মহারাজের সেবা করিতেন। মহেশ চৈতন্য ফল ও মিষ্টি খাইয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

ইতিমধ্যে এটর্নী বীরেন বসু মোটর লইয়া আসিয়াছেন, ইচ্ছা শ্রীমকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেশ্বর যান। শ্রীমর শরীর তত ভাল নয়। তাই তিনি গেলেন না। বীরেন গদাধরকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন। গদাধর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে থাকিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন কিছুকাল ধরিয়া।

অপরাহ্ন পাঁচটা। গদাধর আশ্রমের মহন্ত ললিত মহারাজ (স্বামী কমলেশ্বরানন্দ) ভবানীপুর হইতে আসিয়াছেন, সঙ্গে লালবিহারীবাবু।

শ্রীম ছাদে আসিয়া বসিয়াছেন চেয়ারে দক্ষিণাস্য। অন্য এক চেয়ারে বসা স্বামী কমলেশ্বরানন্দ পূর্বাস্য। শ্রীমর ডান হাতে বেঞ্চিতে বসিয়াছেন লালবিহারী ও জগবন্ধু পূর্বাস্য। একটি অল্প বয়স্ক কালো মত যুবক আসিয়া বসিয়াছে বেঞ্চিতে। সে এই প্রথম আসিয়াছে। এইবার কথাবার্তা হইতেছে।

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ—কাল থেকে আসবো আসবো করছি। আসার জন্য মনটা কেমন করছে। শরৎ মহারাজকে দেখার জন্যও মন কেমন করছে। আপনাদের দর্শন করে যদি কিছু হয়।

শ্রীম—আহা। ছোট পিরদ্দিম দেখলে সেই দুর্গা-পিরদ্দিমকেই মনে পড়ে। দেখ নাই দুর্গা-পিরদ্দিম—মোটা শলতে, ঘি ভর্তি। তা' থেকেই তো ছোট পিরদ্দিম সব জ্বেলেছে। তাই এঁদের দেখলে বড় পিরদ্দিমের উদ্দীপন হয়। (ক্ষণকাল নীরব)।

শ্রীম (সাধুর প্রতি)—তোমার একটা rare opportunity (দুষ্প্রাপ্য সুযোগ) হয়েছিল হরি মহারাজকে ভাগবতাদি শাস্ত্র শোনান। মহাপুরুষদের শোনালে, সিদ্ধপুরুষদের শোনালে নিজেও শাস্ত্রের মানে বুঝতে পারে। সিদ্ধপুরুষ সর্বদা যোগে আছেন।

তাঁকে শোনালে পাঠকেরও ঐ অবস্থা হয়, শাস্ত্রার্থের ধারণা হয়। ঐ একটা বড্ড সুবিধা পেয়েছিলে। কি কি পড়ে শুনিয়েছিলে?

কমলেশ্বরানন্দ—ভাগবত, যোগবাশিষ্ঠ এক ভাগ, বৃহদারণ্যক উপনিষদ, বেদ এক অধ্যায়, এই সব।

শ্রীম—ও-টিতে তোমার বড় উপকার হয়েছে।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। আবার কথা প্রসঙ্গ হইতেছে। শ্রীম (সকলের প্রতি)—গুরুর আদেশ হলে কাজকর্ম করা যায়—হাসপাতাল ডিসপেনসারী। তা' নইলে করবার যো নাই। শশধরকে এ কথা বলেছিলেন। শশধর চালাকী করে ঠাকুরের আদেশ নিতে চেয়েছিলেন। ঠাকুর বলেছিলেন, ও (শশধর) বললে, তা' হলে যা করছি তা' করি? কিন্তু ঠাকুর কিছুই বললেন না। হাঁ হবে, হাঁ হবে, বলে কাটিয়ে দিলেন।

গুরুর (অবতারের) আদেশ হলেই তাঁর (ঈশ্বরের) আদেশ, তিনিই কিনা গুরুরূপ ধরে আদেশ দেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি সহাস্যে)—অমৃতবাজার পত্রিকার প্রবর্তক শিশির ঘোষ বেশ একটি গল্প বলতেন। একজন দেশভক্ত দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রার্থনা করলেন। ভগবান দেখা দিয়ে বললেন, কি চাও? সে বললে, ভারত-উদ্ধার। ভগবান বললেন, আচ্ছা তাই হবে। তবে চারশ' বছর পর। ভক্ত শুনে স্তম্ভিত হয়ে বলে উঠলো, সে কি কথা—আমি যে তখন থাকবো না। (সকলের উচ্চ হাস্য)।

মানে, সেও একটা leading part (নেতৃত্বে অংশ) নিতে চায় স্বদেশ উদ্ধার কাজে। এমন কাণ্ড। selfটা (অহংকারটা) কোত্থেকে এসে আসন গেড়ে বসে।

তাই গুরুর আদেশে কাজ করলে দোষ নাই।

শ্রীম (লালবিহারীর প্রতি)—ঠাকুর একটি গল্প শুনিয়েছিলেন। এক গুরুর ছেলের পৈতে হবে। অনেক লোক খাবে। শিষ্যরা নানা জনে নানা জিনিস দেবে। একটি বিধবা শিষ্যা বললে, সে দই

দেবে। উৎসবের দিন সে একটি ছোট খুরিতে করে একটু দই নিয়ে এসেছে। সে যে বড় গরীব। গুরু দেখে ক্রোধে অধীর হয়ে লাথি মেরে ঐ খুরিটা ভেঙ্গে ফেললো। আর অভিশাপ দিয়ে বললে, যা তুই নদীতে গিয়ে ডুবে মর। আমার এই কলঙ্ক করলি আজ তুই। বিধবা নদীতে নেমে গেল। কিন্তু সারা নদী হাঁটু-জল। তাই সে ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে—ভগবান আমার গুরুবাক্য রক্ষা হোল না। তখন ঈশ্বর দর্শন দিয়ে বললেন, কেন বাছা তুমি যাবে মরতে জলে ডুবে? নাও এইটে, এই বলিয়া পূর্বের খুরির মত আর এক খুরি দই দিলেন। সে নিতে চায় না। ভয়, আবার গুরুর ক্রোধ হয়। তখন ঠাকুর ঐ খুরিটা উলটিয়ে ধরলেন, আর দই অনবরত পড়তে লাগলো। তখন হাসিমুখে ঐটে নিয়ে সে গুরুগৃহে গেল। গুরুজী আবার রেগে গেল তাকে দেখেই। শিষ্যা তখন উলটে ধরলো ঐ খুরিটা। হাঁড়ি পাতিল যত ছিল সব দইয়ে ভরে গেল—অঙ্গন সমেত। গুরু নির্বাক। শিষ্যাকে বললে, চল মা যিনি তোমাকে এটা দিয়েছেন তাঁকে আমায় দেখাবে।

নদীতীরে এসে শিষ্যা ডাক দিতেই, ভগবান হাজির। আমার গুরুজীকে একটিবার দর্শন দিন। ঠাকুর বললেন তা' কি করে হয়, মা? ওর এই প্রথম জন্ম। আর তোমার শেষ জন্ম। অনেক কান্না-কাটির পর ঠাকুর একবার দর্শন দিলেন গুরুকে।

ঠাকুর বলেছিলেন, যার যা কর্তব্য সে তা' করবে। শিষ্যের কর্তব্য গুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি করা। সে ঈশ্বরবুদ্ধিতে ঈশ্বরের দর্শনলাভ করলো আবার গুরুকে ঈশ্বর দর্শন করালে।

হ্যারিসন রোড থেকে তিনজন ভক্ত আসিয়াছেন। একজন বৃদ্ধ। তাঁহাকে দেখিয়া ঠাকুরের বৃদ্ধ ভক্ত নিত্যানন্দ স্বামী, অদ্বৈতানন্দ স্বামীদের কথা হইতেছে। ইঁহারা বয়সে ঠাকুরের চাইতেও বড় ছিলেন। বালক ভক্ত, ছোকরা ভক্ত, গৃহী ভক্তদের কথা উঠিয়াছে, এই ভক্তদের কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদের ভক্তদের কথাও উঠিল। স্বামী কমলেশ্বরানন্দ বলিলেন, তৃতীয় পুরুষের ভক্তদের ভিতরও কারো

কারো তীব্র ব্যাকুলতা দেখা যায়। ডাক্তার কার্তিক বক্সী কি ব্যাকুল! ঘরে বা অর্থে মন নাই। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল। বয়স তো মাত্র ৩৩/৩৪ বছর।

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ—খুব serious (ব্যাকুল)। কোথায় কাশীপুর আর কোথায় গদাধর আশ্রম, ভবানীপুর। কমপক্ষে সাত মাইলের রাস্তা। আপনি যখন আমাদের ওখানে ছিলেন তখন রোজ আসতেন আপনাকে দর্শন করতে। জল বৃষ্টি শীত গ্রাহ্য নাই। তার উপর অত বড় busy (পসারওয়ালা) ডাক্তার। এ সব ঠাকুর আসায়, তাঁর সঙ্গে আপনারা আসায় দেখা যাচ্ছে। এঁরা আন্তরিক ভক্ত। ঠাকুর যেমন বলেছেন, দাসীর মত থাকতে, দুই একটি সন্তান হয়ে গেলে ভাই বোনের মত থাকতে—এইরূপ থাকতে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। নিন্দাস্তুতির দিকে লক্ষ্য নাই, বীরের মত চলছেন।

শ্রীম—হুঁ, খুব রোখ আছে। রেল হাসপাতালের অমন ভাল কর্ম ফস করে ছেড়ে দিলেন বদলী করেছিল বলে। তা' হলে যে সাধুসঙ্গ হবে না, তাই মঠে যান, দক্ষিণেশ্বরে যান, আর নিত্য এখানে আসেন। যখনকার যে-টি তখনই সে-টি করবেই শত বাধা এলেও। যেন সঙ্গীনধারী সৈনিক, সর্বদা হুঁসিয়ার, কখন গুলি কোন দিক থেকে এসে পড়ে। চাকরী ছেড়ে প্র্যাকটিস করছেন। কিন্তু পয়সার উপর টান নাই। ধনীদের কাছ থেকে নেন, তাই গরীবদের দেন। ঔষধ পথ্য অনেক সময় নার্সিং পর্যন্ত ব্যবস্থা করেন। মঠের সাধুরা অসুস্থ হয়ে কেউ কেউ ওখানে থাকেন। কলকাতা জলে ডুবে গেলেও আসবেন সাঁতরিয়ে। অমনটি দেখা যায় না।

সেদিন কাশীপুরের বাসায় উৎসব করলেন, মঠের বহু সাধু এসেছিলেন। শরৎ মহারাজ, খোকা মহারাজ, জ্ঞান মহারাজ প্রভৃতি এসেছিলেন। আমরাও গিছলাম। সুন্দর উৎসব হয়েছিল।

আবার সম্পূর্ণ গীতাখানা মুখস্থ। বাসাটি যেন আশ্রম। সাধু ভক্তদের সেবার স্থান। ওঁরা (পরিবার) দেশে থাকেন।

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ—শুনেছি, নিত্য ঠাকুরসেবা আছে বাসায়।

শ্রীম—যাও না, একদিন গিয়ে দেখে এস না। সংস্কার না থাকলে হয় না (এরূপ ব্যাকুল)।

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ—মহাপুরুষদের কৃপায়ও হয় নাকি?

শ্রীম—মহাপুরুষদের কৃপা হয় সংস্কার থাকলেই।

শ্রীম—(লালবিহারীর প্রতি)—হ্যাঁ, খিদিরপুরে একটি যন্ত্র (রেডিও) এসেছে। শোনেন নি আপনারা? একবার গিয়ে দেখে আসবেন। ওখানে গান হলে অপর লোক বহু দূর স্থানে বসেও ঐ গান শুনতে পায়।

শ্রীম (রহস্য করে)—আপনি শুনতে পাচ্ছেন না?

লালবিহারী—আজ্ঞে না!

শ্রীম—ও-ও সেই সুরে যে বাঁধা নয়।

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ—শুনেছি, যে শুনবে তার কাছেও একটি যন্ত্র থাকা চাই।

শ্রীম—তেমনি যন্ত্র থাকলে গান শুনতে পাওয়া যায়। অবতার এলে যাদের মন সেই ছাঁচে ঢালা তারাই তাঁর কথা শুনতে পায়। তা, নয় তো, কত লোক তো শুনছে, কিন্তু কানে পৌঁছাচ্ছে কয় জনের? মাত্র গুটি কয়েক লোকের। যাদের পূর্ব-জন্মের শুভ কর্মফলে ঐ যন্ত্রটি স্থাপিত রয়েছে হৃদয়ে কেবল তারাই শুনতে পায় অবতারের নির্বাক message (বাণী)।

একজন ভক্ত—কি message (বাণী)?

শ্রীম—'অমৃতস্য পুত্রাঃ'। হে জীব তোমরা অমৃতের সন্তান—মানুষ নয়। তোমাদের ঘর ব্রহ্মপুরে। আহার শয়ন মৈথুন ভয় তোমাদের সত্যকার কর্ম নয়। তোমাদের একমাত্র কর্তব্য নিজ নিকেতনে ফিরে যাওয়া। নিজের ঐশ্বর্য লাভ কর, নিজের স্বরূপ জেনে ব্রহ্মপুরে অবস্থান কর। অমৃতত্ব লাভ কর, অমর হও।

অহরহ এই বাণী প্রচারিত হচ্ছে। যাদের হৃদয়যন্ত্রটি সুতন্ত্রিত, সুসমাহিত, বিশুদ্ধ, কেবল তারাই এই মহাবাণী ধরতে পারে। যাদের হৃদয় মন জীবত্বের কুটিল কঠোর লৌহাবরণে আচ্ছাদিত, তারা এই

মহাবাণী শুনতে পায় না, ধরতে পারে না। যাদের আবরণ কথঞ্চিৎ শিথিল হয়েছে, তারা জীবত্বের বজ্রকঠোর বন্ধনের ভিতর থেকেও অস্বস্তি বোধ করে, এদিক ওদিক খোঁজে। এইরূপে জন্মমরণের নিষ্ঠুর চক্রের ভিতর দিয়ে যাতায়াত করতে করতে একদিন ঐ message (বাণী), যা সদাই ঝঙ্কৃত হচ্ছে, তা' স্পষ্ট শুনতে পায়, ধরতে পারে। তখন এই জীবন হয় দেবজীবন। তখন এই মানুষই হয় দেবমানব।

ব্রহ্মচারী মনু প্রবেশ করিলেন, একজন সঙ্গীসহ। তাহার হাতে দক্ষিণেশ্বরের মায়ের প্রসাদ। শ্রীম তাহাদিগকে আদর করিয়া বসাইলেন। পুনরায় কথা হইতেছে।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—সংস্কার মানতেই হবে, পূর্ব জন্ম মানতেই হবে। তা' নইলে জীবনের অনেক ঘটনা unexplained—unsolved (অব্যক্ত অপ্রকাশিত) হয়ে থাকে।

এখানে একটি ছেলে (শ্রীমর জ্যেষ্ঠ পৌত্র অরুণ) আছে। বাজনা বেশ বাজাতে পারে। কাল রাত্রি দুটো পর্যন্ত বাজিয়েছে। ছেলেটি এমনি যেখানে যে রাগিণী শুনবে সেটি মুখস্থ করে বাড়ীতে সে অমনি বাজাতে শুরু করে।

গতরাত্রে বাজাচ্ছিল। দেখলাম সুরের সঙ্গে তার মন একেবারে ডুবে গেছে। অন্য কোনও দিকে লক্ষ্য নাই।

তাই দেখো অবতার তত্ত্বটা কাল বুঝতে পারলাম নূতন করে, অবতারের সুরের সঙ্গে যাদের মনপ্রাণ ডুবে যায়, তারাই অরন্তঙ্গ।

যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, যিনি বাক্যমনের অতীত, তিনিই মানুষ হয়ে আসেন। এই সেদিন চলে গেলেন। হাওয়া বাতাসে তাঁর সুখস্পর্শ এখনও বিদ্যমান।

তিনি message (বাণী) দিয়েছেন, আমি অবতার, তোমরা আমার সন্তান। আমায় ধর। আমার ধ্যান কর, আমার চিন্তা কর। আমি অনায়াসে তোমাদের এই জটিল সংসারবন্ধন ছিন্ন করে দিব, এই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে উঠিয়ে দিব। তোমাদের

বেশী কিছু করতে হবে না—আমি কে আর তোমরা কে—এইটে জানলেই হবে।

আবার প্রতিজ্ঞা করে বলছেন, মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্যলাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। জ্ঞানভক্তি, বিবেকবৈরাগ্য, শান্তিসুখ, প্রেম সমাধি, আমার ঐশ্বর্য।

কয়েকটি মাত্র লোক তাঁর বাণী ধরতে পেরেছিল, তাঁকে চিনতে পেরেছিল। তারাই তাঁর পায়ে মনপ্রাণ ঢেলে দিল, তাঁর সুরের সঙ্গে তাদের সুর মিশিয়ে দিল। এরা পার্ষদ, এরা অন্তরঙ্গ, এরা সব লীলা সহচর।

অন্য লোক কেমন? ঠিক তেমনি, যারা বাজনার বোল হাতে আনতে পারে না। শুনে বলে কিন্তু হাতে বাজাতে পারে না, নিজ জীবনে মূর্তিমান করতে পারে না।

শ্রীম (সাধুর প্রতি)—এই ছেলেটির যখন এক বছর বয়স তখনই একটা কাঠ দিয়ে তাল দিচ্ছিল। মা ঠাকরুণ তখন ছিলেন কিনা ওখানে (শ্রীমর ঠাকুরবাড়ীতে)। এই দেখে বললেন দেখ দেখ, কেমন গন্ধর্বলোক থেকে এসেছে। এখন তার বয়স পনর ষোল।

শ্রীম (স্বামী কমলেশ্বরানন্দের প্রতি)—ঠাকুর তো কারো কাছে যেতেন না। তাঁরই কাছে সকলে যেতো। তাঁর সঙ্গে যারা attuned (একই সুরে বাঁধা) হয়ে যেতো, তারাই যেতো ছুটে উন্মাদবৎ। এরা সব মৌমাছির মত ফুলের মধুর সন্ধানে যেতো।

অসুখের কথায় বলেছিলেন, এই যে অসুখ হয়েছে—কেন? না এতে লোক বাছাই হবে বলে।

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ—হয়েছিল বাছাই?

শ্রীম—হাঁ। অনেকে চলে গেল, এই বলে—ইনি দেখছি নিজেকেই রক্ষা করতে পারছেন না, তা' অন্যকে রক্ষা করবেন কি করে?

শ্রীমর মন কিছুক্ষণের জন্য অন্তরে নিবদ্ধ। পুনরায় কথামৃত বর্ষণ করিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—ঠাকুর ও-কথাটি প্রায়ই বলতেন—শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদ। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় এসে গোপীদের সংবাদ নিতে পারেন নাই। নানা কাজ। তারপর কত কাণ্ড। গোপীদের ভুলে গিছলেন। স্মরণ হলে, উদ্ধবকে বললেন, যাও উদ্ধব, এখনই যাও। গিয়ে গোপীদের সংবাদ নিয়ে এস শীঘ্র। আমার যখন কোন ঐশ্বর্য ছিল না তখন তারা আমায় মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে। আমি তাদের কেনা হয়ে গেছি ভালবাসায়। তারা শোধ না দিলে আমি এ ঋণ শোধ করতে পারবো না। যাও উদ্ধব, শীঘ্র যাও—তাদের খবর নিয়ে এসো। ঐশ্বর্য হয়েছে বলে এখন তো আমায় সকলেই ভালবাসে।

তাই তো ঠাকুর অন্তরঙ্গদের জন্য অত ব্যাকুল হতেন। দক্ষিণেশ্বর বাগানে পড়ে আছেন। কে খবর করতো? তা' আবার কর্মচারীরা সব অন্য রকমের লোক। সাত টাকা মাইনে। আত্মীয় কুটুম্ব সব গরীব, খেতে পায় না। ম্যালেরিয়ায় মর মর। তারপর সকলে ঠাওরিয়েছে পাগল। এখন সেই লোককে যারা ভালবেসেছিল ঐ অবস্থায়, তারা কে গো? তাদেরই বলে অন্তরঙ্গ, আপনার লোক। অসুখই হোক আর ভালই থাকুক, তারা সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকে। আপনার লোককে কি কেউ ছেড়ে দেয় অসুখ হলে?

আহা কি আদর্শ দেখিয়ে গেছেন! 'মা মা' বলে পাগল। বাহ্য জ্ঞান নাই। এ অবস্থা মানুষে হয় কি? মানুষের এক আধবার হতেও পারে। কিন্তু এঁর সারা জীবন এক ভাব। কামিনীকাঞ্চনের কথা হলে দম বন্ধ হয়ে যেতো। কোথায় পাবে এ আদর্শ?

অন্য সাধুদের কি ছিল? অণিমা লঘিমা আদি অষ্টসিদ্ধি লাভই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু ঠাকুর এসে ওদিক দিয়ে মাড়ালেন না।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, ভাই, সিদ্ধাই রাখলে শক্তি হবে বটে, কিন্তু আমাকে পাবে না।

এ সব কথা আমাদের প্রথম থেকেই শুনাচ্ছিলেন—সব lower deal (হীন আদর্শ) থেকেই মন প্রথম থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। ও সব যেন কাঁটাবন। এতে অন্য গাছ জন্মে না। ক্রাইস্ট বলেছিলেন এই কথা। ঠাকুর তাই আগে থেকেই আমাকে রক্ষা করলেন কাঁটাবন সাফ করে দিলেন।

তাঁর এক কথা, কিসে ভগবানের পাদপদ্মে ভক্তি লাভ হয়। তিনি আর কিছু চাইলেন না। দেখুন না মাড়োয়ারী টাকা দিতে চাইলে, তিনি নিলেন না। বললে, হৃদয়ের কাছে টাকা রেখে দি? তা'তেও তিনি রাজী হলেন না। আবার বললেন, লোকমান্যে ঝাঁটা মারি। এমনি কথা, সোজা কথা তো লোকের মনে থাকে না। তাই লঙ্কা-ফোড়ন দিয়ে কথা কইতেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—এঁদের মিষ্টিমুখ করিয়ে দিন, সন্ধ্যা হয়ে এলো।

সাধু ও ভক্তরা প্রসাদ খাইয়া পুনরায় আসিয়া বসিলেন। এখনও সন্ধ্যার একটু বাকী আছে। পুনরায় কথা হইতেছে।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—গুরুর আদেশ হলে কাজ করা যায়। তখন হাসপাতাল ডিসপেনসারী কর আর যাই কর, দোষ নাই।

কিন্তু তোমার কথায় হবে না। তুমি কি সিদ্ধপুরুষ? তুমি কি জান, কোনটা ভাল কোনটা মন্দ? তাই তোমার কথায় হবে না। গুরুর কথা চাই। গুরুর আদেশ নিয়ে যা' তা' করা যায়। তুমি কি করবে তা' তিনি জানেন। তোমার এই পথই ভাল। তাই অন্য পথে গেলে হবে কি করে? তোমায় হাসপাতাল ডিসপেনসারী নিয়েই থাকতে হবে। সকলের পক্ষে এই নয়। যার যা' পেটে সয় গুরু সেরূপ ব্যবস্থা করেন।

সন্ধ্যার আলো আসিয়াছে—হেরিকেন লেণ্টার্ণ। শ্রীম উঠিয়া গিয়া সিঁড়ির ঘরে বসিলেন। শরীর তেমন ভাল নয়।

তিনি চেয়ারে উত্তরাস্য বসিয়াছেন সিঁড়ির গোড়ায়। শ্রীমর

সম্মুখে জোড়া বেঞ্চিতে বসিয়াছেন স্বামী কমলেশ্বরানন্দ, ব্রহ্মচারী মনু, লালবিহারীবাবু প্রভৃতি।

দেখিতে দেখিতে নিত্যকার ভক্তগণ আসিয়া একে একে জুটিতেছেন। ডাক্তার বক্সী, বিনয়, ছোট অমূল্য, বলাই, খুলনাবাসী ভৌমিক, জগবন্ধু, বড় জিতেন, ছোট জিতেন প্রভৃতি আসিয়াছেন।

আলো আসিতেই কথা বন্ধ হইয়া গেল। শ্রীম সকল কার্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের ধ্যান করিতে লাগিলেন। শ্রীমর সঙ্গে ভক্তগণ ধ্যান করিতেছেন।

এখন সাড়ে সাতটা। শ্রীম তিন তলায় ভোজন করিতে গেলেন। শরীর অসুস্থ। তাই শীঘ্র ভোজন করেন।

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ সকলকে মঠের সব পুরানো কথা কহিতেছেন। কখনও বাবুরাম মহারাজের কথা, কখনও হরি মহারাজের কথা, কখনও অপর মহারাজদের কথা। ভক্তিগদগদ চিত্তে তিনি ঘটনার পর ঘটনা বর্ণনা করিয়া চলিয়াছেন। ভক্তগণ অতি সমাহিত মনে তাহা শুনিতেছেন। বোধ হইতেছে, যেন তাঁহারা আনন্দ সাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন।

ইতিমধ্যে দুর্গাপদ মিত্র (হিংলিংবাম) আসিয়াছেন। অল্পক্ষণ মধ্যে শ্রীমও ফিরিয়া আসিলেন। এখন সাড়ে আটটা।

শ্রীম অসুস্থ ও ক্লান্ত হওয়ায় ভক্তসভায় বসিলেন না। নিজের ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, আপনারা ঠাকুরের কথার আলোচনা করতে থাকুন।

রাত্রি সাড়ে নয়টায় শ্রীমর আদেশে অন্তেবাসী ডাক্তার বক্সীর মোটরে করিয়া সাধু ব্রহ্মচারীদিগকে ঠনঠনে কালীবাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং ট্রামে তুলিয়া দিলেন। তাঁহারা ভবানীপুর যাইবেন।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা, ২৭শে জুলাই, ১৯২৪ খ্রী:
১১ই শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল, রবিবার, কৃষ্ণা একাদশী ৩২।৪৪ পল

নবম অধ্যায়

তখন চায় কেবল শান্তি শান্তি প্রশান্তি

মর্টন স্কুল। সকাল ছয়টা। শ্রীমর চারতলার কক্ষ। তিনি এইমাত্র তিনতলা হইতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া উপরে আসিয়াছেন। অন্তেবাসী, ছোট জিতেন ও বিনয় শ্রীমর অপেক্ষায় বসিয়া আছেন।

তিনি অন্তেবাসীকে বলিলেন, কয়টা কাজ জমে আছে। আপনাকে আজই সেগুলি শেষ করতে হবে। প্রথম, 'বসুমতী' অফিসে যেতে হবে। এই লেখা (স্বামীজীর সম্বন্ধে প্রবন্ধ) দিয়ে আসতে হবে। আর পূর্বে যা পাঠান হয়েছে, তার প্রিণ্ট হয়ে থাকলে ফাইল নিয়ে আসতে হবে। এখানে ভক্তদের উহা পড়ে শোনান হবে। দ্বিতীয়, শুনতে পাচ্ছি দিশি খদ্দরের গেঞ্জি, ফতুয়া তৈরী এবং বিক্রী হচ্ছে। সেগুলি কেমন দেখে আসবেন। আর তৃতীয়, আমার ঘরে পার্টিশানের নিচে অনেকটা ফাঁক। সেটা বন্ধ করতে হবে।

মর্টন স্কুলের চার তলার ছাদে একটি খুব বড় ঘর। এই ঘরের মাঝখানে একটা ছয় ফুট উঁচু পার্টিশান দিয়ে ঘরটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। দক্ষিণ অংশে শ্রীম থাকেন। উত্তরের অংশে একটি ক্লাস বসে। আজকাল পঞ্চম শ্রেণী আছে। সাধারণতঃ শ্রীম এখানে ছোট শিশুদের ক্লাস রাখেন।

ঠাকুর বলিতেন, পরমহংসগণের স্বভাব পাঁচ বছরের শিশুর মত। কোন আঁট নাই। তাঁহারা তাই দুই চার জন শিশুকে কাছে রাখেন তাহাদের ভাব আরোপ করিবার জন্য। তাই শিশু শ্রেণী শ্রীমর ঘরের পাশে। কখন দেখা যায় শ্রীম ঐ ক্লাসে গিয়া বসিয়া আছেন। শিশুদের সঙ্গে সরল সুমিষ্ট রঙ্গরস করিতেছেন—যেন একটি বৃদ্ধ

শিশু। কখনও শিশুদের মত তাঁহার দৈবী বৃহৎ চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া তাহাদেরই মত আধ আধ কথা কহিতেছেন। শ্রীমর ঘরের পশ্চিমের জানালা খুলিলে নিচে দেখা যায় আমহার্স্ট স্ট্রীট।

শ্রীমর ঘরের বাহিরে কতকগুলি পালক পড়িয়া আছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—কি আশ্চর্য, কি করে পায়রাটাকে মারলো। বিড়াল মেরেছে মনে হয়। আর কি জানোয়ার এখানে আসতে পারে?

একজন ভক্ত—রাত্রে পায়রাগুলি যখন ঘুমোয় তখন এসে ধরেছে বলে মনে হয়।

শ্রীম—আমি তো অবাক সকালে পালকগুলি পড়ে আছে দেখে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি গম্ভীর ভাবে)—এই দেখ জীবনের অনিশ্চয়তা। কোথায় ছাদের কার্নিসে বসে ঘুমুচ্ছিল। সেখানে বিড়াল গেল আর মেরে ফেললো। তেমনি সব জীবের জীবন। আছে তো বেশ। কিন্তু কখন যাবে ঠিক নাই। মুহূর্তে সব শেষ হয়ে যায়।

হাঁ, শতবর্ষ পরে সকলকেই যেতে হবে এটা ঠিক। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে যেতে হবে। এ-ও তাঁর কাজ। যদি স্মরণ থাকবে সকলের, তবে জগৎ-লীলা অচল। তখন কে যায় তোমার অতশত করতে? তাঁর প্ল্যানটি এমন, প্রায় সকলেই ভুলে আছে। কদাচিৎ দু'চার জন সে-টি দেখতে পায়। তারা সর্বদা সজাগ থাকে যাবার জন্য। তাই তাদের দ্বারা সংসারের কাজ বেশী হয় না।

কিন্তু যাদের ঐ জ্ঞানের পরও কাজে লাগান, তাঁরাই যথার্থ সমাজ সংরক্ষক—যেমন ব্যাস বশিষ্ঠাদি। তাঁরা সকলকে বলেন—নিজেরাও পালন করেন—ঈশ্বর আছেন। তোমরা সব ঈশ্বরের সন্তান, অংশ। এটা জেনে সংসার কর।

যারা শোনে তাদেরই বলে ভক্ত। তারা দু'দিক রাখতে পারে—ঈশ্বর ও জগৎ।

বুদ্ধি দিয়ে প্রথম বোঝ, গুরু মুখে শাস্ত্র শুনে—ঈশ্বর আছেন।

তারপর সাধন করলে অন্তরে অনুভব হয়, তিনি আছেন। তারপর, তাঁর কৃপায় তাঁর সাক্ষাৎকার হলে, তিনি দর্শন দিলে, তখন হয় পাকা বিশ্বাস—তিনি আছেন। সেই বিশ্বাস নিয়ে ঋষিরা কাজ করেছিলেন। স্বামীজীর কাজ, ঠাকুরের অন্তরঙ্গদের কাজ এইরূপ।

আর একটা দল আছে। তারা অন্যদিকে যায়, উল্টো দিকে তাঁর ইচ্ছায়—অবিদ্যার দিকে। তারা তাঁকে জানে না, মানে না। তিনিই তাদের ভিতর মিথ্যা অহংকার ঢুকিয়ে দিয়েছেন। সেই অহংকারই তাদের চালনা করে। বেশীর ভাগ মানুষই এই দলের, তারা না থাকলে জগৎটি চলে না। তাই তারা তাঁরই বিধানে অন্য দিকে চালিত হয়।

তারাই জন্ম জন্ম দুঃখ কষ্ট পায়, বিষয়ের সুখদুঃখ উপভোগ করে, অশান্ত অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। তখন তাঁর সন্ধান করে। তখনও তাঁকে চায় না directly (সাক্ষাৎভাবে) কিন্তু শান্তি সুখ চায়। সংসারের সব জিনিস দুঃখে মোড়া দেখতে পেয়ে উহা আর চায় না। চায় কেবল শান্তি শান্তি প্রশান্তি।

ভগবান তখনই তাদের প্রার্থনা শোনেন। আর গুরুরূপে সামনে এসে উপস্থিত হন। গুরুর কথা তখন শোনে, শাস্ত্রে বিশ্বাস হয়, ঈশ্বরে বিশ্বাস হয়।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—আর একটা মাঝের অবস্থা আছে। সেখান থেকেও ভগবানকে ডাকে লোক। এদের বিশ্বাস ভগবান জগতের অধিপতি। কিন্তু তাঁর কাছে অখণ্ড শান্তি, অফুরন্ত সুখ না চেয়ে, চায় খণ্ড শান্তি, নশ্বর সুখ, জাগতিক সুখ, বিষয় সুখ—রাজ্য, ধন মান স্ত্রী পুত্র অর্থাৎ কামিনী কাঞ্চন। তিনি তা' দেন। এদের বলে সকাম ভক্ত। কিন্তু এতেও যখন শান্তি হয় না স্থায়ী, তখন everlasting peace, everlasting joy-এর সন্ধান করে, শাশ্বত শান্তি সুখের সন্ধান করে। তিনটে অবস্থা—পশুভোগী, সকাম ভক্ত-ভোগী ও যোগী।

যোগীও দুই থাকের—যোগী-ভোগী ও যোগী। এরা বুঝেছে

আগে ঈশ্বর পরে জগৎ। তাই সে যোগী। কিন্তু কিছু ভোগ বাকী থাকে। সে ভোগ করে ভগবানের শরণাগত হয়ে—যেমন পাণ্ডবগণ। শ্রীকৃষ্ণের অধীন হয়ে রাজ্যাদি ভোগ করেও তা'তে বদ্ধ হয় নাই। যেমন মা ছেলেকে হাতে ধরে রেখে মিঠাই খাওয়াচ্ছে। যেই দেখছে আর বেশী খেলে অসুখ করবে অমনি সরিয়ে নেয়। যতটাতে বাসনা তৃপ্ত হয়, অথচ শরীর মন সুস্থ থাকে, ততটাই খেতে দেয়। তাই এদের বলে যোগী-ভোগী। এরাও ক্রমে যোগী হয়। পাণ্ডবরা যোগী-ভোগী থেকে শেষে কেবল যোগী হয়েছিলেন এটা ক্রমসিদ্ধির রাস্তা। তখন ঘরে থাকলেও ভিতরে পূর্ণ সন্ন্যাস। পাণ্ডবরা শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ঘরে থেকেও শেষে পূর্ণ যোগী হলেন। মহাপ্রস্থান করলেন শ্রীকৃষ্ণের শরীর ত্যাগের সংবাদ পেয়ে।

শুদ্ধ যোগী যেমন নারদ, শুকদেব। এরা কুমার সন্ন্যাসী। তারা যেন মৌমাছি, ফুলের মধু ছাড়া অন্য কিছু খাবে না। স্বাতি নক্ষত্রের বৃষ্টির জল ছাড়া অন্য ছোঁবে না—ফটিক জল চাই। এরা নৈকষ্য কুলীন।

এই চার থাক মানুষের। পশুভোগী, সকাম ভক্তভোগী, যোগী-ভোগী ও যোগী। সকল জীবই শেষকালে একদিন যোগী হয়ে মুক্তিলাভ করবে।

শ্রীম (ছোট জিতেনের প্রতি)—এই পাখীটির হয়ে গেল একটি জন্ম। কত লক্ষ লক্ষ জন্মের পর মানুষ হয়। মানুষেরও আবার তিন অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হয়। তারপর মোক্ষলাভ হয়। মানুষ হয়েও আবার নিচে পড়া যায়—যেমন ভরত রাজা। হরিণ ভাবতে ভাবতে হরিণ হয়ে গেল। রাজা, হরিণ, জড় ভরত।

(যুবকের প্রতি)—ভারতের culture (সংস্কৃতি) যেন চারতলা বাড়ী। এর basement, ভিত্তি হলো ব্রহ্মজ্ঞান—সম্পূর্ণ নিষ্কাম জ্ঞান। এর উপর চারটি তল—যোগী, যোগী-ভোগী, সকাম ভক্তভোগী ও পশুভোগী। তাই এটা অতকাল বেঁচে আছে ও থাকবে। এই জন্য এর নাম সনাতম ধর্ম—**eternal religion.**

ব্রহ্ম eternal (শাশ্বত)। তার থেকে বের হয়েছে এই চার ক্লাস মানুষ। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—সময়ের এই চার ভাগ। চার যুগে চার বর্ণের আধিপত্য হয়—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র। গুণ ও কর্মের দ্বারা এই জাতি ভেদ। এটা একটা সামাজিক ব্যবস্থা—সুশৃঙ্খলার জন্য এর উদ্ভব। সমাজ সুশৃঙ্খল হলে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ সুগম হয়।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—যদি সকলে জ্ঞানী হয়ে যায় তা' হলে তাঁর জগৎ-লীলা চলে কি করে? তাই তিনি এই অজ্ঞান রেখে দিয়েছেন।

ঋষিরা বলেছেন, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়—এটা তাঁর খেলা। তিনিই সব হয়েছেন, জীব জগৎ। আবার জ্ঞান অজ্ঞান, বন্ধন মুক্তি, এ সবও তিনি। 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রবিশৎ'। তিনি জগৎরূপে বিস্তৃত হয়েছেন, তিনিই জীবনরূপ ধারণ করেছেন। আবার তিনি অন্তর্যামীরূপে জীবের ভিতর প্রবেশ করেছেন। One man's show—একেই বহু প্রকাশ।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি)—এই পাখীটির মৃত্যু দিয়ে আমাদের চৈতন্য করিয়ে দিলেন। তিনিই পাখী হয়ে শুলেন আবার বিড়াল হলে মারলেন, খেলেন। যাদের অহংকারটা সম্পূর্ণরূপে ভগবানে merged (মিলিত) হয়ে গেছে তারাই এই সত্যটি দেখতে পায়।

পিতামহ ভীষ্মের এই জ্ঞান ছিল। তিনি জানতেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপ ধারণ করেছেন,ধর্ম সংস্থাপনের জন্য। জানতেন, ভগবানই কৌরব, ভগবানই পাণ্ডব। এবার সকলের যাবার পালা। এই জন্যই হয়তো কৌরবপক্ষে ছিলেন। অন্য কারণও থাকতে পারে।

বললেনও শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই—আমিই কাল হয়ে এসেছি সব সংহার করতে। আমিই অর্জুন, আমিই এই সব। বড় বড় কতকগুলির নাম করলেন। বস্তুত সবই তিনি।

অপরাহ্ন ছয়টা বাজিয়াছে। ছাদে অন্তেবাসী, শান্তি ও ছোট রমেশ বসিয়া আছেন। শ্রীম তিনতলা হইতে উপরে উঠিয়াছেন।

ছাদে চুপি দিয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দরজা ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। শ্রীমর শরীর আজ তত ভাল নয়। পেটের অসুখ চলিতেছে—ভার ভার ভাব। তাই সারা দুপুর তিন তলায় ছিলেন।

সন্ধ্যা হয় হয়। অন্তেবাসী গানের স্বর শুনিয়া পার্টিশানের ঘরে প্রবেশ করিলেন। শ্রীম নিজের ঘরে বিছানার উপর বসিয়া গান গাহিতেছেন। ছোট রমেশ এবং শান্তিও আসিলেন। গানের পর গান হইতেছে—যেন ভিতরে ভাবের বন্যা বহিতেছে। বন্যার জল বাঁধ ভাঙ্গিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

প্রথম গাহিলেন রামনাম কীর্তন—

গান। রাম রাম জয় রাজা রাম।
রাম রাম জয় সীতা রাম॥
রঘুপতি রাঘব রাজা রাম।
পতিত পাবন সীতা রাম॥

গান। রাম নাম গাওয়ে বনের পাখী।
প্রাণ ভরে আয় রাম বলে ডাকি॥

গান। মা ত্বং হি তারা,
তুমি ত্রিগুণ ধারা পরাৎপরা।

গান। আমি সাধন ভজন হীন, পরশে পবিত্র কর।

গান। জয় জয় শ্রীচৈতন্য অদ্বৈত প্রভু নিত্যানন্দ।
জয় শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ, জয় মুরারী মুকুন্দ॥

গান। গৌরাঙ্গ সুন্দর নব নটবর তপত কাঞ্চন কায়।

গান। কে যায় রে সুরধুনীর তীরে,
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে রে।

গান। কি দেখিলাম আজি কেশব ভারতীর কুটীরে।

গান। ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।

গান। কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্।
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্॥

গান। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

গান। কবে হবে সে প্রেম সঞ্চার।
হয়ে পূর্ণ কাম বলবো হরিনাম,
দু' নয়নে বইবে প্রেম অশ্রুধার॥

গানের পর গান। নদীর তীর যেন ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে। প্রেম-মত্ততার বাতাবরণে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠটি পরিপূর্ণ।

পার্টিশানের ঘরে চেয়ারে বসা জগবন্ধু। পাশেই বেঞ্চিতে বসিয়া আছেন ছোট রমেশ। ছোট জিতেন, বড় জিতেন, ডাক্তার বক্সী, বিনয়, ছোট অমূল্য, ছোট নলিনী, বলাই, সুখেন্দু প্রভৃতি ধীরে ধীরে আসিয়া পার্টিশানের ঘরে বসিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীমর বাক্যনিঃসৃত সুমধুর প্রেমরস পান করিতেছেন। গান শেষ হইল। শ্রীম নীরব, ভক্তবৃন্দ নীরব।

এখন রাত্রি সাড়ে আটটা। শ্রীম নিজের আসন হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে কে আছেন ওখানে? আমরা সকলেই আছি, অন্তেবাসী উত্তর করিলেন। সকলে ভিতরে আসুন, শ্রীম পুনরায় বলিলেন।

শ্রীম তক্তাপোশের উপর বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য। শ্রীমর ডান হাতে একখানা চেয়ার রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, জিতেন বাবু, আপনি চেয়ারম্যান হোন। বড় জিতেন চেয়ারে বসিলেন দক্ষিণাস্য। ছোট রমেশ ও ডাক্তার শ্রীমর আদেশে বিছানায় বসিয়াছেন। শ্রীমর শরীর খারাপ।

বড় জিতেন—শরীরটা খারাপ চলছে কতদিন ধরে। কি খেলে ঠাণ্ডা থাকে?

শ্রীমর মন এখনও অন্তরে নিবদ্ধ, ভজনানন্দে মগ্ন। জিতেন-বাবুর প্রশ্ন শ্রীমর কর্ণে প্রবেশ করে নাই। সুপ্তোত্থিত বালক যেন 'মা মা তুমি কোথায়' বলে ব্যাকুল, সেইরূপ ব্যাকুল ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারলীলার দিব্য সংবাদ ভক্তগণকে পরিবেশন করিতেছেন—তাহাদের ভরসা ও বিশ্বাসের জন্য।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঈশ্বর আবার incarnate (অবতীর্ণ) হয়েছেন—মানবের কল্যাণের জন্য। ঠাকুর নিজ মুখে বলেছেন, সচ্চিদানন্দ এই শরীরে এসেছেন মানুষ হয়ে। কেন মানুষ-শরীর ধারণ করেন ? তিনি বলতেন, এই মানব-শরীরেই প্রেম ভক্তি জ্ঞান, ভালবাসাবাসি, নাচানাচি এই সব দিব্য লীলা প্রকাশ সম্ভব। Abstract (সূক্ষ্ম) মানুষ ধরতে পারে না, ভয় পায় তাই concrete (স্থূল) দেহ নিয়ে আসেন। তিনি বলতেন, সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরলীলা, জগৎলীলা দেবলীলা ও মানবলীলা করেন।

মানুষের যত সব higher impulses (উচ্চ বৃত্তি) আছে সেইগুলি কি করে ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দিতে হয় সেই শিক্ষা দিবার জন্য মানুষ-শরীর ধরে আসেন। এ কার্যটি নরলীলা না হলে হয় না, তাই অবতার। ঠাকুর 'মা মা' করে পাগল দিবানিশি—মন প্রাণ তাঁ'তে নিমগ্ন। দেহ জ্ঞান নাই, বাহ্য জগতের জ্ঞান নাই। অন্তরাত্মাতে মন বিলীন। জগতের জ্ঞান যখন হলো, তখন দেখেছেন মা-ই জীব জগৎ হয়ে রয়েছেন। তাই মুখে 'মা মা' সর্বদা। যেন ভয়ে ভীত বালক। মা ছাড়া কি করে থাকে! শিশু! জগৎলীলার বিকট রূপ দেখে অর্জুন একেবারে বেপথু হয়েছিলেন। ঋষিরাও ভীত। তাই প্রার্থনা করলেন, 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাম্ পাহি নিত্যং।' অর্জুন কম্পিত হয়ে প্রার্থনা করলেন, তোমার 'সৌম্যবপু' ধারণ কর।

ঠাকুর মায়ের জগৎ-লীলার তাজ্জব কাণ্ড দেখে ভীত। তাই মায়ের সৌম্যরূপ, স্নেহময়ীরূপ সর্বদা দেখতে চাইছেন। দেখছেন, মা সব ভুলিয়ে দিচ্ছেন, ভেল্কী লাগিয়ে দিচ্ছেন, তাই আবার প্রার্থনা করছেন, মা যদি এখানে রাখ তবে তোমার ভুবনমোহনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।

মায়ের রূপ অন্তরে যখন দেখছেন, তখন সমাধিমগ্ন, আনন্দ সাগরে মীন ভাসমান। যখন বাহ্যরূপ দেখছেন তখন 'মা মা' বলে কাঁদছেন, প্রার্থনা করছেন। সব স্তবস্তুতি।

লীলার জন্য ঈশ্বর দু'টি ভাব ধারণ করেছেন, একটি ভক্ত, আর একটি ভগবান। এই সব করেছেন ভক্তের ভাবে। আবার ভগবানের ভাবে বলছেন, 'আমায় ধর, আমাকে ধ্যান কর। মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে—যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। জ্ঞান ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য, শান্তি সুখ, প্রেম সমাধি, এ সব আমার ঐশ্বর্য।'

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—এই যে মানুষ-শরীর ধারণ করে আসেন এর ব্যাখ্যা ভক্তরা কেউ কেউ এইরূপে করেন,—আমরা রক্ত মাংসের শরীরধারী। অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে আমরা বুঝতে পারি না। তাই আমাদের জন্য রক্ত মাংসের শরীর ধারণ করে আসেন। মানুষের মত তাঁর সকল ব্যবহার। সকল কাজ। শোকতাপ উল্লাস, আনন্দ, সব মানুষের মত।

বস্তুতঃ তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দই। যিনি বাক্য মনের অতীত, তিনিই তাই। তবে ভক্তদের কল্যাণের জন্য মানুষরূপে প্রতীয়মান হন। মানুষ তাঁকে দেখছে ঠিক মানুষ। বস্তুতঃ কি তিনি তাই? তা' নয়, তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। মানুষের মত সব করছেন, নৃত্য করছেন ঠাকুর।

যেমন বায়স্কোপের ছবি। মনে হয় যেন ঠিক ঠিক মানুষই দেখছি। কিন্তু বাস্তবিক কি তাই? যখন ক্রাইস্টের ছবি দেখা যায়, তখন মনে হয় সত্যি সত্যি উনি ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন। এমনি vivid, জীবন্ত দেখা যায়। বস্তুতঃ তা নয়। তেমনি অবতার, ঠাকুর। ভক্তরা তাই বলেছেন, 'বেদান্তসিদ্ধান্তঃ নৃত্যতি'। বেদান্তের সিদ্ধান্ত পরম ব্রহ্ম, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। তিনি মানুষ রূপে, শ্রীকৃষ্ণ রূপে, গোপীদের সঙ্গে রাস লীলায় নৃত্য করছেন।

শ্রীম কিছুকাল নীরব। পুনরায় কথামৃত বর্ষণ করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—মানুষকে কি শক্তি দিয়েছেন দেখ না। নির্জনে গোপনে কেঁদে কেঁদে ডাকলে, তার আর একটা চক্ষু হয়। তাকেই বলে দিব্য চক্ষু। তা' দিয়ে ঈশ্বরকে দেখতে পায়।

সেই চক্ষুটি থাকে কারণ শরীরে, ঠাকুর বলতেন, ভাগবতী তনু—spiritual body—এই দর্শনটি হলে মানুষ কৃতকৃত্য হয়ে গেল। এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, উদ্দেশ্য মানুষ জীবনের।

অথবা যেন crystal স্ফটিকপিণ্ড। এর ভিতর দিয়ে পিছনের দ্রব্য দেখা যায়। অথবা যেমন কাঁচ। এর ভেতর দিয়ে সব দেখা যায়। এইটিই mystery (রহস্য)।

তিনি মায়াসহায়ে জগৎ হয়েছেন, জীব হয়েছেন। আবার তিনি সাক্ষীরূপে ভিতরে আছেন।

জীবরূপে অহংকারের জন্য যত গণ্ডগোল। আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমার পুত্র হলো, আমার পুত্র মরলো—এই আমি আমি দিয়ে হট্টোগোল রচনা করেছেন। এই তাজ্জব কাণ্ড।

আবার নিজে মানুষ হয়ে এসে, মানুষের সকল ধর্ম নিয়ে শোকমোহে মুহ্যমান হয়ে, তা' থেকে নিজেকে মুক্ত করছেন। ভক্তদের বলছেন, যদি শান্তি চাও আনন্দ চাও, তবে আমায় ধর, আমার পথ অনুসরণ কর। আমার মত ঈশ্বরের সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতিয়ে থাক—পিতা মাতা বন্ধু সখা প্রভু—প্রভৃতির যে কোন একটাকে বেছে নাও। নিজে মায়ের শিশু হয়ে ছিলেন। ভক্তদের কাউকে বলেছিলেন, বড় ঘরের দাসীর মত থাক সংসারে। কথাটা হচ্ছে, বদ্ধ থেকে মুক্ত হওয়ার পথটি দেখিয়ে দেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—সকল জীবের ভিতর মানুষই কেবল এই mystery penetrate (রহস্য ভেদ) করতে পারে। এইটি তার monopoly, একচেটিয়া অধিকার। যার individuality (অহংকার) আছে সেই জীব। এই জীবত্ব নাশ হয় দিব্যচক্ষু লাভে। একেই চিত্তশুদ্ধি বলা হয়। যোগীদের এই দিব্যচক্ষু লাভ হয়। তাঁরা অনন্তের এই veil (আবরণ) ছিন্ন করেন দিব্যচক্ষু সহায়ে। দিব্যচক্ষু বা চিত্তশুদ্ধি জ্ঞানপ্রাপ্তি বা অহংকার বিনাশ, আর মুক্তি বা জন্ম মরণ শৃঙ্খল ছিন্ন করা—এ অবস্থা একই সময়ে প্রাপ্তি হয়—একই কথা।

বড় জিতেন (আক্ষেপ ভরে)—ঐ চক্ষু তো বহু দূরে। এই চক্ষুতে আর কত দূর হবে?

শ্রীম—কেন, এই চক্ষুতেও উপায় আছে। তা-ও ঠাকুর বলে গেছেন—গুরুবাক্যে বিশ্বাস। গুরুর বাক্যে বিশ্বাস হলেও আশ্চর্য ফল হয়। একজন ভক্ত বৃদ্ধ ও অসমর্থ। তাই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, উপায় কি? তক্ষুণি ঝট করে তিনি উত্তর করলেন—গুরুবাক্যে বিশ্বাস। কি আর করা যায় ঐ চক্ষু হলো না বলে? এটা হলো alternative (অন্য) উপায়।

এটা কেমন, না, এইরূপ।—আমরা যদি অন্ধ হই, চোখে দেখতে না পাই, অথচ রামবাবুর সঙ্গে আমার মিলন অতিশয় দরকার। তখন কি করি? আর একজন লোকের সহায়তা নিই। সে আমায় ধরে নিয়ে গিয়ে আর এক ব্যক্তিকে ধরিয়ে দিয়ে বলে, এই রামবাবু, আপনি যাকে চাইছেন।

চোখে নাই বা দেখলো। হাতে ধরলে স্পর্শ করলেও দেখা হয়। আবার কথা শোনা; এ ভাবেও দেখা হতে পারে। বাকী চারটা ইন্দ্রিয় দিয়েও দেখা যেতে পারে। ভাল লোকের কথায় বিশ্বাস দরকার।

একজনের কথায় বিশ্বাস করে যেমন অন্ধ আর একজনের সঙ্গে মিলিত হতে পারে, তেমনি গুরুবাক্য। গুরুর কথায়, অবতারের কথায় বিশ্বাস করলেও সব হয়ে যায়। বালকের বিশ্বাস চাই। পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস চাই। মা বলেছে, ও ঘরে জুজু আছে। বালককে মা বলেছে, ও ঘরে জুজু আছে। বালকের ষোল আনা বিশ্বাস, পূর্ণ বিশ্বাস, ও ঘরে জুজু আছে। জুজু কি তা' সে হয়তো কখনও জানে নাই, দেখে নাই।

তাই গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, শ্রুত্বা অন্যেভ্যঃ উপাসতে। কি ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার। অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্যঃ উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতপরায়ণা।

শ্রীম—এইটি গুরু বাক্যে বিশ্বাস যোগ।

ভক্তগণ প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন অনেকে। এখন ডাক্তার-বাবু শ্রীমর শরীর পরীক্ষা করিতেছেন। রাত অনেক হইয়াছে। শ্রীম বলিতেছেন, যারা যারা হেঁটে যাবেন তারা রওনা হয়ে পড়ুন। মোটরে যাবেন কে কে? একজন বললেন ডাক্তারবাবু, বিনয়, ছোট অমূল্য ও ছোট নলিনী। Who is the fourth man—চতুর্থ ব্যক্তি কে?—শ্রীম বলিলেন। ছোট নলিনী উত্তর করিলেন, 'আজ্ঞে আমি'। আচ্ছা, তা' হলে আসুন, শ্রীম বলিলেন।

ভক্তগণ প্রণাম করিতেছেন।

শ্রীম (ছোট অমূল্যের প্রতি)—দেশে কখন যাবেন?

ছোট অমূল্য—এখনও কিছু তারিখ ঠিক হয় নাই, তবে শীঘ্রই যেতে হবে।

ছোট অমূল্য খুব ভক্ত লোক, বড় মিষ্ট ব্যবহার। শ্রীম বলেন, তাঁহার বড় শুদ্ধ ভাব। তাঁহাকে তাই খুব ভালবাসেন।

বড় জিতেন (ছোট অমূল্যের প্রতি)—এই উনুন মেরামতের কাজে লাগতে হবে তো গিয়ে?

শ্রীম (অভয় কণ্ঠে)—কেন, কি হয়েছে তা'তে? অবতার যে এসেছেন এখন। অবতার এলে মুক্তিফুক্তি পায়ের নিচে পড়ে থাকে। ভয় কি এখন?

ঠাকুর ঋষিদের পর্যন্ত criticise (সমালোচনা) করতে ছাড়েন নাই। তিনি বলেছিলেন, ঋষিরা বড় ভয় তরাসে।• ভাবনা কি, ঠাকুর সঙ্গে।

তিনি ভক্তদের পেছনে পেছনে থাকেন, সদা রক্ষা করেন। শরণাগত ভক্তদের ভার যে তিনি নিজে নেন। 'দদামি বুদ্ধিযোগং তান্ যেন মামুপযান্তি তে'। সর্বদা সুমতি দিয়ে রক্ষা করেন, আর যাতে তাঁকে লাভ হয় সেই ব্যবস্থা তিনি স্বয়ং করেন।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা, ২৮শে জুলাই, ১৯২৪ খ্রীঃ

১২ই শ্রাবণ ১৩৩১ সাল, সোমবার, কৃষ্ণা ত্রয়োদশী ২৭।৫৫ পল

দশম অধ্যায়

গীতার জন্ম হয় রণাঙ্গনে

মর্টন স্কুল। কলিকাতা। সকাল সাতটা। শ্রীম চারতলার ছাদে দাঁড়াইয়া আছেন, অন্তেবাসীর ঘরের সম্মুখে দেখিতেছেন, অন্তেবাসী পাট দিয়া কাগজের বাণ্ডেল বাঁধিতেছেন। 'কথামৃত' ছাপা হইতেছে বাণী প্রেসে। অন্তেবাসীর উপর ছাপার ভার। তৃতীয় ভাগের পঞ্চম সংস্করণের ছাপা চলিতেছে। তাহার জন্য কাগজাদি পাঠাইতে হইবে। শ্রীম অন্তেবাসীকে প্রেসের সঙ্গে ব্যবহার শিক্ষা দিতেছেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—যখনই কিছু প্রেসে পাঠাতে হবে কাগজ, কি কোন ফরম্, অথবা কোন বই, সেই সব পিয়ন বুকে লিখে পাঠাতে হয়। তা' হলে রেকর্ড থাকে, তা' না হলে শেষে গোলমাল হয়। হয়তো অস্বীকার করে বসে। ভুলে যায় কিনা মানুষ। তাই সই থাকলে তাদের তখন অস্বীকার করার যো নাই।

কর্ম তাই এত কঠিন। শুধু কাজ করলে হয় না। প্রথম, অল্প সময়ে অধিক কাজ চাই। দ্বিতীয়, নির্ঝঞ্ঝাট যাতে হয়। তৃতীয়, কাজটি সম্পূর্ণ সুন্দর হবে। চতুর্থ, কর্মে বদ্ধ না করে। কর্মের স্বভাবই জড়িয়ে ফেলা।

কিন্তু যদি উদ্দেশ্য ঠিক থাকে, চোখের সামনে ভাসে, তবে ও-টি হয় না। তাই ভগবানলাভের জন্য কর্ম করছি, এটা মনে থাকা চাই। তা' হলেই কর্মটি উপায় বলে মনে থাকবে। নয়তো ও-টাই উদ্দেশ্য হয়ে যাবে। তখনই যত গণ্ডগোল। বাঁধা পড়ে যায়।

কর্ম করলেই হয় না। উদ্দেশ্য ঠিক করে করা। যখনই উদ্দেশ্য কম পড়বে—ঈশ্বরভাবের টান পড়বে, তখনই ধ্যান জপ বেশী করতে হয় নির্জনে বসে। তপস্যা করতে হয় কর্ম ছেড়ে। কিম্বা কর্ম রাখলেও

আট আনা মন অন্ততঃ উদ্দেশ্যে রাখতে হবে। বার আনা হলেই ভাল—ঠাকুরের এই মত।

বার আনা মন ঈশ্বরে রেখে চার আনা মন দিয়ে কাজ করতে হয়, ঠাকুর বলতেন। নিষ্কাম কর্ম কি চারটিখানি কথা? যতটা পেটে সয় ততটা করা।

যারা সাংসারিক উন্নতির জন্য কর্ম করে, তাদের যদি উদ্দেশ্য ঠিক থাকে, তা হলে তাদের কর্ম ভাল হয়। যে উদ্দেশ্যের সঙ্গে এক মন হয়ে কাজ করে তার কর্মই ঠিক—তা' ঈশ্বরের জন্যই হোক, কি সংসারের জন্য হোক।

গত world warএর (বিশ্বযুদ্ধের) সময়, শোনা যায়, বাটা একটা চেয়ারে বসে seventytwo hours (বাহাত্তর ঘণ্টা) ফ্যাক্টরীতে কাজ করেছিলেন—কারণ যুদ্ধের জন্য জুতা তৈরী করতে হয়েছিল। নেপোলিয়নও পড়ার সময় তিন দিন একটা ঘরের ভেতর বন্ধ হয়ে একটা problem (সমস্যা) সমাধান করেছিলেন।

শশী মহারাজ নবরাত্রির সময় একবার বাহাত্তর ঘণ্টা এক আসনে বসে পূজা করেছিলেন। স্বামীজী তিনদিন না খেয়ে প্রব্রজ্যা ব্রত পালন করেছিলেন। ঠাকুর নির্বিকল্প সমাধিতে তিনদিন বসা ছিলেন। আর একবার ছয় মাস কাটিয়েছিলেন জড় সমাধিতে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে। লক্ষ্মণ বার বৎসর নিদ্রা যান নাই। এঁরা সব উদ্দেশ্যের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিলেন।

জাগতিক ধন ও ঐশ্বর্যের জন্য, সুনাম প্রতিপত্তি লাভের জন্য যদি লোক খাটতে পারে অত, তবে অনন্তকালের অমূল্য ধন লাভের জন্য কত খাটা উচিত? ধনপ্রাণ শরীর অর্পণ করে যে খাটে, তার মনে অযুত হস্তীর বল আসে।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—সাধকের জন্য কর্মযোগ। সিদ্ধ হয়ে কর্ম করা অন্যরূপ। সিদ্ধপুরুষ তো তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েই আছেন। তাঁর পক্ষে কর্ম দ্বারা আবার যুক্ত হওয়ার কোন দরকার

নাই। 'ক'-এর আকারে 'কা' হয়। এর উপর আর একটা আকার দিলে ঐ 'কা'-ই থাকে।

সিদ্ধপুরুষ যতই খাটুন না কেন তাঁর মন সমাধিস্থ। দেখ না স্বামীজীকে—কত খেটেছেন আমেরিকায়। একদিনে নাকি পঞ্চাশটা লেকচারও দিয়েছেন, শোনা যায়। তার ভিতরও অটুট যোগ। বলছেন, Sannyasin bold, say—Oum, Tat Sat!—হে বীর সন্ন্যাসী বল, 'ওম্ তৎসৎ ওম্'।

তাঁর 'Song of the Sannyasin'-এর সন্ন্যাসীর গীতির spiritটি (ভাবটি) তাঁর নিজ জীবন।

তাই স্বামীজী বলেছিলেন, আদর্শ কর্মী তিনি, যিনি 'in the midst of intense activity have intense calmness (কর্মগহনে নিমগ্ন থেকেও চিত্তে অসীম শান্তি) অনুভব করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্র হলো গীতার জন্মভূমি। কি প্রহেলিকা!

মহাযোগীর পক্ষে এটি সম্ভব। সাধকের সম্মুখে এই আদর্শটি রাখতে পারলে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম।

খুবই কঠিন বটে। কিন্তু যে নিষ্কাম কর্মযোগের অধিকারী তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়। ঈশ্বরই দুই একজনকে দিয়ে নিষ্কাম কর্ম করিয়ে নেন। অপরে দেখে শিখবে বলে।

কর্ম তো জীবনের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ, আত্মজ্ঞান! নিষ্কাম কর্ম, means (উপায়)। অত দিকে খেয়াল রেখে তবে কর্ম করা।

শ্রীম (ভক্তের প্রতি)—আবার যাদের সঙ্গে কর্ম করবে, তারা তো সকলে সাধক নয়—সিদ্ধ তো নয়ই। তারা তোমার ভিতর বোঝে না। তাই তোমাকে অত নেমে এসে, তাদের স্তরে বসে কাজ করতে হবে, ওদের ভাষায় কথা কইতে হবে, ওদের মত ব্যবহার করতে হবে। এতে চাই অসীম ধৈর্য।

তারা হয়তো ঠকাতে চাইবে। তুমি তা' হতে দেবে না অথচ তাদেরও আয়ত্তে রাখতে হবে। এখানে tact-এর (কৌশলের)

দরকার। পাঁচজনের সঙ্গে থাকতে হলে, কাজ করতে হলে tactএর (কৌশলের) বড়ই দরকার। ঠাকুর tact (কর্মকুশলতা) ছিল অদ্ভুত, লোক ব্যবহারে। কত দিক দেখে তবে কাজ করতে হয়।

শ্রীম (সেবকের প্রতি)—কিন্তু যদি আন্তরিক হয়, ঈশ্বরলাভের ইচ্ছা, তা' হলে সব যোগাযোগ হয়ে যায়। তাই সর্বদা তাঁকে স্মরণে রাখা—ঠাকুরকে। আর এক মনে প্রার্থনা করা—প্রভো, তোমার ভুবন মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।

ভক্তরা থাকবে সঙ্গীন চড়িয়ে—যেন সমরাঙ্গনে সৈনিক। কোন্ দিক দিয়ে গুলি এসে যায়! তাই হুঁশিয়ার, সদা জাগ্রত।

এখন সকাল নয়টা। শ্রীম মর্টন স্কুলের চারতলার সিঁড়ির ঘরে বসিয়া আছেন চেয়ারে, উত্তরাস্য। বড় নলিনীর সহিত ব্রহ্মচারী নগেন্দ্রনাথ আসিয়াছেন। এই ব্রহ্মচারীটি বেলুড় মঠে অনেক কাজ করিয়াছেন, কৃতকর্মা লোক। এখন দক্ষিণেশ্বরের মা-কালীর জমিদারীর কাজ দেখেন আর মায়ের সেবার বন্দোবস্ত করেন।

দক্ষিণেশ্বর মায়ের মন্দিরের পরিচালনার বিশৃঙ্খলা হওয়ায় হাই কোর্ট হইতে রিসিভার নিযুক্ত করিয়াছেন। বেলুড়মঠের অনুমোদনে ও সমর্থনে ভক্ত শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত রিসিভার।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণ এই কালী-মন্দিরের সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট। বর্তমান ব্যবস্থায় সকলে আনন্দিত। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এই মন্দিরে ভবতারিণী মাকে জাগ্রত করিয়াছেন। এখানে ত্রিশ বৎসর অবস্থান। অবতার লীলার পুণ্যভূমি এই মন্দির। কত সমাধি, কত দর্শন, কত নৃত্যগীত—এখানে হইয়াছে। জগদম্বা মায়ের জ্যোতির্ময় রূপ ধারণ করিয়া মায়ের কোলের শিশু শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কত দিব্য লীলা করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শত স্মৃতি-বিজড়িত এই দক্ষিণেশ্বর মন্দির শ্রীমর অতি প্রিয়। শ্রীমকে ঠাকুর এক কলা শক্তি দিয়াছিলেন মায়ের নিকট চাহিয়া লীলা প্রচারের জন্য। শ্রীম তাই এই পবিত্র মন্দিরের সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন ব্রহ্মচারী নগেনের সঙ্গে।

শ্রীম (ব্রহ্মচারীর প্রতি)—বেশ হয়েছে মন্দিরের ম্যানেজমেণ্ট মঠের হাতে আসায়। কিরণবাবু ম্যানেজার, মানে মঠই ম্যানেজার। আপনি ধন্য মায়ের সেবার অধিকার পেয়ে।

ব্রহ্মচারী নগেন—ঠিক সাধুভাবে কাজ করা যায় না—পলিসি করতে হয়, তা'তে মন খারাপ হয়।

শ্রীম—তা' হলোই বা। শ্রীকৃষ্ণ কত পলিসি করেছিলেন। তবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হলো। ডিপ্লোমেসির (কূটনীতির) দরকার হলে, তা-ও করা চলে। তা' তো আর নিজের লাভের জন্য হচ্ছে না—তাঁর কাজের জন্য হচ্ছে। প্রয়োজন হলে বিনাশও করা চলে। শ্রীকৃষ্ণ তা'ও করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে ভীষ্ম পিতামহ বলতেন চক্রী—মানে কূটনীতির বাদশা।

শ্রীম—খায়রারাজের সম্পত্তিটার সঙ্গে মঠের কি সম্পর্ক ?

ব্রহ্মচারী নগেন—ও-টা কেবল আমরা দেখবো উপর থেকে। কাজ করবার জন্য অপর সব লোক রয়েছে।

শ্রীম—তা' হলেও কি কম খাটুনি—উপর থেকে দেখা! সব দায়িত্ব শিরের উপর।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—ওদের কি কম খাটতে হচ্ছে—এই (ব্রিটিশ) প্রাইম মিনিস্টারদের ? ও-সব কাজ বেশী করলে প্রায়ই দীর্ঘায়ু হয় না। কত strain (শরীর মনের উপর পীড়ন) ভাইসরয়দের (বড় লাটদের) দেখ। এখানে তিন বছর কি পাঁচ বছর কাজ করে। ওখানে (বিলেতে) গিয়ে দেখা যায়, প্রায়ই বাঁচে না বেশী দিন।

কেমন করে বাঁচে ? কত খাটুনি। Man employ (কর্মচারী নিযুক্ত) করা বড় শক্ত কাজ। Right man in the right placeএ (যে যে-কাজের উপযুক্ত তাকে সেই কাজে) বসাতে কত বেগ পেতে হয়। আর কত responsibility (দায়িত্ব)! রাজ্যের সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে। লেজিস্‌লেটিভ এসেম্‌ব্লি (বিধান সভা) আছে। এগ্‌জিকিউটিভ কাউন্‌সিল (শাসন পরিষদ) আছে। তথাপি

ভাইসরয় সর্বদা ব্যস্ত। আজ এ কম্যুনিক (বিজ্ঞপ্তি) বের করতে হবে, কাল এই অর্ডিন্যান্স (বিশেষ বিধান)। কত দিকে নজর রাখতে হয়। সোজা কথা ?

শ্রীম (ব্রহ্মচারীর প্রতি)—তিনি যতদিন কাজ করাচ্ছেন ততদিন করবেন না তো কি ? আদেশ হলে কাজ করা যায়—গুরুর আদেশ। গুরুর আদেশ হলেই তাঁর আদেশ হয়। গুরু তো মানুষ নন, তিনিই, ঈশ্বরই এই রূপ ধরে আছেন।

কাজ না করে মানুষ থাকতে পারে ? প্রকৃতি কাজ করবে—'প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষতি'। গুরু এসে বলে দেন এই ভাবে কর, আমার জন্য কর। 'ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা' কর্ম কর। নিষ্কাম ভাবে কর, ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে কর। তা' হলে তোমার কর্মও ক্ষয় হবে, আর কর্মের যে অবশ্য ফলবন্ধন তা' থেকে মুক্ত হবে। কেন না, ফল যে আমায় দিয়ে দিয়েছ। 'যোগযুক্তো……কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে'। 'কর্মভি র্ন স ব্যতে'। 'যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্'।

কঠিন তো বটেই নিষ্কাম কর্ম। তাই আবার ভরসা দিয়ে বলছেন—'স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'—একটু করতে পারলেই প্রচুর ফল পাবে। ভয় থেকে বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ হবে।

তিনি যুগে যুগে এসে এ কৌশলটি বলে দেন। তবে ভক্তরা এই গোলকধাঁধা থেকে, জন্মমরণ-চক্র থেকে বের হতে পারে।

তিনি এইমাত্র সেদিন এসেছেন। আপনাদের দিয়ে লোকদের শিক্ষা দিচ্ছেন এই নিষ্কাম কর্ম। এতে দু'টি ফল হবে। আপনারাও মুক্ত হবেন আর অপরকেও মুক্তির পথ দেখিয়ে দিবেন। ঠাকুর মাছের তেলে মাছ ভাজেন।

মিষ্টিমুখ করিয়া সাধু ভক্তগণ বিদায় লইলেন। এখন দশটা।

অপরাহ্ণ পাঁচটা। চারতলার ছাদে শ্রীম বসিয়া আছেন চেয়ারে উত্তরাস্য। শ্রীমর সামনে তিন দিকে তিনটি বেঞ্চি পাতা। তাহাতে

ভক্তগণ কেহ কেহ বসিয়া আছেন—জগবন্ধু, শান্তি, ছোট রমেশ, ভৌমিক প্রভৃতি।

কিছুক্ষণের মধ্যে বিশ্বেশ্বর মুখার্জী আসিয়া পড়িলেন। ইনি ইন্‌জিনিয়ার, কংগ্রেসের প্রথম প্রেসিডেন্ট সুবিখ্যাত ব্যারিস্টার ডব্লিউ. সি. বনার্জীর ভাগনে। সজ্জন লোক, প্রৌঢ়।

তাঁহার সহিত নানা কথা হইতেছে—কংগ্রেস, নিজের মাতুল ও ঠাকুরের কথা। বিশ্বেশ্বরবাবু 'লীলা প্রসঙ্গ' হইতে ঠাকুরের জীবনের নানা ঘটনা ও কথার উল্লেখ করিতেছেন। শ্রীম শুনিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। ভৃত্য হ্যারিকেন লণ্ঠন লইয়া আসিল। শ্রীম তৎক্ষণাৎ সব কাজ ছাড়িয়া ধ্যান করিতেছেন। ভক্তগণও সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান করিতেছেন। মোহন ও শান্তি দক্ষিণ দিকের বেঞ্চিতে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। ধ্যানান্তে শ্রীমর কথামৃত বর্ষণ হইতেছে।

শ্রীম (বিশ্বেশ্বরের প্রতি)—ঠাকুর বলেছিলেন, সন্ধ্যার সময় সব কাজ ফেলে ঈশ্বরচিন্তা করতে হয়। দু'বেলা নিয়ম করে ধ্যান করতে হয়, তাঁকে একটু স্মরণ করতে হয়।

(সহাস্যে) একজনকে বলেছিলেন, এখন ধ্যান করছিস্ না, শেষে কি পরের ঘরের বৌ-ঝি টেনে বের করবি? এমনি কাণ্ড।

এতো করেই রক্ষা নাই। আর হৈ হৈ করলে কি ফল হয় তা' তো বুঝতেই পারা যায়। মুনি ঋষিরা দিন রাত ঈশ্বরচিন্তা করেও কেউ কেউ অন্য রকম হয়ে গেলেন। আর যে আদপেই তাঁর চিন্তা করার চেষ্টা করে না তার অবস্থা অনুমেয়। তাই গুরুবাক্য শুনতে হয়। সব কাজ ফেলে দিয়ে সকাল সন্ধ্যায় ধ্যান জপ করা উচিত।

সুখেন্দুর প্রবেশ। এখন রাত্রি সাড়ে আটটা। বিশ্বেশ্বরবাবু প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। শ্রীমও উঠিয়া পড়িলেন—আহার করিতে তিনতলায় যাইবেন। ইতিমধ্যে বড় জিতেন ও নিত্যকার ভক্তগণ কেহ কেহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীম ফিরিলেন রাত্রি নয়টায়। এবারের আসর সিঁড়ির ঘর। আসিয়াই রহস্য করিয়া বলিতেছেন, তত্ত্ব কথা কও, তত্ত্ব কথা।

বড় জিতেন—আজ্ঞে তার জন্যই বসে আছি, শুনবো। আর তো সব হাবজা গোবজা। তত্ত্ব কথাই সার।

শ্রীম—না, ওগুলি (বিষয় কথা) কিছু নয় বললে চলবে না। ওসব উঠবার সিঁড়ি, ছাদে আরোহণ করবার সিঁড়ি। সিঁড়িতে সবই কি কাদা মাটি? আবার মাঝে মাঝে ইঁটও আছে।

তিনি যেকালে এ সব করেছেন, তার মানে আছে। ঋষিরা এ সব বুঝেছিলেন। তাই বলেছিলেন, ভয় করো না। এ সব তিনিই করেছেন। আবার তিনিই এ সব হয়েছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এই দেখ না, এক 'আমির' ভিতর কত কাণ্ড করেছেন। 'আমি' হতেই 'তুমি'।

আবার এমন আছে, দ্বৈত ভাব একেবারে উঠে যায়। তখনই আর এক 'আমি'।

নিত্যিকার আটপৌরে 'আমিটা' দিয়ে রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ বোঝা যাচ্ছে। এর উপরের 'আমিটা' দিয়ে অন্য জিনিস বোঝা যায়, ঈশ্বরদর্শন হয়। যোগীরা সেই 'আমি' দিয়ে তাঁকে দেখেন।

ঠাকুর যে কত উঁচুতে ছিলেন তা' কি করে বুঝবে লোক? সর্বদা সমাধিস্থ পুরুষ।

মানুষ তো সবই দেখতে এক রকম। যেমন তুবড়ি সব দেখতে এক রকম। কিন্তু আগুন দাও। তখন কোনটা লাল ফুল কাটবে, কোনটায় নীল। নানা রকম ফুল কাটে।

তেমনি মানুষের মন। কোনটা বিষয় চিন্তা করে, কোনটা ঈশ্বর চিন্তা করে। তাই বলে, 'এই মানুষে আছে রে মানুষ রতন।'

শ্রীম (যুবকের প্রতি)—'আমি'র ভিতর infinite possibilities and potentialities (উন্নতির অনন্ত সম্ভাবনা ও অনন্ত শক্তি) রয়েছে।

Laboratoryতে (গবেষণাগারে) parallel mirror (সামনা-

সামনি আর্শি) রাখে। একটা আর একটার সামনে ধরলে তা'তে infinite reflexions (অনন্ত প্রতিবিম্ব) পড়ে। তেমনি এই 'আমি'তে infinite possibilities (উন্নতির অনন্ত সম্ভাবনা) রয়েছে।

ঠাকুরদাদা পেয়ারা খায়—কাঁচা পাকা সব খায়। ছেলেরা সকলে বেশ গান করে আজকাল শুনতে পাই। ঠাকুরদাদা পেয়ারা খায়—কাঁচা পেয়ারা, পাকা পেয়ারা—যে পেয়ারা পায় (সকলের উচ্চহাস্য)।

উপরের ফলও খায় আবার নিচের ফলও খায়। 'True to the kindred points of heaven and earth'—ওদিকে (ঈশ্বরে) যেমন দৃষ্টি আছে তেমনি এ দিকেও (সংসারেও) দৃষ্টি আছে।

ডাক্তার বক্সী, বিনয় ও ছোট অমূল্যের প্রবেশ।

শ্রীম (ছোট অমূল্যর প্রতি)—আপনি এঁদের সঙ্গে এক গাড়ীতে এলেন এখন ?

ছোট অমূল্য—আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীম—তখন দেখা হয়েছিল ? কয় মূর্তি ?

ছোট অমূল্য—সাত মূর্তি।

শ্রীম—দেখলেন, এমনি ছুতা করেই সাধু দর্শন করতে হয়। মনোরঞ্জন গিছলেন ?

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—মটকোকে (শ্রীমর জ্যেষ্ঠ পৌত্র অরুণকে) হারমোনিয়ামটা নিয়ে আসতে বলুন। ও গানটা (পেয়ারা খায়) সে জানে।

অন্তেবাসী মটকোকে সংবাদ দিয়া আসিলেন।

বড় সুধীরের প্রবেশ। ইনি মর্টন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। ইদানীং তাঁহার মাথাটা একটু বিগড়াইয়া গিয়াছে।

শ্রীম (সুধীরের প্রতি)—খেতে দেয় তো দু'বেলা ? আর স্নান করো দু'বেলা। এ সব শিবের অনুচর।

শ্রীম (স্বগত)—পাগল বলে। নিজেরা কি তার নাই ঠিক।

কাম ক্রোধ লোভে একেবারে বদ্ধ উন্মাদ। আবার অপরকে বলা পাগল। কি আশ্চর্য!

মটকো প্রবেশ করিল। হারমোনিয়াম দিয়া সে গাহিতেছে—ঠাকুরদাদা পেয়ারা খায়। কাঁচা পেয়ারা, পাকা পেয়ারা, যে পেয়ারা পায় (সকলের উচ্চ হাস্য)। গানের স্বরও চড়িতেছে ভক্তদের হাস্যরসের লহরীও ক্রমশঃ উদ্দাম হইতেছে। গান শেষ হইল। কিন্তু সকলেই এখন হাস্যরসে বিহ্বল।

শ্রীম (মটকোর প্রতি)—আচ্ছা, ও গানটাও গাও (জগবন্ধুর প্রতি) মিহিজামে যেটা আমরা শিখেছিলাম।

জগবন্ধু—ও-ও! 'বিকল্প বিহীন'—ঠাকুরের গান।

মটকো গাহিতেছে—'বিকল্পবিহীন সমাধি মগন ব্রহ্মে চিরলীন আসন তোমার।'

পাকা যাদুকর শ্রীম। ভক্তগণকে কলে হাসান, কলে কাঁদান, কলে করেন ধ্যানমগন!

মর্টন স্কুল, কলিকাতা, ২৯শে জুলাই, ১৯২৪ খ্রীঃ
১৩ই শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল, মঙ্গলবার। কৃষ্ণা ত্রয়োদশী ৪২।৩৩ পল।

একাদশ অধ্যায়

অবতারে ঈশ্বর পেলে কি লাভ ঘুরে মরে

মর্টন স্কুল। কলিকাতা। এখন বেলা সাড়ে এগারটা। শ্রীম চারতলার নিজের ঘরের বিছানায় শুইয়া আছেন। শরীর অসুস্থ। আজকাল 'কথামৃত' ছাপা হইতেছে—দুইটা প্রেসে। অন্তেবাসীর উপর ভার থাকিলেও তিনি সব বলিয়া দিতেছেন। তিনি অন্তেবাসীকে কহিলেন, 'একবার বালকৃষ্ণ প্রেসে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি গেলি প্রুফ পাঠাতে বলতে হবে। তাড়া না দিলে দেরী হয়ে যাবে।

সর্বদা তাড়া দেওয়া উচিত'। আজ সারাদিনই বিছানায় শুইয়া কাটাইতেছেন। ভক্তরা কেহ কেহ আসিয়া দেখিয়া যাইতেছেন। কথাবার্তা বিশেষ কিছু হয় নাই।

আজ ৩০শে জুলাই, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার। চতুর্দশী ৪৬।২৮ পল।

অপরাহ্ণ পাঁচটা। শ্রীম এক একবার সিঁড়ির ঘরে আসিয়া বসিতেছেন। ভক্তরা অনেকেই আসিয়া বসিয়া আছেন। দুই চারিটা কথা কহিয়া আবার নিজের ঘরে প্রবেশ করিতেছেন। অন্তেবাসীকে বিকালে বাণী প্রেসে পাঠাইলেন। সেখানেও 'কথামৃত' ছাপা হইতেছে।

সন্ধ্যা হইয়াছে। শ্রীম অল্পক্ষণ ধ্যান করিতেছেন। ভক্তরাও ধ্যান করিতেছেন। এইবার 'কথামৃত' পাঠ করিতে বলিলেন। শরীর অসুস্থ ও ক্লান্ত থাকিলে বেশীর ভাগ সময়ই তিনি শাস্ত্রাদি পাঠ করিতে বলেন।

শ্রীমর নির্দেশে জগবন্ধু 'কথামৃত' প্রথম ভাগ চতুর্দশ খণ্ড পাঠ করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম মন্দিরে ও গিরিশ ভবনে শুভাগমন করিয়াছেন। গিরিশ সমস্ত ভক্তমণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে লইয়া আসিয়াছেন। রাম ও মহিমা চক্রবর্তীও আসিয়াছেন।

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দ, ২৪শে এপ্রিল, শুক্রবার। ঠাকুরের গলায় অসুখের সূত্রপাত হইয়াছে।

গিরিশ-ভবনে আজ আনন্দোৎসব। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ভক্তগণসহ আসিয়াছেন। তিনি দেখিতে চান, 'ইংলিশম্যানরা' কিরূপ বিচার করে। তাই মহিমা ও গিরিশ বিচার করিতেছেন। মহিমার জ্ঞানীদের মত—গিরিশ ভক্ত।

মহিমা—সাধনা করলে সকলেই শ্রীকৃষ্ণ হতে পারে।

গিরিশ—তা হয় না। শ্রীকৃষ্ণই কেবল শ্রীকৃষ্ণ হতে পারেন। যদি কোন ব্যক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের সব গুণ দেখা যায়, তা হলে বলতে হবে, এই ব্যক্তিই শ্রীকৃষ্ণ। জীব শ্রীকৃষ্ণ হতে পারে না।

শ্রীম—মহিমাচরণ চক্রবর্তী অবতার মানেন না। আবার

নরেন্দ্রও মানেন না। তাই ঠাকুর এই বিচার আরম্ভ করিয়েছেন। পরে নিজেই সিদ্ধান্ত বলছেন। ঠাকুর বলছেন, জীব সাধনার দ্বারা হৃদ্ধ সমাধি লাভ করতে পারে। কিন্তু নিচে আসতে পারে না। যদি কেউ সমাধির পর নিচে আসে, তবে বুঝতে হবে ভগবানের ইচ্ছায় নিচে এসেছে। তাকে দিয়ে লোকশিক্ষা দেবেন। কিন্তু অবতার সমাধিতে বিলীন হতেও পারেন, আবার নিচেও এসে লোকশিক্ষা দেন। যেমন রাজার মন্ত্রী—সে রাজার সঙ্গে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত যেতে পারে, কিন্তু রাজপুত্র সর্বত্র যেতে পারে—অন্দর মহল, বাহির মহল—সর্বত্র। জীব আর অবতারে এই প্রভেদ।

শ্রীম (সহাস্যে)—মহিমাচরণের ধারণা, সমাধি লাভের পর কেউ সংসারের কাজ করতে পারে না। ঠাকুরের সম্বন্ধে বলতেন, এঁর আগে উচ্চাবস্থা ছিল। এখন নেমে গেছেন (সকলের উচ্চ হাস্য)। ভক্তদের সঙ্গে বিলাস দেখে ঐ কথা বলতেন। তাই ঠাকুর নজীর দিচ্ছেন—নারদ, শুকদেব, শংকর, রামানুজ, প্রহ্লাদ, হনুমান—এঁরা সকলেই সমাধির পর কাজ করেছেন। ঋষিরাও এইরূপ সমাধির পর কাজ করেছেন—ব্যাস, বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য, জনক।

অবতার তো ঈশ্বর, তিনি তো নেমে এসে কাজ করতে পারেনই। অপর জীবও যদি সমাধির পর কাজ করেন, তা লোকশিক্ষার জন্য করেন ঈশ্বরের ইচ্ছায়। অবতার করেন স্বেচ্ছায়।

(সহাস্যে) মহিমাচরণ বলতেন, এখন নরেন্দ্রের যে অবস্থা, বার বৎসর পূর্বে আমার সে অবস্থা ছিল। এই নরেন্দ্রকে নিয়ে কেন পরমহংসদেব এত নাচানাচি করেন? (সকলের হাস্য)। মহিমা চক্রবর্তী আজ খুব নরম হয়ে গেছেন—গিরিশবাবুর সঙ্গে তর্কে। তাই সব মেনে নিচ্ছেন।

কি সুন্দর দৃষ্টান্ত! মধ্যাহ্ন-সূর্যে দাঁড়ালে মানুষের ছায়া থাকে না। তেমনি সমাধির পর অহংকার থাকে না। দৈবী দৃষ্টান্ত।

মহিমাচরণের অভিমান বেদান্তচর্চা করেন বলে। ঠাকুর তা-ও ছিন্ন করছেন। বই পড়া জ্ঞান আর সমাধির জ্ঞান সম্পূর্ণ পৃথক,

সম্পূর্ণ ভিন্ন। সমাধি না হলে অহংকার যায় না। তাই ঠাকুর বলেছেন, জীব-কোটিকে দাসীবৎ সংসারে থাকতে। হনুমান সমাধির পর দাস-ভাবে ছিলেন। ঠাকুরের ভক্তরাও কেহ কেহ দাস-ভাবে, সন্তান-ভাবে ছিলেন। একটা সাধকের অবস্থা, আর একটা সিদ্ধাবস্থা।

আজ ঠাকুর কেমন সুন্দর করে অন্তরঙ্গদের পরিচয় দিলেন। বলছেন, অন্তরঙ্গ যেন নাটমন্দিরের ভিতরের পিলার। যারা সর্বদা নিকটে থাকে, সুখ-দুঃখের ভাগী হয়। বহিরঙ্গ যেমন বাহিরের পিলার। যারা কখনও এসে একবার দেখে যায়। ঠাকুরের এই দৃষ্টান্তটি একটি দিক্‌দর্শন, অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ নির্বাচনে।

শ্রীম মাঝে মাঝে পাঠ শুনিতেছেন নীরবে। কখনও আবার ব্যাখ্যা করিতেছেন। পাঠ হইল। শ্রীম কিছুক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন, পুনরায় ভাষ্য করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ভগবানের পিছে পিছে ভক্তগণ যায়। আবার কখনও, ভগবানও ভক্তগণের পিছে পিছে যান। দেখ না, দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে ঠাকুর কেমন কলকাতা আসছেন ছুটে ছুটে।

ভক্তরা যেতে পারেন না, অনেকের কাজ আছে। আবার কাজ না থাকলেও অন্য অসুবিধা। কেউ হয়তো ছোকরা, পয়সা নাই। আবার বাড়ীর ভয়, মারধর করবে।

যাদের এসব বালাই নাই, তারাও যেতে চায় না, মন অন্য বিষয়ে রয়েছে। তিনি অন্তর্যামী, এ সবই জানেন। তাই তাদের help (সাহায্য) করতে ছুটে ছুটে আসেন।

তা করবেন না তো কি? এ যে তাঁরই কাজ। পিতামাতা করবে না তো কে করবে?

মানুষ আমরা অজ্ঞান কতদূর দেখতে পাই! তিনি সব দেখতে পান—অন্তর্যামী। ভক্তদের মনের আকর্ষণ বিকর্ষণ—দোটানার ভাব দেখতে পেয়ে তাদের টেনে তুলে নিতে আসেন। আজের আসার কারণও তাই।

গিরিশ ঘোষ সবে আনাগোনা করছেন। কোথায়—বহু নিচে নেমে গিছলেন। তাই তাঁকে কোলে তুলে নিতে এসেছেন। আজের আসার প্রধান উদ্দেশ্যই হলো গিরিশকে কৃপা করা।

তিনি বলেছিলেন কিনা, দুই একদিন আসা যাওয়ার পর, তুমি পূর্ণব্রহ্ম ভগবান। অবতার। আমায় উদ্ধার করতে এসেছ। ভিতরের এই ভাবটিকে আরও পোষ্টাই করবার জন্যে আজকার আগমন।

গিরিশ দণ্ডের মত ভূমিতে পড়ে অভ্যর্থনা করলেন। অত বড় অহংকারী লোক, কি করছেন আজ! কি আশ্চর্য! করবেন না? কত পেয়েছেন—অনন্ত শান্তি, অনন্ত আনন্দ, অনন্ত ঐশ্বর্য যে লাভ করেছেন বিনামূল্যে! অমূল্য ধন ভগবান-দর্শন লাভ করেছেন। সে আবার চোখ বুঁজে কেবল সমাধিতে নয়। এই চর্মচক্ষে ঠাকুরের মানুষ-শরীরের মধ্যে—অবতারে সাক্ষাৎ ভগবান দর্শন করেছেন। যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বাক্যমনের অতীত, যিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেছেন নিমেষে, তাঁকে আজ নিজ ভবনে এনেছেন, নিজ হাতে খাওয়াচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে আনন্দ করছেন। তাই ভক্তিতে গদগদ হয়ে, ভালবাসায় ডুবে, কৃতজ্ঞতায় আত্মহারা হয়ে ঠাকুরের পায়ে লুটিয়ে পড়েছেন। কি দুর্লভ দৃশ্য, ভরসার কি মূর্তি পরিগ্রহ! আজ মর্ত্যে বৈকুণ্ঠের অবতরণ।

শ্রীম (যুবকের প্রতি)—শুধু কি তাই? আবার ঢিল দিয়ে ঢিল ভাঙ্গছেন যে! নরেন্দ্রের অবতারে বিশ্বাস নাই, অখণ্ডের ঘরের লোক। গিরিশকে দিয়ে নরেন্দ্রকে শিক্ষা দিচ্ছেন! নরেন্দ্র যে জগতের সামনে প্রচার করবেন ঠাকুরকে, পরে। তাই তো গিরিশকে দিয়ে অবতারতত্ত্বের কথা উত্থাপন করালেন। কেমন নিজের পরিচয় নিজে দিচ্ছেন—অবতার যেন গরুর বাঁট। তা দিয়ে দুধ আসে। তাই এটার বিশেষ দরকার। বাঁট থেকে দুধ আসে, মানে অবতারের ভিতর দিয়ে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য প্রকাশ হয়। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য—জ্ঞান ভক্তি, বিবেক বৈরাগ্য, শান্তি সুখ, প্রেম সমাধি।

শরীরধারী মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ অবতার। তার ভিতর দিয়ে জ্ঞান ভক্তি, প্রেমের বন্যা আসে জগতের ভক্তদের জন্য।

তাই বলেছেন, অনন্ত ঈশ্বর, অখণ্ড সচ্চিদানন্দে ডুবে যাওয়াও যা আর তাঁকে সর্বভূতে দেখাও তা। ফল একই। আবার তাঁকে একটি মানুষে দেখাও তাই। তাই তো বললেন, অবতারকে দেখাও যা, ঈশ্বরকে দেখাও তা। অবতারকে দেখলেই ঈশ্বরকে দেখা হল। ক্রাইস্টও তাই বলেছিলেন, I and my Father are one—আমি আর আমার পিতা ঈশ্বর, এক। ভাগবতেও এই একই কথা বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ। 'অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ'—গীতার কথা। The greatest manifestation of Jnan Bhakti Prem in the world is only through the Avatar—একমাত্র অবতারের ভিতর দিয়েই জ্ঞান ভক্তি প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ হয় জগতে। ঠাকুর নিজে বলেছেন, আমি সেই অবতার।

একস্থানে পেলে প্রাপ্য বস্তু, কে যায় ঘুরে মরতে? যুক্তিও দেখ কি অকাট্য! গঙ্গা বা সাগর এক স্থানে ছুঁলেই ছোঁয়া হলো। কে যায় সমস্ত গঙ্গা ছুঁতে গোমুখী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত? কিংবা কে যায় ছুঁতে সারা দুনিয়ার সাগর? পুরীর সমুদ্র ছুঁলেই অনন্ত সাগর ছোঁয়া হলো।

ঈশ্বর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপে রয়েছেন। আবার তিনি 'অবাঙ্মনস গোচরম্'। তাঁকে যদি অবতারে পাওয়া গেল, তবে কি দরকার ব্রহ্মাণ্ডময় ঘুরবার?

ডাক্তার ও বিনয় প্রভৃতির প্রবেশ।

শ্রীম—হাঁ বিনয়বাবু, সেদিনের উৎসবের ফর্দটা এনেছ?

বিনয়—আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীম—তা হলে পড়ে শুনাও। একটা ফর্দ করা থাকলে ভাল। এতে অন্য বছরের ফর্দ করার সুবিধা হয়।

বিনয় পড়িতেছেন, আর শ্রীম স্থানে স্থানে মন্তব্য প্রকাশ

করিতেছেন। ভক্তদের বলিলেন, আপনারাও শুনুন, ফর্দ পাঠ হচ্ছে। আপনাদের কিছু বলবার থাকলে বলবেন।

(জনৈক সন্দিগ্ধ যুবক ভক্তের প্রতি)—আচ্ছা, চৈতন্যদেবের সময়ের কোনও পূজার একটি ফর্দ যদি পাওয়া যেতো, তা হলে হাঁ করে সকলে তা দেখতো কিনা বলুন। তা হলে এতে কেন (আশ্চর্য বোধ) হবে?

বিগত ২১শে জুলাই সোমবার কাশীপুরে ডাক্তার কার্তিক বক্সীর বাড়ীতে, নাগপঞ্চমী তিথিতে শ্রীমর প্রথম জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। শ্রীম ছাড়া স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী সুবোধানন্দ ঐ উৎসবে যোগদান করেন। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সন্তান ছাড়াও মঠের অনেক প্রাচীন সাধু ঐ উৎসবে যোগদান করেন। স্বামী ধীরানন্দ, শান্তানন্দ, ধর্মানন্দ, জ্ঞান মহারাজ, ওঙ্কারানন্দ প্রভৃতি আরও অনেক সাধু আসিয়া প্রসাদ পাইয়াছিলেন। মঠের সাধুগণই ষোড়শোপচারে পূজা ও হোম করেন। স্কুল বাড়ীর ভক্তগণও সকলে উপস্থিত ছিলেন। সেই উৎসবের ফর্দ পাঠ হইতেছে।

শ্রীম (ডাক্তার বক্সীর প্রতি)—আম অত না আনাই ভাল ছিল, এখন যখন আম খারাপ। এক এক slice (চাকলা) করে দিলেই হতো। রাবড়ী, ও সব জিনিস বেশী দিতে নাই। এক টাকার এনে ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে সকলকে একটু একটু করে দেওয়া প্রসাদ। আম গোটা আষ্টেক ঠাকুরকে দিলে হয়।

আর তরকারী কর না। আলুবকরার চাটনী করতে হয়। রসগোল্লা, সন্দেশ বেছে বেছে কর। দই কর খুব। দই খেলে অসুখ করবে না। অর্থাৎ এমন সব আয়োজন করতে হয় যাতে লোকের অসুখ না করে।

আর আগে একটা কাউন্‌সিল করতে হয় সকলে মিলে। তারপর experienced (অভিজ্ঞ) যারা তাদের দ্বারা verify (পরীক্ষা) করিয়ে নিতে হয়। তা না হলে waste (অপচয়) হয়। ঠাকুর তাই বলতেন, লক্ষ্মীছাড়া থেকে কৃপণ ভাল।

মোহন (স্বগত)—কি আশ্চর্য চরিত্র অবতারের পার্ষদদের! এঁরাই যথার্থ আচার্য। এঁরা শিখেছেন সাক্ষাৎ নররূপী ভগবানের কাছে। ঠাকুর বলতেন, ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন? তাই সর্ব বিষয়ে এঁদের দৃষ্টি। কর্মী হবে পটু, আর কর্মটি হবে নিখুঁত। ঠাকুর বলতেন, যে নূনের হিসাব করতে পারে সে মিছরীর হিসাবও করতে পারে। যে বৈষয়িক বিষয়ে দক্ষ, সে ঈশ্বরীয় বিষয়েও দক্ষ হতে পারে। ভক্তরা এসেছেন ধর্মকথা শুনতে, শ্রীম শুনাচ্ছেন লোক ব্যবহারের কথা। কারণ মন যদি বাহ্য বিষয়ে পটু ও একাগ্র হয় তবে ঈশ্বরের বিষয়েও ঐরূপ হতে পারে, মোড় ফিরিয়ে দিলেই হলো, ঠাকুর বলতেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—একজনকে (শ্রীমকে) ঠাকুর জিজ্ঞাসা করছেন, একটা টুলের দাম কত হবে? ভক্ত বললেন, দেড় টাকা হবে হয়তো। ঠাকুর উত্তর করলেন, একটা জল চৌকির দাম যদি ছ' আনা হয়, তো টুলের দাম এত হবে কেন? দেখ, কেমন sense of proportion (তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি)—অবতার পুরুষ যিনি তাঁর। অন্যের তা হবে?

আমরা তো মূর্খ—এ তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির অভাব আমাদের। তাই ঠাকুর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। যাঁর এইরূপ চৌকশ বিচারবুদ্ধি তাঁর কাছেই ভগবান আপনাকে revealed (প্রকট) করেন।

একজনকে পান আনতে পাঠালেন আলমবাজার। সে সাতটা পান আনলে এক পয়সায়। আবার একজন কর্মচারী বললে, আমি দশটা এনেছি এক পয়সায়। অমনি তিরস্কার করে বললেন, যা শালা ফিরিয়ে দিয়ে আয় গিয়ে। তোর যদি অত পানের দরকার না হয়, অন্যকে বিলিয়ে দে—কিন্তু ঠকবি কেন? যে এ জিনিসে ঠকে যায় সে মহামায়ার ভেলকীতেও ঠকে যাবে। মন তো একটাই। এই মনে ভগবান লাভ হয় না। তাকে ভাল জিনিস দিলেও সে তা রক্ষা করতে পারবে না। সে ঈশ্বরীয় জিনিসও রক্ষা করতে পারবে না, দিলেও।

শ্রীম কিছুক্ষণ কি ভাবিতেছেন, তাঁহার মন অতীতে নিবদ্ধ। পুনরায় কথা।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—ছেলেবেলায় ক্ষেত্র ডাক্তারের বাড়ী খেতে গেছি, মায়ের সঙ্গে। বছর চার বয়েস। ভাল দই, ফার্স্ট ক্লাস সন্দেশ। আবার চিনির মুড়কী—গোলাপী গন্ধ ছাড়ছে। আহা, সন্দেশের সুগন্ধ যেন এখনও মুখে লেগে রয়েছে (হাস্য)।

কাটারী নেই তবুও ডাব নেওয়া হচ্ছে। আগে কাটারী এনে তবে ডাব নিতে হয়।

শ্রীম-জন্মোৎসবে দ্রব্যাদির অপচয় হইয়াছে। প্রথমে চাই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তারপর অভিজ্ঞতা, তারপর সুপরামর্শ। তবে কার্য সুসম্পন্ন হয়। গত উৎসবে ইহার অভাব হইয়াছে। তাই কি বলিতেছেন, কাটারী চাই আগে, অর্থাৎ বিজ্ঞ অভিজ্ঞতা, তারপর ডাব কেনা অর্থাৎ উৎসব?

শ্রীমর নিকট কর্ম আর ধর্ম পৃথক নহে—এক। কর্ম সুচিন্তিত সুপরিকল্পিত হইলেই চিত্তশুদ্ধি হয়। তাহাতেই জ্ঞান প্রাপ্তি, তদ্দ্বারা মোক্ষলাভ। নচেৎ কর্ম বন্ধন।

পরের দিন। সন্ধ্যা। মর্টন স্কুলের সিঁড়ির ঘর। শ্রীম গায়ে গরম কাপড় পরিয়া বসিয়া আছেন চেয়ারে উত্তরাস্য। বাহিরে দুর্যোগ, প্রবল বারিপাত হইতেছে। তিনি অসুস্থ। পিঠের নিউরালজিক্ ব্যথা বাড়িয়াছে। তবুও ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন।

ঈশ্বরীয় কথা কহিলে বা শ্রবণ করিলে ব্যথা ভুল হইয়া যায়। যেমন ধ্যানের সময় মন উপরে ঈশ্বরে লগ্ন হইলে আনন্দে থাকে, তেমনি ঈশ্বরীয় কথামৃতবর্ষণ-নিরত লোকের মনও ধ্যেয় ঈশ্বরে নিমগ্ন হয়। তাহাতে দেহজ্ঞান কম পড়িয়া যায়। তাই আনন্দ। ঈশ্বরীয় কথার মাদকতা আছে। মদ সেবনে যেমন লোক সংসারজ্বালা ভুলিয়া যায়, তেমনি ভাগবত মাদকতা। তাঁহার কথা 'তপ্ত জীবনং'।

অসুস্থ হইলে শ্রীম সর্বদা কথামৃত বর্ষণ করেন। বিছানায় শয্যাগত থাকিলেও সাধু, ভক্তগণকে নিজের শয্যায় বসাইয়া

ঈশ্বরীয় কথা কহেন। একবার জ্বর হয়। ডাক্তারগণ কথা বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না একমাস ধরিয়া। তখন ডাক্তার সত্যশরণ চক্রবর্তীকে ডাকান হয়। তিনি ভক্ত লোক, দেখিয়াই বলিলেন, এঁকে কথা কইতে দাও। এঁর যা ভাল লাগে তাই করতে দাও। ঠাকুরের কথামৃতবর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন শ্রীম—আর জ্বরও সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িয়া যায়।

এ-ও পথ—সংকীর্তন যোগ, কথামৃতবর্ষণ যোগ।

শ্রীম আজ একটু অধিক অসুস্থ। তাই সন্ধ্যার ধ্যানের পর কথামৃত পাঠ করিতে বলিলেন। প্রথম ভাগ। অষ্টম খণ্ড। সিন্দুরিয়া-পট্টিতে ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগেও ভক্তগণ আসিয়াছেন। ডাক্তার, বিনয়, ছোট নলিনী, ছোট অমূল্য, বলাই, ছোট জিতেন, মনোরঞ্জন, ভৌমিক, সুখেন্দু, জগবন্ধু প্রভৃতি শ্রীমর কাছে বসিয়া আছেন। কথামৃত পাঠ হইতেছে। ছোট অমূল্য পড়িতেছেন।

পাঠক পড়িতেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'মনরূপ দুধ থেকে জ্ঞান-ভক্তিরূপ মাখন (তোলা হলে)······সে মাখন কখনও সংসার-জলের সঙ্গে মিশে যাবে না।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ব্রাহ্মরা অনেকে ভাল লোক ছিলেন—ভক্ত। তাই তো ঠাকুর ছুটে ছুটে যেতেন। কিন্তু কেউ বড় একটা তপস্যা করতে যেতো না ঘর ছেড়ে। তাই তাদের ঐ কথা শোনাতে গেলেন—মাখন তুলে সংসারে থাক।

তিনি তো সকলের ভালটা দেখছেন কিনা—কিসে পরম কল্যাণ হয়। অনেক আয়োজন আছে এদের। মাল ভাল, কিন্তু সাধনের অভাবে সব অন্যরূপ হয়ে যায়। তাদের দেখলে তাই সাধন করতে বলতেন। আর একটি গান গেয়ে শোনাতেন—'ডুব ডুব ডুব রূপ-সায়রে আমার মন।'

বিজয় গোস্বামী গয়াতে তপস্যা করে নূতন লোক হয়ে এসেছেন। তাঁকে দেখে কত আনন্দ ঠাকুরের। বিজয়বাবু চিনেছিলেন ঠাকুরকে।

বলেছিলেন, ঘুরে ফিরে দেখলাম—কোথাও দুই আনা কোথাও চার আনা। কিন্তু এখানে দেখছি ষোল আনা।

নির্জনে তপস্যা না করলে differenceটা (প্রভেদটা) বোঝা যায় না—কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, আর যেতে হবে কোথায়।

আর সাধন ভজন, সত্যকে আশ্রয় না করলে, হয় না—এই কথা বলেছিলেন। আর বলেছিলেন, এখন কলিকাল। সত্যকে ধরে থাকলে ভগবান লাভ হয়।

বাইরে তো লোক তাঁকে দেখতে পারে না। কিন্তু সত্যকে ধরে থাকলে তাঁকে দেখতে পাবে—এই কথাটি বলতে গিছলেন ব্রাহ্ম সমাজে।

সংসারে থাকতে গিয়ে এই সত্য ভুলে যায় লোক। তাই বলছেন, সব মাকে দিয়ে দিলুম। কিন্তু সত্য দিতে পারি নাই। সত্য মিথ্যার ভেদ না রাখলে শরীর থাকে না। তাই মিথ্যার ভিতর সত্যকে আশ্রয় করেছিলেন বাইরে। ভিতরে তো সত্য-স্বরূপ মা সর্বদা রয়েছেন।

সংসারীদের এই আর একটি কল্যাণকর পথ দেখিয়ে গেলেন। ধর্মের অত শত নিয়ম যদি কেউ পালন না করতে পারে—কিন্তু সত্যকে যদি ধরে থাকে, তবে তাতেই ভগবান দর্শন হবে। বলেছিলেন, সত্য যেন শিকল। শিকল ধরে ধরে গেলে কাঠ পাওয়া যাবে। কাঠ রয়েছে জলের নিচে ডুবে। তার সঙ্গে বাঁধা রয়েছে শিকল। কাঠ মানে ঈশ্বর।

কথায় বলে, শুধু কথায় চিড়ে ভেজে না। তেমনি কেবল মুখে বললে কি হবে—বেদে এই বলেছেন, অমুক এই বলেছেন। সেইগুলি নিজের ভিতর জমাট করতে হবে, সেই ভাবনাগুলি ধরে রাখতে হবে হৃদয় মনে, সংসারের শোক তাপে, দুঃখ দৈন্যে সেই সৎ ভাবগুলির প্রকাশ চাই নিজ জীবনে। মুখে বলা বড় বড় কথা, কিন্তু কাজের বেলায় যেই সেই। টিয়া 'রাধাকৃষ্ণ' বলছে। কিন্তু যেই বিড়ালে ধরলো অমনি টঁ্যা টঁ্যা। এতে কি করে হবে? বাজনার বোল হাতে আনতে হবে।

কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের লোক ঠাকুরকে ভালবেসেছিল। যে কোন ভাব নিয়ে ভালবাসুক তাদের নিশ্চয় মঙ্গল হবে। তিনিই বলতেন, লঙ্কা না জেনে খেলেও ঝাল। তারা জানে না তাঁকে, ঈশ্বর— অবতার। তা হোক। তিনি তো জানতেন, তারা ভালবেসেছে। কল্যাণ অনিবার্য।

কলিকাতা, ৩১শে জুলাই, ১৯২৪ খ্রীঃ
বৃহস্পতিবার। অমাবস্যা ৪৯।২৪ পল।

দ্বাদশ অধ্যায়

'ভাগবতের পণ্ডিত' শ্রীম

মর্টন স্কুল। পঞ্চাশ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীট। কলিকাতা। শ্রীম চারতলার ঘরে বাস করিতেছেন। তাই নিত্য বহু ভক্ত ও সাধুর সমাগম হয় এখানে। আর কথামৃত বর্ষণ ও জ্ঞান ভক্তি প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হয় প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া। ভক্তগণ নিত্য আসেন মৌতাতের লোভে। অনেকেই নানা কাজকর্ম করেন। পরিশ্রান্ত ও ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও ভক্তগণ নিত্য এখানে আসেন কথামৃতবর্ষণে স্নান করিতে। গঙ্গাসলিলে স্নান করিলে যেমন শরীরের ময়লা দূর হয়, তেমনি 'গৌর জলধর' শ্রীমর 'কথামৃত' বর্ষণে মনের ময়লা বিদূরিত হয়। ভক্ত অলিকুল আসেন শান্তিসুখ মকরন্দ লোভে। করুণাময় শ্রীম নিজের দেহের সকল যাতনা অগ্রাহ্য করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-মকরন্দ প্রদানে দিবানিশি তৎপর।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ 'ভাগবতের পণ্ডিত' শ্রীমকে 'চাপরাশ' দিয়া ঘরে রাখিয়াছেন সংসারতপ্ত জনগণকে, 'ভাগবত' শুনাইতে। জগদম্বার নিকট চাহিয়া 'এক কলা' শক্তি দেওয়াইয়াছেন লোকশিক্ষার জন্য। শ্রীম গুরুদেবের নিকট সন্ন্যাস প্রার্থনা করিয়াছেন বারংবার। কিন্তু

ঠাকুর তাঁহাকে জগদম্বার অভিপ্রায়ানুসারে গৃহে থাকিয়া আচার্যের কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীম তাই গুরুদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া অতন্দ্রিত হইয়া 'কথামৃত' বর্ষণ করিতেছেন বিগত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া, পাত্রাপাত্র নির্বিচারে।

শ্রীম জনগণের নিকট ঘোষণা করিতেছেন, যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বাক্যমনের অতীত পরমব্রহ্ম, তিনিই ইদানীং নরদেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণরূপে। জনগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা—'আমায় ধর, আমার ধ্যান করলেই হবে, তোদের আর কিছু করতে হবে না। আমি কে আর তোরা কে, এটা জানলেই হবে। মাইরি বলছি যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে।'

আজ কয়েকদিন ধরিয়া শ্রীমর শরীর অসুস্থ, কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। আজ সকালে যন্ত্রণা তীব্র হইলে অন্তেবাসীকে একবার মাত্র বলিয়াছেন, কিসে ভাল হইবে। অন্তেবাসী জোর করিয়া পিঠে একটি ঔষধ মালিশ করিয়া দিয়াছেন। একদিকে দারুণ বেদনা, অপর দিকে সঙ্গে সঙ্গে কথামৃত বর্ষণ। অন্তেবাসী দেখিতেছেন, কথামৃত বর্ষণে শ্রীম দেহযন্ত্রণা ভুলিয়া ব্রহ্মানন্দ-সাগরে নিমগ্ন। নির্বাক শিক্ষা চলিতেছে, 'কথামৃতই তপ্তজীবনের' একমাত্র মহৌষধ।

এখন অপরাহ্ণ পাঁচটা। শ্রীম চারতলার ছাদে বসিয়া আছেন জোড়া বেঞ্চিতে পশ্চিমাস্য। শ্রীমর সম্মুখে অপর জোড়া বেঞ্চির উপর সতরঞ্চ পাতা সাধুগণের জন্য। শ্রীমর দক্ষিণে ও উত্তরে অন্য সব বেঞ্চিতে ভক্তগণ বসা—শান্তি, মনোরঞ্জন, জগবন্ধু প্রভৃতি। ভক্ত অলিকুল মধুলোভে আকৃষ্ট।

দেখিতে দেখিতে একটি বিশিষ্ট মধুকর আসিয়া উপস্থিত হইলেন, স্বামী শান্তানন্দ। ইনি তপস্বী ও মধুরস্বভাব ব্যক্তি। তিনি কখনও বলেন, চল ভাই জগৎ ভুলে আসি। শ্রীমর নিকট পাঁচ মিনিট বসিলেই জগৎ ভুল হয়ে যায়। অজ্ঞাতে আগন্তুকের মনটিকে ধরে নিয়ে গিয়ে ব্রহ্মানন্দ সাগরের উপকূলে ছেড়ে দেন।

শ্রীম শান্তানন্দজীকে অতিশয় স্নেহ করেন। তাই আদর করিয়া তাঁহাকে নিজের পাশে বসিতে বলিলেন। কিন্তু তিনি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধায় শ্রীমর সহিত একাসনে বসিলেন না। সম্মুখের বেঞ্চিতে বসিলেন। ইনি কিছুদিন ধরিয়া নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতেছেন। প্রণাম ও কুশল প্রশ্নাদির পর শ্রীমর ইচ্ছায় তিনি তীর্থ বিষয়ে বর্ণনা করিতেছেন।

স্বামী শান্তানন্দ—কাশ্মীরে অমরনাথ দর্শন করেছিলেন। নীলাভ বরফে এই শিবলিঙ্গ আপনি বাড়ে ও কমে। একটা প্রকাণ্ড গুহায় এই শিবলিঙ্গ। গুহার উপর অমরনাথ শৃঙ্গ চিরতুষারাবৃত। গুহার ভিতর বরফজল টপকায়। তাতেই শিবলিঙ্গ তৈরী হয়। তের হাজার ফুটের ঐ গুহা। উপরের শৃঙ্গটি সতর হাজার ফুট। বরফ নদীর উপর দিয়ে যেতে হয়, খুব ঠাণ্ডা।

ওখানে মন্দির নাই। থাকবার স্থানও নাই। পাঁচ মাইল দূরে পঞ্চতরণীতে তাঁবুতে থাকে। ওটা এগার হাজার ফুট। স্বামীজীও ওখানে গিছলেন। ঐ ঠাণ্ডা নদীর কয়েকটা ধারাতে কৌপীন পরে স্নান করেছিলেন পঞ্চতরণীতে। নিবেদিতা সঙ্গে ছিলেন।

শ্রীনগর থেকে পহেলগাম ষাট মাইল। টংগা বা মোটরে যায়। পায়ে হেঁটেই যায় বেশী লোক। পহেলগাম থেকে অমরনাথ সাতাশ মাইল। রাস্তা বড় দুর্গম। তাই লোকে বলে, অমরনাথ নয় মরণনাথ (হাস্য)। শেষনাগ একটা লেক, জল দুধের রঙ। সুন্দর স্থান। বার হাজার ফুট। মহাগুণপাস এর পর—চৌদ্দ হাজার ফুট।

অমরনাথ কেভে (cave) স্বামীজীর সমাধি হয়েছিল। শিব দর্শন দিয়ে বর দিয়েছিলেন—ইচ্ছামৃত্যু।

শ্রীম—ক্ষীরভবানীও স্বামীজীকে দর্শন দিয়েছিলেন, শোনা যায়। স্বামীজীকে মা বলেছিলেন, বাবা তুমি আমায় রক্ষা কর, কি আমি তোমায় রক্ষা করি। আমার ইচ্ছাতেই ওরা মন্দির ভেঙ্গেছে। স্বামীজীর এই দর্শনের পর খুব পরিবর্তন আসে। কর্মপ্রবৃত্তি কমে

যায়—সর্বদা ভাবস্থ থাকতেন। কাশীপুরে নির্বিকল্প অবস্থার পর ঠাকুর বলেছিলেন, চাবি দেওয়া রইল। মায়ের কাজ কর গিয়ে। ক্ষীরভবানীর এই ঘটনাকে চাবি খুলে দেওয়া বলা যেতে পারে। এইটিন নাইনটিএইটে হয় ঐ ঘটনা। এর পরও দ্বিতীয় বার আমেরিকা যান। ঐ সময় স্বামীজী খুব উচ্চ ভাবাবস্থাতে থাকতেন। এরপর বছর চারেকের ভিতরই শরীর গেল।

শ্রীম—স্বামীজীর চারধাম হয়েছিল কি? তোমার তো হয়েছে?

স্বামী শান্তানন্দ—না স্বামীজীর বদ্রীনারায়ণ হয় নাই। আজ্ঞে, আমার হয়েছে।

শ্রীম—ঠাকুর বলেছিলেন, তিনিই ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তীর্থ, দেবালয়ে সাধু করে রেখেছেন, যারা তাঁকে চায় তাদের জন্য। শঙ্করাচার্য এই চারধাম করেন। এই চারধাম দর্শন হিন্দুদের জীবনের একটা প্রধান ব্রত। ঠাকুরের বাবা পুরী ও রামেশ্বর গিছলেন। ঠাকুর বলতেন, সাধুরা অনেকে তিনধাম করে দ্বারকা রেখে দেয়। তার মানে, দ্বারকার চিন্তা করতে করতে শরীর যাবে। দ্বারকার চিন্তা মানে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা। ভগবানকে নিয়ে কতরকম বিলাস করেন ভক্তগণ।

স্বামী শান্তানন্দ—মায়াবতীর আশ্রম খুব সুন্দর। একান্ত। সাধনভজনের অনুকুল। জ্ঞানী ভক্তদের জন্য স্বামীজী ঐটি করেছেন।

শ্রীম—এবার কাশী যাচ্ছ কি?

স্বামী শান্তানন্দ—আজ্ঞে হাঁ। এবার গিয়ে আবার কিছুকাল স্থির হয়ে বসবার ইচ্ছা।

কাশী গিরির বাগানের কুটীরটিতে এখন অন্য একজন সাধু রয়েছেন। অন্য একটি কুটীর খুঁজে নিতে হবে।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—কাশীর মত স্থান হয় না। ঠাকুর দেখেছিলেন, বিশ্বনাথ মুমূর্ষুদের কর্ণে তারকব্রহ্ম রামনাম শোনাচ্ছেন। আর মা অন্নপূর্ণা মায়াবন্ধন কচ্ কচ্ করে কেটে দিচ্ছেন। কত যুগ-যুগান্তরের তপস্যার অগ্নি জ্বলছে ওখানে। আবার নিত্য ইন্ধন পাচ্ছে

অগণিত ভক্তদের ব্যাকুলতায়। সারা ভারত থেকে লোক সব ছুটে আসছে। তাই তো বলে, তীর্থরাজ কাশী!

শ্রীম—হিমালয়ও খুব উদ্দীপনের স্থান। দেখলেই ঈশ্বরের কথা মনে পড়ে। একে বড় নির্জন স্থান, তাতে আবার মুনি ঋষিগণের তপোভূমি। গীতায় ভগবান বলছেন, 'স্থাবরাণাম্ হিমালয়ঃ'—অচল বস্তুর মধ্যে আমি হিমালয়।

স্বামীজী আমাকে বলেছিলেন, আমার তো ইচ্ছাই ছিল—Himalayan silence-এ (হিমালয়ের গহনে) তাঁর চিন্তা করে দিন কাটিয়ে দেব। কিন্তু কি করবো কে যেন আমায় ঘাড়ে ধরে এ সব করালেন—কাজকর্ম। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে এই কথা বলেছিলেন। আবার আলমোড়ায় বলেছিলেন, হিমালয়ের কথা মনে হলে আমার সব কর্ম-প্রবৃত্তি শান্ত হয়ে যায়। হিমালয় ফিলজফির জন্মভূমি। আহা, কি কথা!

তাঁর ভেতরটা ছিল ব্রহ্মময়। শুকদেবের মত সমাধিমগ্ন হয়ে থাকেন, এটা ছিল তাঁর অন্তরের ইচ্ছা। কিন্তু ঠাকুর তাঁকে কাজে নামালেন। নইলে অবতারলীলা প্রচার হয় কি করে? জগতের কল্যাণই বা হয় কি করে? তাঁর নিজের তো বাকী ছিল না—নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি তিনি সপ্তর্ষির এক ঋষি।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুই কি চাস্। তিনি বলেছিলেন, শুকদেবের মত সমাধিমগ্ন হয়ে থাকতে চাই। তখন ঠাকুর বললেন, না, মা তোকে এর চাইতেও উচ্চ অবস্থা দেবেন। সেটি কি? ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময় দর্শন। তিনি সেটি সদা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকা, আর তাঁকে সর্বভূতে দর্শন করা—একই কথা, বরং আরো উচ্চ অবস্থা।

নরেন্দ্র সমাধিমগ্ন থাকলে এই দুঃখপূর্ণ জগতকে কে শিক্ষা দেবে, যে জীব সেই শিব—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

শোনা যায় শঙ্করাচার্যের ইচ্ছা ছিল, ভারতের বাইরে বেদান্তের এই চূড়ান্ত বাণী শিক্ষা দেন। শঙ্করই স্বামীজীর ভিতর দিয়ে এই

কার্য করালেন। এই সবই একটা grand plan-এর (বিরাট পরিকল্পনার) অঙ্গ। বাইরের লোক দেখছে শঙ্কর আলাদা, স্বামীজী আলাদা। বস্তুতঃ তা নয়—সবই একই বিরাট ইচ্ছার ভিন্ন প্রকাশ।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—Himalayan silence (হিমালয়ের প্রশান্ত ভাব) যেন তাঁকে পেয়ে বসেছিল। বরাবর এই hankering-টি (আকাঙ্ক্ষাটি) তাঁর ভিতর জাগরূক ছিল। মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রমটি তাঁর ঐ বাসনার বহিঃপ্রকাশ।

আমেরিকায় কর্মসমুদ্রে নিমগ্ন থেকেও ভিতরে চলছে—ওঁ তৎসৎ ওঁ। 'সন্ন্যাসীর গীতি' তাঁর অন্তর্নিহিত ব্রাহ্মীস্থিতির বাহ্যরূপ। হিমালয়কে নির্দেশ করেছেন—'where worldly taint could never reach'—'where rolled the stream of kowledge, truth and bliss !'—হিমালয়ের হৃদয়কন্দর সংসার-আবিলতার পরপারে। সেখানে সচ্চিদানন্দ-সাগরে প্রশান্ত লহরী চিরতরঙ্গায়িত—আহা, কি সুগভীর দৃষ্টি, কি মহান অনুভব।

শ্রীম (মোহনের প্রতি)—হিমালয় দেখে উদ্দীপন হয়েছিল তো? ঠাকুর আমায় এই একটি মাত্র কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি তখন দার্জিলিং থেকে সবে ফিরে এসেছি। আমি বললাম, শিলিগুড়ি থেকে হিমালয় দর্শন করে কাঁদতে লাগলাম—এত আনন্দ হয়েছিল। আর মন যেন প্রশান্ত সমুদ্রে গিছলো।

এমনি মহিমা হিমালয়ের—কি প্রশান্ত গম্ভীর ভাব। আমি তখনও এই কথা শুনি নি—'স্থাবরাণাম্ হিমালয়ঃ'।

'দেবতাত্মা' হিমালয়, কালিদাসের 'কুমারসম্ভবে' পড়েছিলাম। কিন্তু এর গভীর অর্থ তখন বুঝতে পারি নি। কিন্তু 'হিমালয় দর্শন করে উদ্দীপন হয়েছিল তো?'—ঠাকুরের এই কথা শুনে, তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হলো। আর তার সঙ্গে মিলিত হল, আমার নিজের শান্তি ও আনন্দের অনুভব। তখন বুঝলাম কেন হিমালয়কে 'দেবতাত্মা' বলা হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে ব্রহ্মানন্দ আর হিমালয় যেন সমানার্থবোধক।

স্বামী শান্তানন্দ—পাহাড়ের উপর উঠেছিলেন কি ?

শ্রীম—ওই জলা পাহাড়ে উঠেছিলাম। পাহাড়ী গাড়ীতে চড়ে অনেকটা গিয়েছিলাম—এক মাইলেরও বেশী।

ঠাকুর কিন্তু হিমালয় দেখেন নি। মা ঠাকরুণ দেখেছিলেন; যখন তিনি হরিদ্বার, ঋষিকেশ, লছমনঝোলায় দর্শন করেন। শশী মহারাজেরও বোধহয় দর্শন হয় নি হিমালয়। পরে তো হয়ই নি। পড়ার সময় হয়েছিল কিনা জানিনা। .না, হয় নি। হরিদ্বারেও যান নি।

সন্ধ্যা হইয়াছে। আলো আসিতেই শ্রীম কথা বন্ধ করিয়া ধ্যান করিতেছেন। ছাদে বসা চেয়ারে, উত্তরাস্য। সামনে ও ডাহিনে বেঞ্চিতে ভক্তগণ বসিয়া আছেন। তাঁহারাও ধ্যান করিতেছেন—বড় জিতেন, শুকলাল, বড় অমূল্য, ভৌমিক, বলাই, অমৃত, ছোট নলিনী, জগবন্ধু প্রভৃতি। কিছুক্ষণ পর আসিলেন ডাক্তার ও বিনয়। কাজের ভিড়ে বড় জিতেন দুই দিন আসিতে পারেন নাই। ইনি হাই কোর্টে বেঞ্চক্লার্ক। ধ্যানান্তে শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—কাজের ভিড় বুঝি খুব।

বড় জিতেন—আজ্ঞে, কাজের ভিড় পড়েছে। একজন জজ, তাই খুব ভিড়। দু' দিন তাই আসতে পারি নি। কাজে কি দেয় ঈশ্বরচিন্তা করতে? খালি ভুলিয়ে দেয়।

শ্রীম (সহাস্যে)—কি ?

বড় জিতেন—কাজে সব ভুলিয়ে দেয়, সব গোল পাকিয়ে যায়।

শ্রীম—তা কি হয় কখন? সব কাজ সমাপ্ত হোক তখন আমি ঈশ্বরচিন্তা করবো। অফিস থেকে এলে, 'কাপড় ছাড়, গরদ পর'—অত সব করলে কি আর হয়? ঐ কাপড় নিয়েই সব করতে হয়।

মুসলমানদের বেশ। তারা পাঁচবার নামাজ পড়ে। সময় হল নামাজের, তা যেখানে আছে সেখানেই আরম্ভ করবে নামাজ। গোলদিঘিতে দেখলুম, বেড়াতে এসেছে। সেখানেই নামাজ পড়ছে।

আবার গাড়োয়ানরা, রাজমিস্ত্রিরা গাড়ী থামিয়ে, কাজ বন্ধ করে নামাজ শুরু করে দেয়। কোর্টেই হোক, কি রেল গাড়ীতেই হোক, সেখানেই সই। বেশ নিয়ম।

তাই তো ঠাকুর মুসলমান হয়েছিলেন। তিনদিন ছিলেন ঐ ভাবে। মহম্মদ করে গেছেন এই নিয়ম—পাঁচবার নামাজ পড়বে। সময় হলেই তাঁকে ডাক সব কাজ ছেড়ে দিয়ে। আবার এমনও আছে 'উজু' করবে, কিন্তু জল নাই। তা বালি দিয়েই (হাত ধোয়ার অভিনয় করিয়া) এমন এমন করে নাও। তাতেই শুদ্ধ হবে।

Human characterএর (মানবচরিত্রের) insight (অন্তর্দৃষ্টি) না থাকলে কি এমন কথা বলতে পারে কেউ? কত বড় insight (অন্তর্দৃষ্টি)। জানেন কি না, সৎকাজের অনেক বাধা। তাই এই সহজ ব্যবস্থা।

একজন ভক্ত—মন খুঁৎ খুঁৎ করে ভাল করে হাত মুখ না ধুলে।

শ্রীম—তা তো করবেই। অভ্যাস হয়ে গেছে যে। অন্তর্বহিঃ শুচির দরকার। কিন্তু যেখানে তার বাধা আছে, সেখানে ঈশ্বর-চিন্তা করবে না লোক? এখন স্নানের চেষ্টায়ই সারাদিন কেটে গেল। তা হলে তাঁর চিন্তা কখন হবে?

যখন যেমন তখন তেমন। যেখানে সব রকম সুবিধা আছে, সেখানে খুব শুদ্ধ হয়ে ভাল ভাবে তাঁর নাম কর। যেখানে তা নাই সেখানে যে অবস্থায় আছ সেই অবস্থায়ই তাঁর নাম কর। উদ্দেশ্য তাঁর নাম করা।

বাইরেটা না হয় অশুদ্ধই রইলো শুদ্ধির বস্তুর অভাবে। ভিতরটা তো শুদ্ধ করে নাও তাঁর নাম করে।

মানুষ এইরূপ উল্টো বিচার করে করে শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কেবল বাইরের শুচিতা নিয়ে ব্যস্ত। আগে ঈশ্বরচিন্তা চাই। বাইরের শুদ্ধি করেই হোক, বা না করেই হোক। উদ্দেশ্য ছেড়ে কেবল উপায়ের পিছনে লেগে থাকা অনুচিত।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—তেমনি কাজ। বেশী কাজ পড়লেও এরই ভিতর ঈশ্বরচিন্তা করে নিতে হয়। তা' না করলে আর হয়ে উঠবে না ঈশ্বরচিন্তা। সারা জীবন কেটে যাবে, কিন্তু তাঁকে ডাকার সময় হয়ে উঠবে না। তাই এই ঝড়ের ভিতরেই তাঁকে ডেকে নিতে হয়। উপাসনার সময় হলে অন্তত: হাত জোড় করে তাঁকে প্রণাম করে নিতে হয়। নয় তো মনে মনে প্রণাম করতে হয়। তারপর যখন বেশী সময় পাওয়া যাবে তখন নিয়ম মত করতে হয় সাধনা।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—ছ'টো ব্যবস্থারই অভ্যাস রাখা চাই। অভ্যাসে সব হয়। দুর্বল যাঁরা তাঁদেরই নানা অজুহাত। তাঁদের জন্য সংসার নয়। যদি অযুত হস্তীর বল হৃদয়ে থাকে তবে সংসার কর। নইলে গাছতলায় দাঁড়াও।

নিষ্ঠা চাই—ভজনে নিষ্ঠা। কাজের ভিড়ে ছেড়ে দিলে হয় না। কামড়ে পড়ে থাকতে হয়। Bulldog tenacity (বুলডগ কুকুরের মত দৃঢ়তা) চাই, স্বামীজী বলতেন।

সংসারের তরঙ্গ তো দিনরাত মনকে ওলট পালট করবেই। যে শত বাধার ভেতরও তাঁকে ধরে থাকে সেই বীর। তারই হবে। তাই তো, বেদ বলছেন—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—দুর্বলের ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।

ঠাকুরের শিক্ষা—যখন যেমন তখন তেমন। যেখানে যেমন সেখানে তেমন। আবার যার সঙ্গে যেমন তার সঙ্গে তেমন।

আহা, কি practical (কাজে পটু) ছিলেন ঠাকুর! এরূপ হলে সংসারে থেকেও মন তাঁতে থাকে। True to the kindred points of heaven and earth.

কলিকাতা। ১লা আগস্ট, ১৯২৪ খ্রী:
১০ই শ্রাবণ ১৩৩১ সাল, শুক্রবার। শুক্লা প্রতিপদ ৫।১৫৮ পল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে কর্মে আঁট হয়

১

মর্টন স্কুল। চারতলার সিঁড়ির ঘর। শ্রীম চেয়ারে বসিয়া আছেন—দক্ষিণাস্য। সকাল সাতটা। শ্রাবণ মাস। কখনও বর্ষা কখনও রোদ। শ্রীমর সম্মুখে বেঞ্চিতে বসা জগবন্ধু।

আজকাল কথামৃত ছাপা চলিতেছে—তৃতীয় ভাগের পুনর্মুদ্রণ। আজ প্রথম ফর্মার গেলি প্রুফ আসিয়াছে। ছাপার ভার অন্তেবাসীর উপর। তাই তাঁহাকে এই বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীম—প্রুফ খুব carefully (সাবধানে) দেখা উচিত। নইলে ভুল থেকে যায়। তাতে পাঠকের বড় অসুবিধা হয়। হয় তো উল্টো অর্থ করে বসবে। আর যিনি দেখবেন তাঁর habit (অভ্যাস) tightened up (দৃঢ়বদ্ধ) হয় না। নিজের চিন্তায় গলদ থেকে যায়।

মন তো একটাই। যে মনে ছাপার ভুল ধরতে পারে না চোখে দেখেও, সেই মন দিয়ে নিজের চিন্তার ভুলও ধরতে পারে না। তাই ঠাকুর বলেছিলেন, যে নুনের হিসাব করতে পারে সে মিছরীর হিসাবও করতে পারে।

ঠাকুর 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রা দেখেছিলেন। যে বিদ্যা সেজেছিল সকালে তাকে নিজের ঘরে ডাকিয়ে নিয়েছিলেন। বললেন, দেখ, যে একটা বিষয়ে পটু—গানবাজনা, পড়াশোনা, কি অন্য কোন কাজে—সে ইচ্ছা করলে ভগবৎ বিষয়েও পটু হতে পারে।

মন তো একটা। মনোযোগও একটাই। এখন সেটাকে যে দিকে চালিয়ে দাও, সেদিকেই যাবে।

ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে, গুরুবাক্যে বিশ্বাস থাকলে সব কাজে

আঁট হয়। কারণ তখন সব কাজ ভগবানের কাজ জেনে করে কিনা। ভগবানের কাজে তো শিথিলতা আসতে পারে না।

যখন কাজে মন বসে না, উড়ো উড়ো ভাব আসে, কাজে, অমনোযোগ হয়, তখন মনে করতে হয়—এ তাঁর কাজ, তাঁর পূজো। তা হলে শ্রদ্ধা ফিরে আসবে, কাজে মন বসবে।

যাঁরা ঈশ্বরলাভের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাঁদের কাজে ত্রুটিবিচ্যুতি কম হয়। প্রথম প্রথম কিছুটা হলেও অভ্যাসের দ্বারা ক্রমশঃ পাকা হয়ে যায়।

এই প্রুফ দেখেও একজন সিদ্ধ হতে পারে, চিত্তশুদ্ধি লাভ করতে পারে। চিত্তশুদ্ধি হয়ে গেলেই কাজ হয়ে গেল। ভক্তদের কাছে যে কাজ উপস্থিত হয়, তারা সে কাজ ঈশ্বরের কাজ জেনে করবে। কাজের ছোট বড় নাই।

হাঁ, কাজ অনুকূল প্রতিকূল হতে পারে। লোক স্বভাবতঃই সংস্কারের অনুকূল কাজ পছন্দ করে। প্রতিকূল কাজে মন যেতে চায় না। কিন্তু ঠিক ঠিক ভক্ত কোন কাজেই উদাসীন হতে পারে না। প্রতিকূল কাজে সময় অধিক লাগতে পারে, কিন্তু অলসতা শৈথিল্য থাকবে না। উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ থাকলে এ সব দোষ দূর হয়ে যায়। অধ্যবসায় ও determinationএর (দৃঢ় সঙ্কল্পতার) দ্বারা সব কাজ সহজ হয়ে যায়।

এখন সকাল নয়টা। শ্রীম ঠাকুরবাড়ীর দিকে চলিয়াছেন, সঙ্গে অন্তেবাসী। একটি কুলি কাগজ লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে যাইতেছে। শ্রীম আসিয়া বেচু চাটার্জী স্ট্রীটে দাঁড়াইলেন গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের মোড়ে। এই লেনেই ঠাকুরবাড়ী। তিনি রাস্তা পার হইয়া এই লেন দিয়া উত্তরের দিকে চলিতেছেন রাস্তার পূর্ব দিক ঘেঁষিয়া। বাম হাতে একটি দৃশ্য দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। দুইটি লোক একটা দশ হাত কাপড় মেলিয়া দিয়া ঠনঠনিয়া কালী বাড়ীর দিক হইতে আসিতেছে। বস্ত্রখানা শুকাইবার জন্য মেলিয়া দিয়া পাশাপাশি চলিতেছে। তাহাদের কপালে চন্দনের ছাপ। তাহারা

গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিতেছে। শ্রীমর সকল দিকে দৃষ্টি। রাস্তায় চলিবার সময় কি যেন দেখেন সকল লোকের ভিতর। সর্বদাই সর্ব বস্তুতে সশ্রদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি।

গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিতেছে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। কারণ তাহারা কারণ-শরীরে আহার দিয়া ফিরিতেছে। তাই তাহারা অপর বহু লোকের অপেক্ষা উত্তম।

কিন্তু তাহাদের সূক্ষ্ম শরীরের দৈন্য ও দুর্বলতা দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছেন। ব্যথিত স্বরে অন্তেবাসীকে বলিলেন, এই দেখুন, কাপড়টা লুটুচ্ছে, রাস্তার কত ধূলো কাদা লাগছে—এদিকে লক্ষ্য নাই। এদের দিয়ে কোনও বড় কাজ বিশ্বাস করা যায় না—অন্যমনস্ক। হয় তো একজন ভালও হতে পারে।

ঠাকুরবাড়ীতে আসিলে শ্রীম কুলিকে এক আনা পয়সা দিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পর অন্তেবাসী বাণী প্রেসে ছাপাইবার কাগজ দিয়া আসিলেন।

অপরাহ্ন চারটা হইতে ছাদে ভক্তসমাগম আরম্ভ হইয়াছে। ভাটপাড়ার ললিত, বসন্ত, ভীম, ভোলানাথ প্রভৃতি শনিবারের ভক্তগণ আসিয়াছেন। তারপর আসিলেন ইটালীর দুইটি ভক্ত আর স্কুল সাব-ইনস্পেক্টার বানার্জী, সনৎ, বড় অমূল্য, শান্তি ও বড় জিতেন। তারপর কামারপুকুরের কেদার।

এখন প্রায় পাঁচটা। কাশীর স্বামী শান্তানন্দ একজন যুবকের সহিত আসিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান মহারাজের আশ্রমের চারজন বিদ্যার্থী আসিলেন।

শ্রীম সকাল হইতেই ঠাকুরবাড়ীতে আছেন। আজকাল ওখানে পরিবারবর্গ। মর্টন স্কুল হইতে আধ মাইল দূর। শ্রীম রোজ সেখানে খাইতে যান—যেন সাধুদের মত ভিক্ষা করিবার ভাবে। নিজের গৃহ, নিজের পরিজন, নিজের অর্থ—কিন্তু তিনি থাকেন অতিথির মত। অথবা বড় ঘরের দাসীর মত, কাহারো উপর কোনও দাবী নাই নিজের শরীর রক্ষার জন্য। চল্লিশ বৎসর পূর্বে, শ্রীম সন্ন্যাস প্রার্থনা করিলে

গুরুদেব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে আদেশ করিয়াছিলেন, তুমি বড় ঘরের দাসীর মত নিজ গৃহে থাক। মা আমাকে বলেছেন, তোমাকে দিয়ে তাঁর একটু কাজ করাবেন। লোককে ভাগবত শোনাতে হবে। শ্রীগুরুর আদেশ শ্রীম বর্ণে বর্ণে পালন করিয়া আসিতেছেন। এখন তিনি সুপরিপক্ক পরিচারিকা!

অন্তেবাসীর অন্যতম কর্ম সাধু ভক্তগণকে আদর আপ্যায়ন করা। তিনি দুই ঘণ্টার উপর ভক্তগণের সহিত ঈশ্বরীয় আলাপনে অতিবাহিত করিয়াছেন। এখন ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে।

শ্রীম ঠাকুরবাড়ী হইতে আসিয়াছেন। সাধু ভক্তগণের সঙ্গে সম্ভাষণাদি করিতে করিতে কেদারকে দেখিতে পাইলেন। অমনি উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া নিজের পাশে বসাইলেন। আনন্দে তাঁহার সহিত মিষ্টালাপ করিতেছেন। হাঁ, ঠাকুরের হাতে লাগান সেই কুল গাছটা আছে তো? আর আম গাছটায় আম হয়? ঠাকুর আম খেয়ে আঁটিটা পুঁতে রেখেছিলেন। সেই আম গাছ। অমুক কেমন আছে? অমুকের বিয়ে হয়ে গেছে তো? তোমাদের (লাহাদের) নাটমন্দিরটি ঠিক আছে তো? এইসব আলোচনায় নিমগ্ন হইলেন। কেদার ৺কামারপুকুরবাসী।

ভক্তগণ নির্বাক হইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছেন। কেহ কেহ ভাবিতেছেন—কেদার বুঝি বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়াছেন। শ্রীম তাঁহাকে দেখিয়া অন্য সব ভুলিয়া গিয়াছেন, বৈকুণ্ঠের কথাই কহিতেছেন। কেদার বৈকুণ্ঠের দেবদূত।

শ্রীম (আনন্দে সাধু ভক্তগণের প্রতি)—আপনারা দর্শন করুন। ইনি সেই Holy Landএর (বৈকুণ্ঠের) অধিবাসী। ভগবান নরকলেবরে সেখানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এই সেদিন। তখনকার ঘাটপাট সবই আছে, বৃক্ষলতা তাঁর দিব্যস্পর্শ বহন করছে। হাওয়া বাতাস তাঁর সৌরভে ভরপুর। পৃথিবী তাঁর চরণরজে মহাতীর্থে পরিণত। সমস্ত কামারপুকুর জ্যোতির্ময়। সমগ্র কামারপুকুর ধরাধামে বৈকুণ্ঠ।

শ্রীম ভাবের আবেগে কিছুকাল নীরব রহিলেন। পুনরায় কথা হইতেছে।

শ্রীম—একবার বিভীষণ ভারতের একটি লোক দেখে আত্মহারা হয়ে গদগদচিত্তে তার পূজা করতে লাগলেন। ঠিক যেন আপন ইষ্টদেব শ্রীরামের পূজা করছেন। আপন ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রের দেশের লোক—যেন সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্র। আহা, কি উচ্চ ভাব!

শ্রীম কেদারের পিঠে সস্নেহে হাত বুলাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ ভাবাবিষ্ট থাকিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তুমি অমন রোগা হয়ে গেছ কেন?

শ্রীম (সকলের প্রতি)—ইনি যখন ছোট ছেলেটি তখন তাঁকে দেখেছিলাম। পাঠশালে পড়তেন। সেবারেই আমার প্রথম যাওয়া হয় কামারপুকুর। ঠাকুর তখন কাশীপুরে—এইটিন-এইটিসিক্স—(১৮৮৬ খ্রীঃ)—শীতের শেষ। তখন সরস্বতী পুজো হচ্ছিল। পাঠশালার ছেলেদের তখন জিলিপি খাওয়ান হয়েছিল—ঐ দেশের বড় জিলিপি—ঠাকুর রহস্য করে বলতেন, লাট সাহেবের গাড়ীর চাকা (হাস্য)। পরে যখন যেতাম, ছেলেরা আমায় দেখলেই বলাবলি করতো, ঐ দেখ ঐ লোক এসেছে, যে আমাদের জিলিপি খাইয়েছিল। ছেলেদের মন কিনা—ঐ বয়সে striking (আকর্ষনীয়) কিছু করলে মনে রাখে। কেদার তখন ওখানে পড়তেন। এখন কত বড় হয়েছেন।

পুনরায় শ্রীম নীরব। পুনরায় কথামৃত বর্ষণ।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—আহা ঠাকুর আমার মনটি তখন এমন করে দিছলেন, সমগ্র কামারপুকুর একটা জ্যোতির আবরণে ঢাকা দেখতাম—বিড়াল, কুকুর, বৃক্ষলতা সব জ্যোতির্ময়। তাই টিপ টিপ করে প্রণাম করতাম। রাস্তায় চলতে চলতে একটা বিড়ালকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম—দেখলাম জ্যোতির্ময়। চিন্ময় রাম চিন্ময় ধাম।

(দৃষ্টি অতীতে নিবদ্ধ করিয়া)—ঠাকুরের সন্তানদের ভিতর আমিই যাই প্রথম কামারপুকুর। তখন তাঁর শরীর রয়েছে। ফিরে

এলে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কি করে গিছলে ডাকাতের দেশে? ঐ লোভে আবার সেখানে যেতে চেয়েছিলাম। ঠাকুর বললেন, আমি ভাল হয়ে নি। তখন একসঙ্গে যাব। আর যাওয়া হয় নি, তাঁর শরীর থাকতে।

২

মনোরঞ্জন, বলাই ও সুখেন্দুর প্রবেশ। এখন সাড়ে ছয়টা। একটু পর আসিলেন উকীল ললিত বানার্জী ও অমৃত গুপ্ত। কিছুক্ষণ পর সন্ধ্যার আলো আসিতেই শ্রীম ধ্যান করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও কেহ ধ্যান করিতেছেন, কেহ চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। প্রায় আটটায় আসিলেন ডাক্তার বিনয় ও ছোট অমূল্য।

বড় জিতেন (শ্রীমর প্রতি)—সনাতন ধর্ম কি, এটা একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি মাত্র কয়েকটা definitions (সংজ্ঞা) দিলেন। কিন্তু বুঝতে পারলাম না। আপনাকেও জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আপনি বলেছিলেন, ঠাকুরই সনাতন ধর্ম। এটাও বুঝতে পারি নি। একটু বুঝিয়ে বললে ভাল হয়।

শ্রীম (একটু চিন্তার পর)—সনাতন ধর্ম, মানে যা চিরকাল থাকে। 'সনা' মানে সদা, 'তন' মানে ভব অর্থাৎ থাকে। 'ধর্ম' মানে যা ধারণ করে রাখে। যে নীতি সমাজকে ধারণ করে রাখে চিরকাল, ইহকালের কল্যাণ ও পরকালে কল্যাণ করে থাকে। বৈদিক নিয়ম, ঋষিদের নীতি, মনু দশটি লক্ষণ দিয়েছেন ধর্মের—সত্য, পবিত্রতা, সংযম, দয়া, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, শম দম আদি। এই বৈদিক নীতিগুলি সমাজকে একসঙ্গে গ্রথিত করে রাখে। বৈদিক ধর্মই সনাতন ধর্ম। বৈদিক ধর্ম কতকগুলি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত—ব্যক্তির উপর নয়। অন্য ধর্ম প্রায়ই কোন ব্যক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈদিক ধর্মের রক্ষক অসংখ্য মহাপুরুষ অবতার মুনি ঋষির আবির্ভাব হয়েছে। তাঁরা সকলেই বৈদিক মূল নীতি সামনে রেখে, সেই নীতিগুলি আচরণ করে ধর্মকে পরিপুষ্ট করেছেন। নীতি প্রথম, ব্যক্তি দ্বিতীয়। সময়ের আবর্তনে সমাজ ভেঙ্গেছে গড়েছে। কিন্তু

ঐ নীতিগুলি সর্বদা জীবিত রয়েছে। ব্যক্তি এসেছে, চলে গেছে কিন্তু এই নীতি সর্বদা আছে।

মানুষ-জীবনের উদ্দেশ্য আত্মদর্শন, ঈশ্বরদর্শন। কেন না এতেই অফুরন্ত শান্তি, অফুরন্ত সুখ, অফুরন্ত আনন্দ লাভ হয়। জীবের কাম্যও এই শান্তি সুখ আনন্দ। এদের মূল কারণ ঈশ্বর, আত্মা। ঋষিরা দেখেছিলেন, ঈশ্বরকে পেতে হলে অনুকূল কতকগুলি নীতিকে ধরে রাখতে হয় জীবনে। এই ধরে রাখার ফলে মানুষের মনে শান্তি সুখ আনন্দ থাকে, সংসারের যে কোন প্রতিকূল অবস্থার ভিতরও। বনবাসের দুঃখেও পাণ্ডবগণ এই নীতি পালন করেছেন। তাই তাঁরা শান্তি সুখ আনন্দে ছিলেন।

ঠাকুর বলেছেন, কলিতে সত্যকে ধরে থাকলেই ঈশ্বরদর্শন হয়। মনুও তাই বলেছেন, সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্। প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াৎ এষ ধর্মঃ সনাতনঃ॥ ইহকাল ও পরকালের সেতুস্বরূপ বৈদিক আচরণ, নীতিগুলিই সনাতন ধর্ম। এই নীতিগুলি একদিকে ভগবানকে ধরে আছে, অপর দিকে সমাজকে ধরে রাখে, ভগবানের দিকে সমাজের দৃষ্টি রক্ষা করে।

একজন ভক্ত—খ্রীস্টান ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, এগুলিও তো ভগবানকে ধরে আছে, আবার সমাজকে ভগবৎমুখীন করে রাখে? তা' হলে এগুলিও সনাতন ধর্ম?

শ্রীম—এগুলিতে ব্যক্তির স্থান প্রথম, নীতির স্থান দ্বিতীয়। ক্রাইস্ট বা মহম্মদকে ছেড়ে দিলে এদের অস্তিত্ব থাকেনা। কিন্তু রাম বা কৃষ্ণকে ছেড়ে দিলেও বৈদিক ধর্মের অস্তিত্ব থাকে।

মোহন—সমাজকে ধরে রাখে নীতি আর নীতিকে ধরে রাখে ভগবান। তা হলে ধর্ম অর্থে ভগবানও হতে পারে। যে ভগবদ্‌ভক্ত, সে-ই নীতিবান, সে-ই সমাজ-সংরক্ষক।

শ্রীম—বেদে তাই বলেছেন ঋষিরা। এই 'অক্ষরে' এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত। তিনি ধরে না থাকলে এই জগৎ বিনষ্ট হবে। 'তস্য প্রকাশনে গার্গী সূর্য চন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ'। 'যং বিজ্ঞতাম

যময়তি।' তাঁকে যারা ধরে থাকে তারাই জগতের আশ্রয়, চণ্ডীতে আছে এ কথা। 'ত্বামাশ্রিতাং আশ্রয়তাং প্রযান্তি'। তারাই ভক্ত।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—এ সব কথার মর্ম তপস্যা না করলে বোঝা যায় না। কেবল বুদ্ধি দিয়ে অর্থ যদি কর, তা হলে তোমার বুদ্ধি থেকে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধির কাছে তোমার অর্থ ম্লান হয়ে যাবে। তপস্যা করলে বোঝা যায় ঈশ্বরই সত্য ধর্ম। তাঁকে লাভের উপায়ও ধর্ম।

মোহন—সনাতন ধর্ম, বৈদিক ধর্ম বড়, অন্য ধর্ম ছোট—এ না বলে, বরং বললে হয় সনাতন ধর্ম প্রাচীন, অন্য ধর্ম নবীন। তা হলে ঝগড়া থাকে না।

শ্রীম—এ সব ঝগড়ার পথ নষ্ট করে দিয়েছেন ঠাকুর। তাঁর আগমনই এই জন্য, ধর্ম সমন্বয়ের জন্য। যত মত তত পথ। মত পথ। এই সত্যের আবিষ্কার দ্বারা তিনি সকলকে একসূত্রে বেঁধে দিয়েছেন। তবে কোন ধর্মকে প্রাচীন বলায় দোষ নাই।

ঠাকুর বলেছিলেন, সনাতন ধর্ম চিরকাল আছে ও থাকবে। অন্য সব ধর্ম ইদানীং কালের, আসে যায়।

মোহন—'অন্য সব ধর্ম ইদানীং কালের, আসে যায়'—এ কথা কি নবীন ধর্ম ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য সমাজ আদিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন?

শ্রীম—তাই মনে হয়। অন্য অর্থও থাকতে পারে। তাঁর কথা আমরা আর কতটা বুঝি? ব্রহ্মাদি দেবগণও তাঁর কাজ বুঝতে পারেন না। ব্রহ্মা বহুকাল তপস্যা করলে দৈববাণী হল, 'আমি আছি, আমি আছি'। অর্থাৎ জগতের কারণ ঈশ্বর। বর্তমান বৈজ্ঞানিকদের একদল বলে পরমাণুসমষ্টি থেকে জগত সৃষ্টি হয়েছে। আর একদল বলে, ঈশ্বর ইচ্ছা, 'grand intelligence' (বিরাট বুদ্ধি)। বেদ বলেন, ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ করেন। এই সত্যটি ঠাকুর সারা জীবন দিয়ে প্রকাশ করেছেন। জগতের আদি কারণ আদ্যাশক্তি—ঈশ্বর, সর্বদা ঠাকুরের সঙ্গে। ওঁকেই মা বলেছেন, তাঁর ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে।

একজন যুবক—খ্রীস্টান, মুসলমান, ইহুদী, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শী—

এ সব ধর্মই মানুষের দুঃখ দূর করে চিরতরে, চিরশান্তি বিধান করে। হিন্দু ধর্ম বৈদিক ধর্মও তাই করে। তা হলে হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য কোথায়?

শ্রীম—প্রথম, হিন্দুমতে, জীবের স্বরূপ ঈশ্বর। দ্বিতীয়, সকল জীবই একদিন মুক্ত হবে। এ কথা অন্য মতে নাই। তৃতীয়, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত—এই তিনটা ভাবই হিন্দুরা মানে। চতুর্থ, বৈদিক মতে ঈশ্বরদর্শনে প্রশস্ত চারটি রাস্তা আছে—ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ। পঞ্চম, জন্মান্তরবাদ। ষষ্ঠ, হিন্দুমতে ঈশ্বরের জন্য সম্বন্ধ স্থাপনের অনেকগুলি ভাব রয়েছে—শান্ত দাস্যাদি। অন্য মতে একটা, হদ্দ দুটো। এখানে অনেকগুলি ভাবের সাধন হয়। সপ্তম, এই মত নীতি-সাপেক্ষ ব্যক্তি-নিরপেক্ষ। অষ্টম, কেবল মানুষ-শরীরে মুক্তি স্বীকার করে হিন্দু ধর্মে।

মোহন—ঠাকুরকে যে সনাতন ধর্ম-বিগ্রহ বলা হয় এটা কিভাবে?

শ্রীম—সনাতন ধর্মের যে eternal (শাশ্বত) নীতিগুলি, সেগুলির পূর্ণ প্রকাশ শ্রীরামকৃষ্ণে দেখা যায়। তাই তাঁকে embodiment (বিগ্রহ) বলা হয়। যেমন সত্য—ঠাকুর যদি বলেছেন, একবার জল খাব না, তা শত অনুরোধেও তা খান নাই। একবার ছ'মাস জল খাই নাই। মণি মল্লিকের বাড়ী যাবেন বলেছিলেন, তা রাত্রি শেষে বরানগর তাঁর বাড়ীতে গিয়ে বললেন, এই দেখ আমি এসেছি। একবার বললেন, তিনটার সময় শৌচে যাব, তা শৌচের বেগ না হলেও গেলেন। ব্রহ্মচর্যেরও জমাটবাঁধা মূর্তি ঠাকুর। অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন করে একজন মিষ্টি এনেছিল। তিনি তা স্পর্শ করতে পারেন নি। মালিককে না বলে একজন লেবু এনেছিল, তিনি তা মুখে দিতে পারলেন না। সঞ্চয় করতে পারেন নি। এক ঢেলা মাটি হাতে করে নিয়ে যেতে পারেন নি। অর্থ স্পর্শ করতে পারেন নি। তিনি একটি পিঁপড়ের অনিষ্টচিন্তা করেন নি। ঠাকুর সর্বদা দেখতেন, মা-ই জীব-জগৎ হয়ে রয়েছেন। মা থেকে এক নিমেষের জন্যও বিচ্যুত হন নি।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—ঠাকুর শুষ্ক বিচার—academic discourse পছন্দ করতেন না। কিসে মানুষের মন ঈশ্বরের পাদপদ্মে লগ্ন হয়, সর্বদা সেই চেষ্টা করতেন। বলতেন, আমি জানতেও চাই না বেদে কি আছে, পুরাণে কি আছে, কোথায় কি আছে। তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও।

ভক্তদের বিচার দেখে এক একবার মার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। মা করবে কি—এক একবার বিচার না করে? শুধু কথায় চিড়ে ভিজে না, কথায় বলে। সাধন করতে হয়। তপস্যা করতে বলতেন। সত্যি সত্যি ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে, তাঁর ওপর ভালবাসা হলে, মনের এই সব বুদ্ধিগত সংশয় আপনি দূর হতে থাকে। বিদ্যা বুদ্ধির জাহাজ যাঁরা, সেই লোকগুলি ঠাকুরের কাছে কেঁচো হয়ে থাকতেন কেন? তাঁর জ্ঞান direct knowledge (প্রত্যক্ষ অনুভব), অপরের জ্ঞান বিচারপ্রসূত। আকাশ পাতাল তফাৎ। সাধুসঙ্গ, নির্জনবাস, ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে ডাকতে তাঁর উপর ভালবাসা হয়। তাঁকে ভালবাসাই মুক্তি।

৩

মর্টন স্কুল। চারতলার সিঁড়ির ঘর। শ্রীম ভক্তপরিবৃত হইয়া ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন। বড় জিতেনের প্রশ্নে সনাতন ধর্ম বা বৈদিক ধর্মের নানা দিকের আলোচনা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঋষিরা ঈশ্বরদর্শন করে অনন্ত সুখের অধিকারী হয়েছিলেন। সেই সুখ সমাজকে দেবার জন্য এক পাকা ব্যবস্থা করেছেন। তাঁদের socio-religious (সামাজিক ধর্ম) ব্যবস্থাটিও একরকম সনাতন, everlasting—ঈশ্বরদর্শনে পরম সুখ শান্তি। তাই কোন অবস্থাতেই মানুষকে ঈশ্বরে বিমুখ হতে দেন নি। দেখ না কি সুন্দর ব্যবস্থা—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। ধর্ম মানে, সত্যাদি সাধন সঙ্গে রেখে অর্থাদি উপার্জন কর, শাস্ত্রীয় কামনা ভোগ কর, তবেই মোক্ষ অর্থাৎ ঈশ্বর লাভ হবে। এ যেন একদিকে মা অপরদিকে বাপ, মাঝে সন্তানদের স্থান।

তা হলে সন্তানগুলি বিপথে যেতে পারে না। এই discovery (আবিষ্কার) অতুলনীয়।

এই ব্যবস্থাটি যেমনি deep (গভীর) তেমনি broad (প্রশস্ত) আর তেমনি lasting (দীর্ঘস্থায়ী)। কত সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি আসছে যাচ্ছে, কিন্তু এই ব্যবস্থাটি অটুট। বলছেন, বাবা, ধর্ম অর্থাৎ ঈশ্বর ও তাঁর মূল নীতিগুলি ছেড়ে দিয়ে কেবল সংসার করো না। এটি রেখে সাথে যা হয় কর। সময়ের অনন্ত আবর্তনেও মূল Hindu view of life (হিন্দুর দৃষ্টিতে মানব জীবনের উদ্দেশ্যটি) অক্ষত আছে—এটি হল প্রথম ব্যবস্থা। দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি—চারটি পথ আবিষ্কার—জ্ঞানযোগ রাজযোগ ভক্তিযোগ কর্মযোগ। প্রথমে একটি বেড়া দিয়ে ভিতরে রাখা হলো। তারপর প্রকৃতি অনুসারে একটি পথ ধরিয়ে দিল। এই পথ দিয়ে চললে শেষে বস্তু লাভ হবে। তবেই সর্ব দুঃখ নিবৃত্তি হবে ও চির সুখশান্তি লাভ হবে। Endও (উদ্দেশ্য) অনন্ত শাশ্বত অর্থাৎ সনাতন, meansও (উপায়ও) তাই। প্রথমটি সত্যিকার সনাতন, দ্বিতীয়টি সাপেক্ষিক সত্য।

একজন ভক্ত—উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ, আর উপায়—জ্ঞান যোগাদি যদি হয়, তা হলে অন্য ধর্মমতকে সনাতন বলা চলে। তারা এই সব উপায়ের দ্বারাই ঈশ্বর লাভ করে।

শ্রীম—হাঁ, বলা যায়, যদি ঈশ্বরদর্শনকে 'সনাতন ধর্ম' বলা হয়। কিন্তু এখানে উপায়কে লক্ষ্য করে বৈদিক ধর্মকে সনাতন ধর্ম অর্থাৎ চিরকেলে ধর্ম বলা হয়েছে—technical or particular senseএ (ব্যবহারিক বা বিশিষ্ট অর্থে) বলা হয়েছে। বহু পুরানো এই উপায়টি। নানা দিক দিয়ে দেখে শুনে তবে এই পথটি দেখিয়েছেন, সত্যাদি ধরে থাকলে ঈশ্বরলাভ হবে। ব্যক্তির নিরপেক্ষ এটি। রাম ও কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে যদি ঐ সাধন গ্রহণ করে তা হলেও ঈশ্বরদর্শন হবে। অন্য ধর্মে ব্যক্তিকে বাদ দেবার যো নেই। 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি' এই ভাবগুলি সামনে রেখে যদি কেউ সত্যাদি

সাধন ধরে চলে, তা হলে তাতেই তার ঈশ্বরদর্শন হবে। অন্য ধর্মমতে এগুলির ভাব দেখা যায় না এরূপ ভাবে।

উপায়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আবার খুব উদারও এই বৈদিক ধর্ম। দ্বৈত অদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত—যে কোনো ভাবে সাধন কর বস্তুলাভ হবে। সমস্ত হিন্দু জাতিটাকে—ঐ ঈশ্বরমুখীন করে বেঁধেছেন ঋষিরা। জন্ম থেকে মরণ পর্যন্ত একটানা একটা উপাসনা। তারপর পরিবার, সমাজ, সমাজের বিধান, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিবাহাদি—সব কার্য ঈশ্বরমুখীন। যাতে ঈশ্বরলাভ, সেই বিধি, সেই কার্য করণীয়। The burden of the song (গানের ধারা) ঐ—ঈশ্বরলাভ।

সনাতন ধর্মের বৈশিষ্ট্য দেখ। গান্ধীজীর রাজনীতি-আন্দোলন 'সত্যাগ্রহ'। সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। রাজশক্তি অন্যায় করছে। তার প্রতিকার হচ্ছে সত্য ও ন্যায় সহায়ে। জগতে এসব নূতন। অন্য দেশের লোকদের ঈশ্বরের নামে, সত্যের নামে আহ্বান করলে, তারা সাড়া দেবে না। কিন্তু ভারতের লোক সব ছেড়ে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহে যোগ দিয়েছে। কারণ তারা সত্য, ঈশ্বর বোঝে। অনন্তকাল ধরে এই সব চলছে এ দেশে। এ দেশের হৃদয়টি হলো সত্যাশ্রয়ী। সত্যের নামে, ঈশ্বরের নামে সব ছাড়তে পারে। অন্য দেশে, এটি মিলবে না।

বড় জিতেন—অনেকে বলে, ধর্ম ধর্ম করে ভারতের যত দুর্দশা।

শ্রীম—না, এ কথা ঠিক নয়। বরং বলা যায় ধর্মের অভাবে, শিথিলতায় এই বাহ্য দুর্দশা। ঋষিদের ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যই এইখানে। তাঁরা সব ওজন করে দেখেছিলেন কোন্ ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হবে—মানুষের সকল ব্যবহার ঈশ্বরের সঙ্গে জড়িয়ে দিলে, অথবা ঈশ্বরনিরপেক্ষ রাখলে। অনেক ভেবে চিন্তে দেখে তবে বললেন, 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং'। যদি ব্যক্তি ও সমাজকে ঈশ্বর থেকে পৃথক রাখতেন, তবে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি অত স্থায়ী হতো না।

সর্ব বিষয়ে ঈশ্বরকে টেনে আনলে লোক অলস হবে, শেষে ধর্ম অর্থে স্নান আহারের বিচারে পরিণত হবে, স্বামীজীর কথায় 'ধর্ম রান্না ঘরে ঢুকবে'—এ সব বিবেচনা ঋষিরা করেছিলেন। তবু তাঁরা ধর্মকে ঈশ্বরকে ধরে থাকতে বলেছেন। ঈশ্বরকে ছেড়ে দিলে কেবল পশুত্ব এসে যায়। দুই দিকেই দোষ। তাঁরা গ্রহণ করলেন—the path of the lesser evil (অপেক্ষাকৃত কম অনিষ্টের পথ।)

ধর্মের বাইরের দিকটায় মলিনতা আসে। তাই এ দেশে যুগে যুগে মহাপুরুষ, অবতার এঁরা আসেন ঐ মলিনতা দূর করতে। সম্প্রতি ঠাকুর এসে মানুষের মনকে ধর্মের নিম্নাঙ্গের সাধন থেকে তুলে পরমাত্মাতে লগ্ন করে দিয়েছেন। বলছেন, ঈশ্বরের সন্তান হয়ে থাক —'অমৃতস্য পুত্রাঃ'। জগতের নিয়মই এই—সমাজমন ওঠাপড়া করে। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, এই কাল বিভাবে এই নিয়ম সুস্পষ্ট।

ভারতের অন্তরটি নিবদ্ধ ধর্মে। দেখনা অত রাজনৈতিক নির্যাতনের সময়ও এই দেশে কত মহাপুরুষ এসেছেন—নানক, চৈতন্য, ঠাকুর। যদি এ দেশের মাটিতে ধর্মবীজ না থাকতো, তবে এই সব দুর্লভ ফল ফলতো না। এখন ঠাকুরের যুগ—ঠাকুর মানে—the highest manifestation of God on earth (ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ এই পৃথিবীতে)। এই সব নানাদিক দেখে বৈদিক ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলা হয়েছে।

একজন ভক্ত—আমাদের সেবাকার্য—স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, রিলিফ প্রভৃতিও তা হলে ধর্ম, সনাতন ধর্ম ?

শ্রীম—হাঁ, উপায়রূপে ধর্ম। নিষ্কাম কর্মে চিত্তশুদ্ধি হয়। শুদ্ধ চিত্তে ঈশ্বরদর্শন হয়। আসল সনাতন ধর্ম ঈশ্বরদর্শন। উপায় ও উদ্দেশ্য উভয়ই সনাতন ধর্ম। এ দেশের লোক ধর্ম নেয় যেমন পাশ্চাত্যের লোক রাজনীতি নেয়। ঈশ্বরদর্শন না করে ধর্মমত চালালে বেশীদিন থাকে না। সনাতন ধর্ম ঈশ্বরদর্শন, আর কঠোর নীতির উপর স্থাপিত।

একজন ভক্ত—কি কাজ করা উচিত, কিরূপে চলা উচিত?

শ্রীম—গুরু যা করতে বলেন তাই করা উচিত—সেই কাজ ও সেই আচরণ অনুসরণ করা উচিত। গুরু জানেন কোন কর্মে সংসার-বন্ধন মুক্ত হয়। যতদিন গুরুর শরীর থাকে সব কাজ তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে করতে হয়। শরীর গেলে বরং নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করা চলে। তাও তাঁর আদেশ ও শাস্ত্রানুসারে করতে হয়।

আজকাল দীক্ষা নেওয়া একটা ফ্যাসান হয়ে পড়েছে। আজ এর কাছে কাল ওর কাছে নিচ্ছে। গুরু যে মন্ত্রটি দেন, নির্জনে গোপনে সেটিকে প্রাণবন্ত করতে হয়। ঠাকুর বলতেন, ঝিনুক যেমন স্বাতি নক্ষত্রের জল পেটে পড়তেই অতল জলে ডুবে যায় সেটি থেকে মুক্তা গড়তে, তেমনি গুরুমন্ত্র। নির্জনে সাধন করলে সেই বীজটি প্রস্ফুটিত হয়, ঈশ্বরদর্শন হয়। তখন ইহকাল পরকালের সকল সমস্যার সমাধান হয়।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—একজন ভক্ত ঠাকুরকে বললেন, এই সংসারের যা গতিক দেখা যাচ্ছে—ছলনায় প্রতারণায় পরিপূর্ণ—তাতে এখানে আর বেঁচে থাকা চলেনা। ঠাকুর শুনে তৎক্ষণাৎ বললেন, বল কি? তোমার যে গুরুলাভ হয়েছে! তোমার ভাবনা কি? হাজার গাঁটওয়ালা একটা দড়ি বাজীকর হাজার হাজার লোকের সামনে ফেলে দিলে একটা গাঁট খুলতে। শত চেষ্টাতেও কেউ পারলে না একটা গাঁটও খুলতে। তখন বাজীকর দড়িটা হাতে নিয়ে হাত নাড়িয়ে সবগুলি গাঁট খুলে ফেললে। তেমনি গুরু। গুরু মানে ঈশ্বর। ঈশ্বর মানুষ হয়ে আসেন, তাঁকে বলে অবতার। এই সেদিন এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণরূপে।

বড় জিতেন (বিনীত ভাবে)—মশায়, লাটাইটা খালি করে দিন। সুতো যে খুলছে না।

শ্রীম—তাঁর কাছে কেঁদে বলুন, তাঁর ইচ্ছায় নিমেষে লাটাই খালি হয়ে যায়। বলতেন, যা অভাবনীয় অচিন্তনীয় স্বপ্নের অগোচর, তা তাঁর অঙ্গুলী-সঞ্চালনে দূর হয়ে যায়। বলেছিলেন, হাজার

বছরের অন্ধকার ঘর এক নিমেষে আলোকিত হয়। তুলোর পাহাড়ে আগুন দিলে দেখতে দেখতে ভস্ম হয়ে যায়। তাঁর কৃপা-ইঙ্গিতে নিমেষে খুলে যায় লক্ষ লক্ষ বছরের সঞ্চিত সুতোর প্যাঁচ। ভাবনা কি? তিনি রয়েছেন পেছনে। তাঁকে বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের লাটাই সাফ করে দিছলেন। ঠাকুরও ভক্তদের লাটাইয়ের অসংখ্য প্যাঁচ খুলে দিয়েছিলেন। এখনও খুলে দিচ্ছেন। ভবিষ্যতেও দিবেন। তাঁর আগমনই এই জন্য।

মানুষের বুদ্ধিতে এটা একটা stupendous obstacle (বিরাট বাধা) এই সূতো খোলা—লাটাই সাফ করা। কিন্তু তাঁর কাছে কিছুই নয়—স্পর্শ মাত্র, ইঙ্গিতে বা ইচ্ছায় নিমেষে মানুষ বন্ধননির্মুক্ত হয়। মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়েছেন এই জন্য, ভক্তদের লাটাইয়ের সুতো খুলে দিতে। দাঁড়িয়ে আছেন। বলুন তাঁকে। 'সদানন্দ সুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়'।

মর্টন স্কুল; কলিকাতা, ২রা আগস্ট, ১৯২৪ খ্রীঃ
১৭ই শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল, শনিবার। শুক্লা দ্বিতীয়া ৫১।৩৫ পল।

চতুর্দশ অধ্যায়

দয়ায় বদ্ধ সেবায় মুক্ত

১

মর্টন স্কুল। শ্রীমর কক্ষ। এখন সকাল সাতটা। আজ শ্রীমর পিঠের বাতের বেদনা বাড়িয়াছে। তথাপি তিনি তিনতলায় নামিয়া শৌচাদি শেষ করিয়া চারতলায় আসিয়াছেন। বিছানায় শুইয়া আছেন পশ্চিমাস্য। তাঁহার বাম পার্শ্বে বেঞ্চিতে বসা জগবন্ধু, শান্তি, বিনয় প্রভৃতি। শান্তি মর্টন স্কুলের স্নাতক, কলেজে পড়িতেছে। শ্রীম তাহাকে পাঠে উৎসাহিত করিতেছেন।

শ্রীম (শান্তির প্রতি)—পড় পড়। খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে হয়। কেন পড়া? না, এতে বুদ্ধি মার্জিত হয়। বিচারশক্তি তীক্ষ্ণ হয়। সেই বুদ্ধি ও বিচারশক্তির সাহায্যে উচ্চতর বিচারে আরূঢ় হওয়া যায়। বল তো কি সে-টি—ঐ উচ্চতর বিচার? সেটি হচ্ছে ভগবানলাভ। মানুষের জীবনে যত উচ্চ আদর্শ রয়েছে তার মধ্যে ভগবানলাভ সকলের ঊর্ধ্বে। কেন? না, এতে পরম শান্তি লাভ হয়। সকল দুঃখের অবসান হয়। রোগ, শোক, দারিদ্র্য, অপমান, জরা-মৃত্যু—এ সবের হাতে পড়লে বুদ্ধি গুলিয়ে যায়, এমনতর ব্যাপার। তাই আগে থেকেই প্রস্তুত হতে হয়, যাতে এ সব জ্বালার হাতে পড়েও বুদ্ধি অবিচলিত থাকে, তার জন্য।

ঈশ্বরের কৃপায় কেবল কতকটা স্থির থাকা যায়। নচেৎ শোক-টোক সব বিচার ঠেলে ফেলে দেয়, ঠাকুর বলতেন। অত বড় উচ্চ অধিকারী অর্জুন, পুত্রশোকে একেবারে পাগল হয়ে গেলেন। এমনি খেলা মহামায়ার! ঠাকুরের ভাইয়ের ছেলে অক্ষয় মারা গেলে ঠাকুর বলেছিলেন, আমার হৃদয়টা যেন গামছা নিংড়াচ্ছে। ছেলেটি কাছে থেকে মানুষ হয়েছিল। বলতেন, আমি সংসার করি নাই, তাতেই যদি এই জ্বালা, তা হলে যারা সংসার করে তাদের জ্বালা না জানি কত বড়! অবশ্য কয়েক দিন মাত্র ছিল ঠাকুরের ঐ অবস্থা। তারপর কখনও আর নামও করেন নাই ঐ অবস্থার। এ সব নজিরের জন্য। এ সবের জন্য প্রস্তুত হয়ে সংসারে থাকতে হয়।

সমাধিস্থ হয়ে থাকতে পারলে এ সবের এলাকার বাইরে। তাও কতক্ষণ থাকা যায় সমাধিস্থ? আর কততে সমাধি হয়! এ সবের alternative হচ্ছে, গুরুবাক্যে বিশ্বাস করা—বালকের ন্যায় বিশ্বাস করা। মা বলেছে, ও ঘরে জুজু আছে—তা ষোল আনা বিশ্বাস। জুজু কি তা বালক জানে না, তবুও।

গুরু ঠাকুর—অবতার। তিনি বলেছেন, কেঁদে কেঁদে বললে ঈশ্বর শোনেন। বলতেন, পিঁপড়ের পায়ের নূপুরের ধ্বনি তাঁর কানে পৌঁছায়। আর তোমার কথা শুনতে পাবেন না? আর

যাঁদের গুরুবাক্যে বিশ্বাস হয়েছে সেই সাধুদের সঙ্গ ও সেবা করতে হয়। কেঁদে কেঁদে বলতে হয়, মা তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না। এ সব সঙ্কেত ঠাকুর শিখিয়ে গেছেন।

রাজ্যের বর্ডারে সৈন্য রাখে—শত্রু এলে বাধা দিবে। তেমনি মনের ভিতর বর্ডারে বিচাররূপী সৈন্য রক্ষা করতে হয়। আক্রমণ বড় হলে এই বিচারের প্রাচীরও উলটে ফেলে দেয়। সিদ্ধপুরুষদের বিচারও ঠেলে ফেলে দেয়—অবতারেরও। সীতা ও লক্ষ্মণের শোকে রাম কাঁদছেন। তবে এ অবস্থা ক্ষণস্থায়ী।

শ্রীম কিছুকাল নীরব। আবার কথা-প্রসঙ্গ।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—এই সব দৃশ্যমান বিপদের হাত থেকে রক্ষার জন্য বিদ্যানুশীলন ভাল। এটা ফার্স্ট স্টেপ। এতে আবার কতকগুলি গুণ বৃদ্ধি হয়—মনোযোগ, দায়িত্বজ্ঞান, মেনে চলা, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, ধৈর্য, অধ্যবসায়, এই সব। সকলের উপর, বুদ্ধিটি মার্জিত হয়, তীক্ষ্ণ হয়। (শান্তির প্রতি) তোমরা সুতোয় মাঞ্জা দেও নাই ছেলেবেলায় ঘুড়ি উড়াবার সময় ? তেমনি বুদ্ধিতে মাঞ্জা দিতে হয়। ঘষতে ঘষতে নির্মল হয়, তীক্ষ্ণ হয়। সেই মাঞ্জা দেওয়া বুদ্ধি দিয়ে উল্টো বুদ্ধি—সংসারবুদ্ধি ছেদন করা যায়, যেমন ভাল মাঞ্জা থাকলে অপর ঘুড়ির সুতোগুলি কচ্ কচ্ করে কেটে দেয়। তখন মন-ঘুড়িটি উচ্চে নির্মল আকাশে উঠতে পারে। অপর সব বুদ্ধি দুর্বুদ্ধি। কেবল ঈশ্বরবুদ্ধি, মোক্ষের বুদ্ধিই সুবুদ্ধি।

যদি বুঝতে পারে এটা করা উচিত বিচারের দ্বারা; তা হ'লেও অনেকটা এগিয়ে গেল। বাকী অভ্যাস। বার বার বিচ্যুত হলেও পুনরায় চেষ্টা চাই। সেটি করতে পারে যার বুদ্ধি সাফ, সে। নইলে মনে অবসাদ আসে, সঙ্গে ভয় ও নিরাশা। তা হলে আর যুদ্ধ-জয় হলো না।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—কথায় বলে, বলিরাজা পাঁচজন পণ্ডিত নিয়ে পাতালে গেলেন। কিন্তু শত মূর্খ নিয়ে স্বর্গে যেতে রাজী হন নাই। তার মানে, বুদ্ধিমান শত্রুও ভাল, মূর্খ মিত্রের চাইতে।

কেবল বুদ্ধি দিয়ে বিদ্যা দিয়ে ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা হতে পারে। সকলেই এক্ষুণি ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে যত্নবান হবে না। কিন্তু বিচার দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া যায় ব্রহ্মবিদ্যার অভ্যাসে সর্ব দুঃখ নাশ হয়। Probability (সম্ভাবনা) পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া—ব্যস্।

তারপর যদি অবস্থার আবর্তনে, নানা বিপদের পীড়নে ইচ্ছা হয় ব্রহ্মবিদ্যা অভ্যাসে, তখন অনায়াসে ও পথে চলতে পারবে। কেউ কেউ হয়তো পড়তে পড়তেই সাধু হয়ে গেল। এই গোলকধাঁধাতে আর পড়লো না। সংসারে প্রবেশ করলো না—এই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে।

আর যদি সংসারে প্রবেশও করে তা হলে পূর্বের বিচার, অভ্যাস কাজে লাগবে। ভগবানকে সঙ্গে রেখে চলতে পারবে। এতেও লাভ। শোক-তাপের আস্তানা মানুষজীবন। আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে এতে ঢুকতে হয়। কেউ হয়তো পড়তে পড়তে সাধু হয়ে গেল। এর মানে কি ? তা সে relentless (অবিশ্রান্ত) যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত—মারি তো হাতী, লুটি তো ভাণ্ডার। জগদম্বা তাকে সংসারের সৃষ্টির কাজে লাগাবেন না। জ্ঞান-ভক্তির অনুশীলন করাবেন। তাতে নিজের শান্তি, সুখ, আনন্দ, অপরকে ঐ পথে টেনে নেওয়াবেন। মায়ের তো দুটি ভাগ—বিদ্যা ও অবিদ্যা। এদের তাঁর বিদ্যাবিভাগে লাগাবেন।

জগবন্ধু ও বিনয় শ্রীমর আদেশে সাড়ে আটটায় বেলুড় মঠে রওনা হইলেন। মঠের,সংবাদ না পাইলে শ্রীম অস্বস্তি বোধ করেন। এই অসুখেও মঠের সংবাদের জন্য শ্রীম ব্যাকুল। তাই এই সংবাদের জন্য ভক্তদের মঠে পাঠাইলেন।

ভক্তগণ মঠের সকল সংবাদ লইয়া গঙ্গা পার হইয়া কাশীপুরে ডাক্তার কার্তিক বক্সীর বাড়ীতে যান। সেখানে মধ্যাহ্নভোজন ও বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্ন দুইটায় ডাক্তারের মোটরে ৺কাশীপুর উদ্যানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন ডাক্তার বড় অমূল্য ও ছোট অমূল্য। এই পবিত্র স্থানে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

অসুস্থ হইয়া প্রায় এক বৎসর বাস করেন। এখানেই তাঁহার মহা-সমাধি লাভ হয়। আজকাল একজন আরমেনিয়ান খ্রীষ্টান ভদ্রলোক সপরিবারে বাস করেন। ইঁহারা অতি সজ্জন লোক। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তগণ এখানে আসিলে তাঁহারা সমাদরে তাঁহাদিগকে বাসস্থানে লইয়া যান। আজও ভক্তগণের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতলের সকল স্থান দর্শন করিলেন। আর ভক্তগণের নিকট হইতে কোথায় ঠাকুরের বিছানা ছিল তাহা জানিয়া লইলেন। ভক্তরা কয়েকবার শ্রীমর সঙ্গেও এখানে আসিয়াছেন। শ্রীম তাঁহাদিগকে দেখাইয়াছিলেন, গোল ঘরের পশ্চিম প্রান্তে জানালার কাছে ছিল ঠাকুরের শয্যা। এই উদ্যানে নরেন্দ্রনাথও নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেন শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায়। এখানে অন্তরঙ্গগণ আত্মদর্শন করেন আর পূর্ণকাম হন। এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা আশ্রয় করিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সকলে সংঘবদ্ধ হন। 'বহুজন সুখায় বহুজন হিতায় চ।' শ্রীরামকৃষ্ণসংঘের জন্মভূমি এই বিখ্যাত উদ্যান। যেমন পবিত্র তেমনি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ এই মহাপীঠ।

ভক্তগণ এইবার আসিলেন শ্যামাপুকুর রোডের পঞ্চাশ নম্বর বাড়ীতে। ক্যানসারে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার্থ প্রথমে ছিলেন এই বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ। এখানে ভারতীয় বিজ্ঞানের জনক ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার চিকিৎসকরূপে প্রথম দর্শন করেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে। এই বাড়ীতেই শ্যামাপূজার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে নিজে পূজা করেন—পুষ্প, মাল্য, চন্দনাদি সহযোগে। আর বরাভয় মুদ্রা ধারণ করিয়া অতিবিশ্বাসী গিরিশাদি ভক্তগণকে কৃতার্থ করেন।

এবার বলরাম মন্দিরে। এইস্থান শ্রীরামকৃষ্ণলীলার একটি বিশেষ তীর্থ। শ্রীরামকৃষ্ণ বহুবার ভক্তসঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছেন এই স্থানে। কত কথা, কত নৃত্য-গীত, সমাধি ও দিব্যভাবের কত অভিনয় হইয়াছে এই স্থানে। ভক্তগণ সর্বদা দক্ষিণেশ্বর যাইতে পারিতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহাদের সঙ্গ ছাড়া থাকিতে পারিতেন

না। তাই তিনি নিজে মাঝে মাঝে এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। আর ভক্তগণকে আহ্বান করিয়া দিব্য-লীলারসের অভিনয় করিতেন—এইখানেই ভক্তগণের পক্ষে বরং সম্ভব তাঁহাকে ভোলা। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে ভুলিবেন কি প্রকারে? পিতা-মাতা কি সন্তানকে ভুলিতে পারে কখনো? শ্রীরামকৃষ্ণ যে জগৎ-পিতা জগন্মাতা। ভক্তগণ সাময়িক ভুলিলেও তিনি তাঁহাদের সম্বিৎ ফিরাইয়া আনিতেন দর্শন ও দিব্যস্নেহ প্রদানে। বিস্মৃত ও বিক্ষিপ্ত ভক্ত-সন্তানগণের মিলনভূমি এই বলরাম মন্দির।

অপরাহ্ণ পাঁচটা। ভক্তগণ বাগবাজারের সঙ্গীত প্রতিযোগিতা কিয়ৎক্ষণ দর্শন করিয়া মর্টন স্কুলে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীম অসুস্থ, পিঠে বাতের প্রবল ব্যথা। তবুও ঠাকুরের স্মৃতিসম্বলিত পুণ্যতীর্থ বেলুড় মঠাদির সংবাদের জন্য চাতকের ন্যায় অপেক্ষা করিতেছেন। ভক্তগণকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন চঞ্চল বালকের ন্যায়, বলুন, বলুন, তাদের সংবাদ বলুন—যারা সব ছেড়ে তাঁকে নিয়ে আছেন সর্বদা। সর্বত্যাগীদের সংবাদ বলুন। This is the best item in the agenda of the world—জগতের কর্মসূচীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সংবাদই এইটি। স্থিতপ্রজ্ঞদের সংবাদ। পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র কন্যা সর্বস্ব ছেড়ে যাঁরা ঈশ্বরের সন্ধানে নিরত—whole time men (সর্বত্যাগী ভক্ত) তাঁরা। অপর লোক সংসারে নিমগ্ন আর তাঁরা ঈশ্বরে নিমগ্ন। তাঁরা কেবল ঈশ্বরকে চান। এই সাধুদের সংবাদে সর্ব দুঃখ দূর হয়। তাঁরা চলছেন সকলের উল্টা পথে। তাঁদের কাম্য জিনিসটিই থাকবে চিরকাল। শান্তি, সুখ ও প্রেমানন্দের মূলভূমি সেটি।

ভক্তগণ একে একে মঠ, কাশীপুর উদ্যান, শ্যামপুকুর বাটিকা ও বলরাম মন্দিরের বিবরণ দিতেছেন। শ্রীম খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া সকল কথা শুনিতেছেন। যাহা অপরের নিকট সামান্য সংবাদ, শ্রীমর নিকট উহা বৃহৎ। শ্রীম জিজ্ঞাসা করিতেছেন, মঠের গরুদের খবর ভাল তো—বাচ্চারা কেমন? ক'টি গরু ক'টি বাচ্চা; দুধ দেয় ক'টি গরু?

সাধুরা কে কে মঠে এসেছেন, কে কে শাখা কেন্দ্রে গিয়েছেন। বাগানে আজকাল কি কি তরকারী হচ্ছে? সাধুরা কে কি কাজ করছেন? কয়জন সাধু আপনাদের সঙ্গে গঙ্গা স্নান করেছিলেন— এবং কে কে? ঠাকুরের পূজা কে করছেন, ভাণ্ডারে কে কে আছেন? এই সব সংবাদ শ্রীমর নিকট অমূল্য। শ্রীমর আগ্রহ ও আচরণ, শ্রদ্ধা ও প্রীতি দেখিয়া ভক্তরা বুঝিতে পারিলেন, সর্বত্যাগীদের সম্বন্ধীয়, অবতার বিষয়ক সকল বস্তুই পবিত্র, মূল্যবান আর ব্রহ্মজ্ঞান সহায়ক। মঠের পুণ্য সংবাদ শুনিতে শুনিতে শ্রীম রোগযন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন। ভক্তগণ দেখিতেছেন, শ্রীম নূতন মানুষ, যুবকের মত তেজোময়, মুখ মণ্ডলে আনন্দের ছটা। কাশীপুর উদ্যানে যেন ঠাকুরের সঙ্গে ঘর করিতেছেন। সাধারণতঃ লোক সাধুদের নিকট যায় বেদান্ত-বিচার শুনিতে। কিন্তু শ্রীম যান মঠে ভক্তদের শরীর আশ্রয় করিয়া সাধুদের দর্শন করিতে, তাঁহারা কি করেন, কেমনে চলেন বলেন, এই সব দেখিতে।

স্থিতপ্রজ্ঞের সকল আচরণই আদরণীয়। শ্রীমর মুখে আর রোগের চিহ্ন নাই। তাহার স্থলে রহিয়াছে কৌতূহল, আনন্দ, প্রশান্তি। যাহা অপরের নিকট সামান্য, তাহা শ্রীমর নিকট মহামান্য। ভক্তরা নূতন করিয়া বুঝিলেন—'যা নিশা সর্বভূতাণাম্ তস্যাং জাগর্তি সংযমী', গীতার এই মহাবাণীর অর্থ।

সিঁড়ির ঘরে বসিয়া শুনিতেছেন মঠাদির সংবাদ আর আনন্দে পরিপূর্ণ হইতেছেন শ্রীম। এখন রাত্রি দশটা। ভক্তগণ বিদায় লইয়াছেন। নৈশভোজন শেষ করিয়া শ্রীম ঐ সিঁড়ির ঘরেই বসিয়া আছেন চেয়ারে দক্ষিণাস্য। মনোরঞ্জন, বলাই ও জগবন্ধু, শ্রীমর পিঠে সৈন্ধবাদি তেল মালিশ করিয়া, তাহাতে আগুনের সেঁক দিতেছেন।

আজ ৩রা আগস্ট, ১৯২৪ খ্রীঃ, ১৮ই শ্রাবণ রবিবার। শুক্লা তৃতীয়া ৫০।৫৫ পল।

২

মর্টন স্কুল। চারতলার শ্রীমর ঘর। এখন রাত্রি আটটা। শ্রীম বিছানায় দক্ষিণ পার্শ্বে শুইয়া আছেন। মনোরঞ্জন পিঠে সৈন্ধবাদি তেল মালিশ করিতেছেন। আর জগবন্ধু নুনের পোঁটলায় সেঁক দিতেছেন। গরম সেঁকে একটু আরাম বোধ হয়। আজ বেদনা একটু বাড়াবাড়ি। সিঁড়ির ঘরে ভক্তগণ বসা। শ্রীমর আদেশে তাঁহারা কথামৃতের পাঠ শুনিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পর বড় জিতেন, ডাক্তার কার্তিক বক্সী, বিনয় ও ছোট অমূল্য শ্রীমর ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর বিদায় লইলেন। এখন ঘরে ছোট জিতেন, মনোরঞ্জন ও জগবন্ধু। তেল মাখা ও সেঁক চলিতেছে। মাঝে মাঝে শ্রীম এই বেদনার ভিতরও রসিকতা করিতেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্নপ্রকার উপদেশও চলিতেছে।

শ্রীম (মনোরঞ্জনের প্রতি)—কেন. বোকা ভাইকে বিয়ে দিলে? তাই তো সংসারের দায়িত্ব নিজের উপর পড়েছে। এটি না করলে তো মুক্ত ছিলে। নিজে বিয়ে না করে ভাইকে বিয়ে দিলেও নিজেরই দায়িত্ব এসে গেল। এখন ভোগ সারা জীবন। ছেলেপুলে হবে। এদেরও দেখতে হবে তোমাকে। 'প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষতি'। এ কেমন? না, মাথায় বোঝামুক্ত, কিন্তু পায়েতে একটা load (বোঝা) বেঁধে দিল। জেলখানায় খুনীদের পায়ে একটা ভারি জিনিস বেঁধে দেয়, যাতে ইচ্ছামত চলা ফেরা করতে না পারে। এ অবস্থাও তেমনি।

এ থেকে মুক্তির এক উপায় আছে—যদি নিখোঁজ হয়ে সন্ন্যাসী হতে পারে। তা হবার উপায় কোথায়? যে স্নেহে বিয়ে দিয়েছে সেই স্নেহই টেনে নিয়ে আসবে। তবে যদি ঐ স্নেহ ঈশ্বরে দিতে পারে কেউ, তবে তার মুক্তি। তখন আর দায়িত্ব নাই। তখন 'যোগক্ষেমং বহাম্যহং' এর অধিকারী হয়।

শুধু কি স্নেহই পেছনে? কর্তৃত্বাভিমানও রয়েছে পেছনে।

এটা যে অতি বড় শত্রু। আমি না করলে কে করবে, আমি না দেখলে কে দেখবে এদের, এরা যে অনাথ—এই ভাবনা টেনে রেখে দেয়। যদি এই অভিমান ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয় তবে রক্ষা। নচেৎ এক জন্মে কেন, অনন্ত জন্মেও শেষ নাই।

বিয়ে সম্বন্ধে ইংরেজদের ব্যবস্থা ভাল। বাপ ভাইয়ের কোন দায়িত্ব নাই। নিজের কাঁধে দায়িত্ব। ছেলে মেয়ের পরস্পরের দায়িত্ব। একবার মাত্র অনুমতি নিতে হয় দুই পক্ষেরই বাপের।

শ্রীম (ছোট জিতেনের প্রতি)—(ছোট) অমূল্যবাবুকে বললাম মেয়ের বিয়ে দিতে। মেয়ে বড় হলে বিয়ে দেওয়া একটা দায়িত্ব কিন্তু ছেলের বিয়ে দেওয়া দায়িত্ব নয়। তাকে লায়েক করে দেওয়া ব্যস্। এর পর খুঁটে থাক। বাচ্চা বড় হলে পাখীরা খেতে দেয় না, ঠোক্কর মারে ধাড়ি ঠোঁটে ঠোঁট দিলে। ঠাকুরের dictum (মন্ত্র) এই। ছেলে লায়েক করে দেওয়া, আর মেয়ে সৎপাত্রে দেওয়া। বাপ-মাকে সারা জীবন সেবা করা। আর সতী স্ত্রীর জন্য বন্দোবস্ত করা সারা জীবনের অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের। এমনও বলেছেন ঠাকুর, মার চরিত্র খারাপ হলেও ছেলে সেবা করবে মাকে সারা জীবন।

একটি ভক্ত—আজকাল অনেক মেয়ে বিয়ে করতে চায় না, এ ঠিক কি?

শ্রীম—শুধু বিয়ে করবে না বললেই হলো না। কেন বিয়ে করতে চায় না, তা দেখা উচিত। যদি মেয়ে সাধু-জীবন যাপন করতে চায় তা করুক, ভাল। কিন্তু দায়িত্বের ভয়ে অমনি বিয়ে না করতে চাইলে শেষ ভাল হয় না। একটা আশ্রম আশ্রয় করে থাকা উচিত—গার্হস্থ্য বা ব্রহ্মচর্য আশ্রম। তা নইলে, না এদিক না ওদিক। মনের growth (বৃদ্ধি) হয় না। ব্রহ্মচর্য আশ্রম নেবে তা ভাল কথা। যেখানে মেয়েরা থাকে সাধু হয়ে সেখানে থাকুক মেয়েদের সঙ্গে। নইলে পরে এদের কষ্ট হয় দাঁড়াবার স্থান থাকে না। মন সুগঠিত হয় না। কখনও মন বলে তুমি ব্রহ্মচারিণী, কখনও বলে তুমি গৃহস্থ-আশ্রমী। এই দু'টানায় পড়ে মন স্থির হয় না। তাই চরিত্র

সুদৃঢ় হয় না, মন স্থির হয় না। যতক্ষণ না মেয়ে একটা উত্তম ideal (আদর্শ) নিয়ে উত্তম জীবন যাপন করতে চেষ্টা করছে, ততক্ষণ বাপ ভাইয়ের উচিত মেয়েকে বিয়ে দেওয়া। Strong protest (তীব্র প্রতিবাদ) যতক্ষণ না করে, ততক্ষণ মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করা উচিত।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—অনেকে নিজে বিয়ে করে না, কিন্তু ভাইকে বা অন্য আত্মীয়কে বিয়ে দিয়ে দিল। সে আবার রোজগার করতে পারে না। এখন যে বিয়ে দিয়েছে তাকেই রোজগার করে খাওয়াতে হবে। আবার ছেলেপুলে বাড়বে, তার জন্যও সে-ই দায়ী। এমনতর কাণ্ড। নিজের কর্মের ফল তাকে এই জীবনেই ভোগ করতে হয়। এই ইনি (মনোরঞ্জন) পড়েছেন এই ফাঁদে। নিজে বিয়ে করেন নাই। কিন্তু ভাইকে বিয়ে দিয়েছেন। এখন ভীষণ ঝঞ্ঝাটে পড়েছেন।

শ্রীম (মনোরঞ্জনের প্রতি)—তা এতো ঝঞ্ঝাটে যখন পড়েছেন তখন 'কথামৃত' পড়ুন। কি আর করবেন—পড়ুন পড়ুন।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি) ঘটা করে চিকিৎসা করে লোক, দেখেন নাই? সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে যায় ডাক্তারদের, বাড়ীর সামনে। তেমনি কেউ কেউ ঘটা করে সংসার করে, কেউ আবার ঘটা করে ধর্ম করে—লোক দেখানো সব। অন্তরে দৃঢ় কোন ভাব নাই।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। আবার কথা।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—ঠিক ঠিক friend (বান্ধব) মেলা বড় কঠিন। একজন অতি দুঃখে তাই বলেছিলেন, save me from my friends (আমায় রক্ষা কর বন্ধুদের হাত থেকে) সদ্‌গুরুই প্রকৃত বন্ধু—ইহকালের ও পরকালের।

ভক্তগণ শ্রীমর পিঠে সৈন্ধবাদি তেল মালিশ করিতেছেন আর নুনের সেঁক দিতেছেন। বেদনা প্রবল কিন্তু শ্রীমর মনটি পড়িয়া আছে সদ্‌গুরু ঠাকুরের উপর। আর বাহিরে ভক্তদের কল্যাণের জন্য উপদেশ দিতেছেন। ঈশ্বরে মনোনিবেশ আর লোক-কল্যাণ এই দুইটিই মহাপুরুষগণের কাজ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আগেকার লোক, শুনতে পাই, শুধু আকন্দ পাতার সেঁক দিয়ে ব্যথা আরাম করতো। আজকাল কত ঔষধ বের হয়েছে অন্ত নাই। রাত হয়েছে। যান আপনারা গিয়ে বিশ্রাম করুন।

(জগবন্ধুর প্রতি) কাল আপনারা একটা careless (অসাবধানতার) কাজ করেছেন। তেলের শিশিটা জানালার চৌকাঠে রেখেছিলেন। চারদিকে চোখওয়ালা লোক পাওয়া কঠিন। ঠাকুর বলেছিলেন, ভক্তদের পিঠেও দুটো চোখ থাকবে। তার কি হবে? একদিন আমাকে তিরস্কার করেছিলেন, ছাতা পঞ্চবটীতে ফেলে এসেছিলাম তাই।

কেন বলতেন, ভক্তদের পিঠেও দুটো চোখ থাকবে তা এতদিনে বুঝতে পারা যাচ্ছে। মহামায়া সর্বদা ভুলিয়ে দেন। সংসারের বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি থাকলে মহামায়ার পরীক্ষায় আত্মরক্ষা করা চলবে।

আজ ৪ঠা আগস্ট ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, ১৯শে শ্রাবণ, সোমবার, শুক্লা চতুর্থী তিথি, ৪৮।৪৩ পল।

পরের দিন সকাল সাতটা। শ্রীম চারতলার সিঁড়ির ঘরে বসিয়া আছেন চেয়ারে উত্তরাস্য। জগবন্ধু, ছোট জিতেন আদি ভক্তগণ উপরে আসিয়া শ্রীমকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা দোতলার সৎসঙ্গ গৃহে রাত্রিবাস করিয়াছেন। কথামৃত ছাপা হইতেছে, তৃতীয় ভাগ। শ্রীমর হাতে প্রুফ—শ্রীরামকৃষ্ণ-বিদ্যাসাগর মিলন। জগবন্ধুর হাতে কপি দিয়া শ্রীম প্রুফ সংশোধন করিতেছেন। মাঝে মাঝে আলোচনা করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এই এক থাকের লোক আছে। তারা বলে, ঈশ্বরকে জানা যায় না। যেমন ক্যাণ্ট। বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও এই মত। তারা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে! কিন্তু বেদ এরও উপরে উঠেছে! বেদ বলে, হাঁ, তিনি 'অবাঙ্মনসগোচরম্' কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধির গোচর। বিষয়লিপ্ত বুদ্ধির অগোচর বটে। শুদ্ধবুদ্ধি

হয় তপস্যা দ্বারা। অহংকার মনের ময়লা। এ যায় ঈশ্বরচিন্তা দ্বারা। যেমন একটা সোনার ঢেলা। তার গায়ে মাটি কোটিং (লেপ) পড়েছে। সোনা দেখা যায় না। জলে ধুয়ে নাও অমনি ওর স্বরূপ দেখা যায়। তেমনি মন। অহংকারের প্রলেপ পড়েছে এর উপর। জীবের অহংকার। এটাকে ঈশ্বরের অহংকারের সঙ্গে মিলিয়ে দাও, তখন জীব হয় শিব। অহংকার যাওয়া বড় কঠিন। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকলে তিনি কৃপা করে দেখিয়ে দেন জীব ও শিব স্বরূপতঃ এক—'ত্বমেবাহম্'। ঠাকুর এই ঈশ্বরের সঙ্গে দিবানিশি কথা কইতেন। তাঁর কৃপায় তাঁর ভক্তদের এই অবস্থা লাভ হয়েছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আপনারা বসে বসে এই কথাগুলি ভাবুন। আমি নিচ থেকে আসছি। আর আপনি (জগবন্ধু) প্রুফ দেখুন। আর ইনি (ছোট জিতেন) কপি ধরুন। ভক্তরা প্রুফ দেখিতেছেন আর মাঝে মাঝে পঠিত বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন। শ্রীম ইতিমধ্যে ফিরিয়াছেন।

শ্রীম—আপনাদের কি সব কথা হচ্ছিল ?

একজন ভক্ত—বিদ্যাসাগরের কাছে ঠাকুর কেন গিয়েছিলেন ?

শ্রীম—ঠাকুর বলতেন, যাকে দশজনে মানে গণে, তার ভিতর ঈশ্বরের শক্তি আছে। বিদ্যাসাগর মশায়ের দয়ার কথা ঠাকুর বালককালে শুনেছিলেন। বয়সে তিনি ষোল সতর বছরের বড় ছিলেন। তবুও ঠাকুরকে মান্য দিয়েছিলেন। দয়া সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য। এর পরই ঈশ্বর। এই কথাই বলতে গিছলেন, তোমার ভিতর মাল রয়েছে—মাণিক। একটু নাড়া চাড়া করলেই বেরোবে। তাই দক্ষিণেশ্বর যেতে বলেছিলেন। বিদ্যাসাগর মশায় কথাও দিয়েছিলেন, যাবেন। কিন্তু যাওয়া হয় নাই। ঠাকুর তাতে দুঃখিত হয়েছিলেন। একদিন আমাদের বললেন, 'কেমন লোক বিদ্যাসাগর, কথা দিয়েও কথা রাখে না ?' যদি যেতেন তা হলে হয়তো এ জন্মেই ঠাকুর ঈশ্বরদর্শন করিয়ে দিতেন।

অহংকারই বাধা ঈশ্বরদর্শনের। ঠাকুর বলতেন, এটা যেন

পরদা—বস্তুকে, ঈশ্বরকে ঢেকে দেয়। তাঁর কৃপায় এটা গেলে তবে দর্শন। আমি ঈশ্বরের দাস এই অহংকার—তিনি বলতেন। এই দাসের অহংকার নিয়ে সংসারে থাকতে বলেছিলেন। দয়াতেও অহংকার আছে। যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতাতে অহংকার ছিল। তাই শ্রীকৃষ্ণ তা-ও দূর করে দিয়েছিলেন।

তাই বিদ্যাসাগর মশায়কে বলেছিলেন পরোপকার ভাল বটে। কিন্তু তা-ও নিষ্কাম হয়ে করতে হয়, ঈশ্বরের কাজ জেনে করা, নিজে যন্ত্র মাত্র। অর্জুনকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্রীম প্রুফ দেখিতেছেন জগবন্ধু কপি ধরিয়াছেন। মাঝে মাঝে আবার কথা। ছোট জিতেনকে বলিলেন, আপনারা এক একটা পানতোয়া নিন্। এই বলিয়া নিজ হাতে ভক্তদের পানতোয়া প্রসাদ দিলেন। আর বলিলেন, এই ছানাবড়াগুলি অদ্বৈতাশ্রমে নিয়ে যান। এই কমলালেবুগুলিও নিন। সামনে বসিয়ে সাধুদের খাইয়ে আসবেন। বলবেন, উনি (শ্রীম) এইরূপ করতে বলে দিয়েছেন।

জগবন্ধু কপি পড়িতেছেন, কিন্তু শ্রীম কথায় মগ্ন। পড়ায় একটু ত্রুটি হইলে তীব্র তিরস্কার করিতেছেন। বলিতেছেন, চার দিকে চোখ রাখতে হয়। এতে মন স্থির হলে ঈশ্বরেও স্থির হয়ে যাবে।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা, ৫ই আগষ্ট, ১৯২৪ খ্রীঃ
২০শে শ্রাবণ ১৩৩১ সাল, মঙ্গলবার, শুক্লা পঞ্চমী ৪৫।৩০ পল

পঞ্চদশ অধ্যায়

ঐ ছিদ্রটি অবতার

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। সিঁড়ির ঘর। চারতলা। মর্টন স্কুল। শ্রীম বসিয়া আছেন চেয়ারে দক্ষিণাস্য শ্রীমর ঘরের দরজার গায়ে। দরজার উত্তর দিকের পাটখানা শ্রীমর চেয়ারে সংলগ্ন। সাদা ধুতি পরা, গায়ে লংক্লথের পাঞ্জাবী, পায়ে চটি জুতা।

পরদা—বস্তুকে, ঈশ্বরকে ঢেকে দেয়। তাঁর কৃপায় এটা গেলে তবে দর্শন। আমি ঈশ্বরের দাস এই অহংকার—তিনি বলতেন। এই দাসের অহংকার নিয়ে সংসারে থাকতে বলেছিলেন। দয়াতেও অহংকার আছে। যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতাতে অহংকার ছিল। তাই শ্রীকৃষ্ণ তা-ও দূর করে দিয়েছিলেন।

তাই বিদ্যাসাগর মশায়কে বলেছিলেন পরোপকার ভাল বটে। কিন্তু তা-ও নিষ্কাম হয়ে করতে হয়, ঈশ্বরের কাজ জেনে করা, নিজে যন্ত্র মাত্র। অর্জুনকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্রীম প্রুফ দেখিতেছেন জগবন্ধু কপি ধরিয়াছেন। মাঝে মাঝে আবার কথা। ছোট জিতেনকে বলিলেন, আপনারা এক একটা পানতোয়া নিন্। এই বলিয়া নিজ হাতে ভক্তদের পানতোয়া প্রসাদ দিলেন। আর বলিলেন, এই ছানাবড়াগুলি অদ্বৈতাশ্রমে নিয়ে যান। এই কমলালেবুগুলিও নিন। সামনে বসিয়ে সাধুদের খাইয়ে আসবেন। বলবেন, উনি (শ্রীম) এইরূপ করতে বলে দিয়েছেন।

জগবন্ধু কপি পড়িতেছেন, কিন্তু শ্রীম কথায় মগ্ন। পড়ায় একটু ত্রুটি হইলে তীব্র তিরস্কার করিতেছেন। বলিতেছেন, চার দিকে চোখ রাখতে হয়। এতে মন স্থির হলে ঈশ্বরেও স্থির হয়ে যাবে।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা, ৫ই আগষ্ট, ১৯২৪ খ্রীঃ
২০শে শ্রাবণ ১৩৩১ সাল, মঙ্গলবার, শুক্লা পঞ্চমী ৪৫।৩০ পল

পঞ্চদশ অধ্যায়

ঐ ছিদ্রটি অবতার

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। সিঁড়ির ঘর। চারতলা। মর্টন স্কুল। শ্রীম বসিয়া আছেন চেয়ারে দক্ষিণাস্য শ্রীমর ঘরের দরজার গায়ে। দরজার উত্তর দিকের পাটখানা শ্রীমর চেয়ারে সংলগ্ন। সাদা ধুতি পরা, গায়ে লংক্লথের পাঞ্জাবী, পায়ে চটি জুতা।

শ্রীমর হাতে কথামৃতের প্রুফ—তৃতীয় ভাগের দ্বিতীয় প্রুফ আট থেকে চব্বিশ পৃষ্ঠা, বিদ্যাসাগর মিলন। ভক্তগণ বড় জিতেন, বলাই, মনোরঞ্জন, ছোট জিতেন, গদাধর, জগবন্ধু প্রভৃতি বসিয়া আছেন বেঞ্চিতে শ্রীমর সম্মুখে ও বাম হাতে। একটু পর আসিলেন ডাক্তার বক্সী, বিনয়, বড় অমূল্য ও ছোট অমূল্য।

কথামৃত ছাপা হইতেছে। খুব কাজের ভীড়। জগবন্ধু বাণী প্রেসে প্রুফ পাঠাইয়াছেন দুইবার, সকালে, আর একবার বিকালে, সঙ্গে কাগজসহ বেয়ারা দিলচান্দ।

একটি হ্যারিকেন ল্যান্টার্ণ শ্রীমর বাম হস্তে হাইবেঞ্চির উপরে। শ্রীমর বাম হাতে বেঞ্চির উপর বসিয়া আছেন জগবন্ধু। তাঁহার সম্মুখে হ্যারিকেন। এখন প্রুফ দেখা হইবে।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি)—পড়ুন। (ভক্তদের প্রতি)—শুনুন আপনারা বিদ্যাসাগরের গৃহে ঠাকুরের আগমন।

শ্রীমর হাতে কলম ও প্রুফ। দোয়াত সম্মুখে হাইবেঞ্চির উপর। জগবন্ধু কপি পড়িতেছেন।

শ্রীম (বিস্ময়ে ভক্তদের প্রতি)—আর কি পড়াশোনা ভাল লাগে—যে কাণ্ড দেখলাম জানালা দিয়ে! ঘরের জানালা দিয়ে দেখলাম কিনা একবার চেয়ে আকাশের দিকে। অবাক্ হয়ে যেতে হয়! এই অনন্তকাণ্ডের কোথায় পড়ে রয়েছি আমরা! অনন্তকাণ্ড তাঁর—অনন্ত সূর্য, অনন্ত চন্দ্র, অনন্ত satelites (উপগ্রহ)—সবই অনন্ত। আমরা ভাবছি, বুঝি আমাদের earth-টিই (পৃথিবীটিই) সব। না তা নয়। এই পৃথিবীর মত অনন্তকাণ্ড আছে। এ সকলের কর্তা তিনি। যার কথা এখানে (প্রুফে) আছে।—"ব্রহ্ম বিদ্যা অবিদ্যার পার·········ব্রহ্ম কি কেহ মুখে বলতে পারে নাই। ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হয় নাই।"

শ্রীম—এই যে কাণ্ড, এ বোঝে কার সাধ্য? তাই কেষ্টদাস পালকে তিরস্কার করেছিলেন ঠাকুর—'তোমার তো দেখছি রাঁড়ি পুতি বুদ্ধি।' ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মানুষের কর্তব্য

কি? উনি উত্তর করলেন, জগতের উপকার করা। তখন ঠাকুর ঐ কথা বলেছিলেন। 'রাঁড়িপুতি বুদ্ধি' মানে হীনবুদ্ধি। রাঁড়ির ছেলে অনেক কষ্টে মানুষ হয়—অনেক হীন উপায় অবলম্বন করে। তাই হীনবুদ্ধি।

তারপর বললেন, জগৎ কি এইটুকু যে তুমি তার উপকার করবে? যিনি এই অনন্তকাণ্ড রচনা করেছেন তিনি করবেন তার উপকার! তুমি নগণ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব, তুমি কে তার উপকার করবার? বরং বল, যার যার নিজের উপকার করা! তিনি সর্বভূতে রয়েছেন। তাদের সেবায় তোমার উপকার। উপকার নয়, সেবা। তাঁর এই জগৎলীলা বোঝা মানুষের সাধ্য নয়।

ঠাকুর এসেছিলেন বলে, এর একটু glimpse (আভাস) পাওয়া যাচ্ছে। তা না হলে সবই তো darkness (অজ্ঞানান্ধকার) ছিল! তিনি এসেছিলেন তাই একটু ছিদ্র অতি কষ্টে পাওয়া গেল। তা দিয়ে ওপারের কতক দেখা যাচ্ছে। সব অনন্ত। এপারে থেকে সব অন্ধকার।

ঠাকুর বলেছিলেন, একদিন মা দেখালেন প্রকাণ্ড একটা দেয়াল। ওপারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অতি কষ্টে নরুন দিয়ে একটু ছেঁদা করছি। আবার ঢেকে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে একবার দেখলুম অনেকটা ফাঁক হয়ে গেছে। সে ফাঁক দিয়ে ওপারের সব দেখলুম—অনন্ত-অপার-অসীম সব!

এ কথাটি বলেই ঠাকুর একটি ভক্তকে (শ্রীমকে) জিজ্ঞাসা করলেন, বল তো ঐ ছেঁদাটি কি? ভক্ত বললেন, ঐটি আপনি। শুনে খুব খুশি হলেন। মাঝে মাঝে test (পরীক্ষা) করতেন ভক্তদের—ধরতে পারছে কিনা তাঁর কথার অর্থ।

ঐ ছিদ্রটি অবতার। অবতারের ভিতর দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের সম্বন্ধে কতকটা জানতে পারে। অন্য উপায় নাই। সব মহামায়ার হাতে। সব তাঁর 'অণ্ডারে', ঠাকুর বলতেন। এ কি দুয়ে দুয়ে চার—হিসাব! না, ঐ বলবার উপায় নাই। Beyond human calculation (মানুষের হিসাব-বুদ্ধির বাইরে) সব।

যোগীরা তাঁর কৃপায় কতক দেখতে পান। তাও ছুঁই ছুঁই, ছুঁই না—প্রথম এরূপ হয়। ধরি ধরি—ধরতে পারছে না। যেন লণ্ঠনের ভিতর আলো। দেখা যাচ্ছে—ছোঁয়া যাচ্ছে না। মহামায়া যখন কৃপা করে পর্দা তুলে নেন তখন তাঁর দর্শন হয়, ছোঁয়া যায়। তখন কি হয় মুখে বলা যায় না। নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছলো আর ফিরে এলো না—খবর দিলে না। খবর দেবে কে? যে দেবে সে-ই যে নেই—individuality (জীবত্ব) merged (মিশে গেল) in the universality (শিবত্বে)। জীব শিব হয়ে গেল। গঙ্গা সাগরে মিশে গেল। গঙ্গা সাগর হয়ে গেল। এ অবস্থা থেকেও কারুকে কারুকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন লোকশিক্ষার জন্য। তাঁরাই কিছু কিছু আভাস দেন ঐ অবস্থার, বোবার স্বপ্ন দেখার আভাসের মত। আনন্দে গোঁ গোঁ করে। কিন্তু মহামায়া সব ভুলিয়ে দেন, জানতে দেন না।

শ্রীম বিভোর হইয়া গাহিতেছেন—ভুবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী।

ডাক্তার বক্সী—কি করলে আলোটা ছোঁয়া যায়?

শ্রীম—ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে। ঠাকুর বলেছিলেন, বালক যেমন কাঁদে মায়ের জন্য, তেমনি ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে পারলে হয়। মা ছাড়া আর কিছুই ভাল লাগে না। তখন তাঁর কৃপা হয়।

তাই তপস্যা চাই। এ কি আর debate-এর (তর্কযুদ্ধের) বিষয়, না table talk-এর (বৃথা বাক্-বিলাসের) বিষয়! যদি কেউ গোপীদের মত ভুলে যেতে পারে—বাড়ী-ঘর, পতি-পুত্র-কন্যা, মাতা-পিতা সব, কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে একেবারে পাগল হয়। নিজেরা .ষ স্ত্রীলোক তাও ভুলে গেছে। সব কৃষ্ণময়। এরূপ হলে হয়। হিসেবী বুদ্ধিটার লোপ হলে হয়।

তিনি কি এইটুকু যে তাঁকে ধরে ফেলবে? চৌদ্দ ভুবন ব৷েছেন ঋষিরা, এই সৃষ্টিটাকে। এটা একটা idea (ধারণামাত্র) দি৷েছেন তাঁরা। বস্তুতঃ তিনি অনন্ত, তাঁর সৃষ্টিটাও অনন্ত। ঐই ভাবটা বোঝাবার জন্য চৌদ্দ ভুবন বলেছেন। আজকাল সা৷েন্সর

সাহায্যেও এর কতকটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে। অনন্ত তারা, বলছে। এক একটা তারা সূর্য থেকেও বড়। তা হলেই হলো অনন্ত লোক। অনন্ত সূর্য, অনন্ত তারা, অনন্ত লোক। অর্জুন একটু দেখেই একেবারে 'বেপথুঃ' হয়ে পড়লেন, অর্থাৎ কাঁপতে লাগলেন। এমনতর ব্যাপার।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—অত বড় হলেও তিনি ভক্তদের জন্য সাকার হয়ে আসেন ও মানুষ-হয়ে আসেন। এই সেদিন চলে গেলেন। ঠাকুর সেই ঈশ্বর কিনা! তিনি নিজে বলেছিলেন, আমি সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। ইদানীং মানুষ হয়ে এসেছি তোমাদের কল্যাণের জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য। একি আর আমাদের কথা? তাঁর নিজ মুখের বাণী।

তিনি ধরা না দিলে ধরবার যো নাই। মানুষ হয়ে এসেছেন। তাও কত ভেল্কী চারদিকে! মানুষ তো একেবারে মানুষ— হাগা-মোতা কাঁদা-কাটার মানুষ। সাধারণ লোক তো এইগুলিই দেখে কিনা। এখানেও আবরণ, ভেল্কী। এরই ভেতর নিজের স্বরূপ অন্তরঙ্গদের মাঝে মাঝে একটু আধটু দেখাতেন। এ যেন পর্দাটা তুলে ঘরের ভেতরটা দেখানো। কিম্বা শাশুড়ীরা যেমন নতুন বউএর মুখ দেখায় ঘোমটাটা তুলে, তেমনি। শোক তাপ দুঃখ দারিদ্র্য দুর্বলতায় ঢেকে রাখেন নিজেকে।

শুধু তাঁর ইচ্ছাতেই তাঁকে জানা যায়। অন্য উপায় নাই। যদি কেউ জানতে চায় তবে তাঁর জন্য পাগল হোক—এই কথা ঠাকুর বলেছিলেন ঈশান মুখুজ্যেকে। অতি দুঃসাহস করে যদি কেউ এগোয় তা হলে হয়, মরণপণ করে—do or die.

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব। পুনরায় কথামৃত বর্ষণ করিতেছেন ঘরে। আর বাহিরে শ্রাবণের বারি বর্ষণ করিতেছে জলধর।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আবার চেয়ে দেখুন, কি কাণ্ডটা চলছে চারধারে। সর্বত্র শিবশক্তির মিলন। চারদিকে ঘিরে আছে তাঁর মায়াজাল। পুরুষ প্রকৃতি—সর্বত্র পুরুষ প্রকৃতি। এই অনন্ত কাণ্ড

রক্ষার ব্যবস্থাও তাঁরই। পিতামাতা, পুত্রকন্যা—এই যে relationship (সম্বন্ধ) সেও তিনি। নিজেই স্নেহ-রূপ ধারণ করে বেঁধে রেখেছেন মানুষের মন এতে। তবে জগতের রক্ষা হবে। এর বৃদ্ধির জন্য, কাম-রূপ ধারণ করেছেন—"ধর্ম্মাবিরুদ্ধ ভূতেষু কামোঽস্মি"। যেমন ছোলার ছুটো দানা তেমনি পুরুষ প্রকৃতির মিলন সর্বত্র।

শ্রীম গাহিতেছেন—শিবসঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা, মা।

বিপরীত রতাতুরা পদভরে কাঁপে ধরা,
উভয়ে পাগলের বাড়া লজ্জা ভয় আর মানে না।

বড় জিতেন (ত্রাসভরে)—সব অন্ধকার—nebulous!

শ্রীম (ভরসার সহিত)—না, তা বলা যায় না। তা হলে তো predication (বর্ণনার বিষয়) হয়ে পড়লো। কিন্তু তাঁর কোন predication (রূপ বর্ণনা) নাই। মুখে বলা যায় না তাঁর স্বরূপ। তবে এই মাত্র বলা চলে 'নেতি নেতি'—এ নয় এ নয়। এই এক দিক।

আর এক দিক অবতার—man-god (নরদেব)। অবতার আসেন গুটি কয়েক লোকের চৈতন্য করতে—select few (আঙ্গুলে গোনা) যায়। তাঁরই অধিক গরজ ওদের জন্য। একটা খেলা আর কি!

বৃষ্টি হলে সব বীজের উপরই জল পড়ে। নানা রকম গাছ হয় তাতে। তেমনি অবতার। তাঁর কৃপা-বারি সকলের উপরই পড়ে। কিন্তু যার যেমন সংস্কার, তেমনি হয় বাহ্য প্রকাশ। ভিন্ন ভিন্ন বীজ। 'বীজ' মানে সংস্কার—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান ইত্যাদি।

কিন্তু ঐ কয় জনের জন্য তাঁর বড় টান।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এই যে অনন্ত কাণ্ড—মানুষ তার কি বুঝবে? ধ্যান করতে হয় তো এই ধ্যান করা উচিত। সূর্যের lightএ planet, satellites (গ্রহ নক্ষত্রগুলি) চলছে। তাঁর lightএ (জ্যোতিতে) এই অনন্ত কাণ্ডটা চলছে—তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি)—ল্যাবরেটরিতে parallel glass (সামনা সামনি আয়না) থাকে। একটা গ্লাসের সামনে যদি একটা আলো রেখে দাও, দেখতে পাবে এই অনন্ত আলো reflected (প্রতিবিম্বিত) হচ্ছে। তেমনি এটা (জগৎ) একটা infinite (অনন্ত) series (কাণ্ড)। এই-ই শেষ, সে কথা বলবার জো নাই।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) এই সৃষ্টিটা রাখবার জন্য তাঁর কত সরঞ্জাম। পুরুষ-প্রকৃতির মিলন, এটা একটা প্রধান item (বিষয়)। জল হাওয়া অগ্নি, গ্রীষ্ম বর্ষাদি ঋতু ও শস্য next items (তার পরের বিষয়)। এর পর পিতামাতার স্নেহ। কত কি!

আবার দেখ শরীরের ভিতরের কাণ্ডটা। ওটাই কি কম বিস্ময়কর!

খবরের কাগজে পড়া গেল, একটা মেয়ের পেট থেকে সাতটা ছেলে হয় পর পর। Miniatureএ (ক্ষুদ্র ভাণ্ডে) যদি এই, তা' হলে যিনি জগতের মাতা, তাঁর পেট থেকে কেন এই সব হতে পারবে না—এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব ?

এ সব arguments by analogy (সাদৃশ্যসহায়ে যুক্তি)। এর জোর কিন্তু খুব কম নয়। এর যুক্তি most scientific (খুব) বিজ্ঞান-সম্মত)।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আমরা যে রাজরাজেশ্বরীর ছেলে, এটা ভাবতে হয়। 'বাপকা ব্যাটা সিপাহিকা ঘোড়া। বহুত না হয় তো থোড়া থোড়া॥' বাপ-মার সত্তা সন্তানে আসে। ঠাকুর তাই বলেছিলেন, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। আমরা কি কম—কত বড় ঘরের ছেলে! কি ভাবনা ভক্তদের—যারা তাঁকে চিন্তা করে! গায়ে ফুঁ দিয়ে চলুক তাঁর ভক্তরা।

শ্রীম গাহিতেছেন—রাজরাজেশ্বর দেখা দাও।

চরণে উৎসর্গ দান করিয়াছি এই প্রাণ
মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে শোধন করিয়ে লও॥ ইত্যাদি।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—একজন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিল— ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার? ঠাকুর বললেন, আমি মাকে দুই ভাবেই দেখেছি। এখনও সর্বদা দেখি। তিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, আবার তিনিই ভক্তের জন্য নানা রূপ ধারণ করেন। বললেন, কালীঘাটে মাকে দেখলাম ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলছেন, ফড়িং ধরছেন। আর একদিন দেখলাম কালীঘাটে আদি গঙ্গার উপর বেড়াচ্ছেন। আর একদিন বলেছিলেন, এই যে মা এসেছেন লাল-পেড়ে শাড়ি পরে। আবার কাপড়ের খুঁটে চাবির ছড়া বেঁধেছেন। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের ঘরে একঘর লোক বসা। কেশব সেনও ছিলেন, তখন বলেছিলেন এই কথা। আবার কথা কইছেন মায়ের সঙ্গে সকলের সামনে। এক পক্ষের কথা সকলে শুনছেন—ঠাকুরের কথা। মায়ের কথা কেবল ঠাকুর শুনছেন। একদিন বলছেন, মা মন্দিরে ওঠানামা করছেন, আলুথালু কেশ, পায়ে নূপুর ঝুনঝুন করছে। আর একদিন কাশীপুর বাগানে বলেছিলেন, মাকে আজ দেখলুম বীণা বাজাচ্ছেন। সাধনের সময় মায়ের নিরাকার রূপে মগ্ন হয়ে ঠাকুর একটানা ছয় মাস ছিলেন।

ঠাকুরের এই সব declarations (মহাবাণী) রয়েছে। এতে আর কিন্তু কি? যারা বিশ্বাস করবে তাদের হয়ে যাবে, যারা এখন ধরতে পারবে না তাদের কোন জন্মেও হবে না। তারা পেছনে পড়ে যাবে। এখন বড্ড chance (সুযোগ)। সবেমাত্র এসেছেন, সব ছড়ান রয়েছে হেথায় সেথায়। তাঁর কথার ধ্বনি এখনও কানে বাজছে। আসর এই সবে ভাঙ্গলো। হৈ হৈ আওয়াজ এখনও সম্পূর্ণ মেটে নি। খুব chance (সুযোগ), গা ঢেলে দিলেই হলো। অনুকূল পবনে টেনে নিয়ে যাবে নৌকো। আর বিচার টিচার নয়। এখন বিশ্বাস। তারপর কাজ। ঠাকুর যা বলে গেছেন তার একটি কথার অর্থ সারা জীবন তপস্যা করলে তবে বোঝা যায়। একি নভেল নাটক যে হড় হড় করে পড়ে গেলাম।

শ্রীম পুনরায় ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। আবার কথামৃত বর্ষণ করিতেছেন।

শ্রীম (ডাক্তার বক্সীর প্রতি)—এই যে অনন্ত কাণ্ড ঈশ্বরের, তা চিন্তা করবার অবসর কোথায় লোকের? সর্বদা পেটের চিন্তায় ব্যস্ত। তাই, যাদের আছে, পেটের ভাবনা নাই যাদের, এমনতর লোক দেখলে ঠাকুর খুব আহ্লাদ করতেন। যারা সর্বদা পেটের চিন্তায় ব্যস্ত তাদের দেখলে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। যদি পেটের চিন্তাতেই সব সময় যায় তা হলে ঈশ্বরচিন্তা করবে কখন?

তিনি কি তাদের তাচ্ছিল্য করছেন, না নিন্দা করছেন? তা নয়। একটা আদর্শ দেখাতে এসেছেন, আবার সময় অল্প তাই বলছেন ঐ কথা। ঠাকুর চব্বিশ ঘণ্টা ব্যাকুল ঈশ্বরের জন্য। তাঁর এই অবস্থা দেখে লোক শিখবে ভগবানের জন্য ব্যাকুল হতে, এই জন্য তাঁর আগমন। ঈশ্বরকে কি করে ভালবাসতে হয় তাই দেখাতে এসেছেন তিনি। তিনি কা'কে নিন্দা করবেন? সবই যে তিনি। জগতের সঙ্গে এক হয়ে আছেন। মাঝিকে নৌকোতে একজন মেরেছে, নিজের পিঠে তার দাগ লেগে গেছে। আর যন্ত্রণায় উঁ উঁ করছেন।

জীবের অন্নবস্ত্রের কষ্ট দেখে মায়ের কাছে কাঁদতেন ঠাকুর। বলতেন, অন্নবস্ত্রের চিন্তা থাকলে মন বসে না ভগবানে। তাই ভক্তদের কারো কর্ম না থাকলে অপর ভক্তদের বলতেন কর্ম সংগ্রহ করে দিতে।

একটা highest ideal (শ্রেষ্ঠ আদর্শ) দেখাতে এসেছিলেন। তাড়াতাড়ি জন কয়েক লোককে সেটি দেখিয়ে তৈরী করে দিয়ে চলে গেলেন। দুঃখ দুর্দশা দূর করার উপায় ঈশ্বরদর্শন বা নিজের স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করা। মানুষ আনন্দময়ীর সন্তান, এটা জানতে পারলে সব দুঃখ দূর হয়। একটা শরীরের দুঃখ তো অল্প। কিন্তু জন্মমরণ-চক্রের দুঃখ অনন্ত। সে বড় দুঃখটা দূরের পথ দেখান তাঁর প্রধান কাজ। তাই দেখিয়ে চলে গেছেন। অন্নবস্ত্রের দুঃখের উপায়

দেখিয়েছেন আরও নীচু শ্রেণীর লোকের ভিতর দিয়ে। এটা deal (ব্যবস্থা) করবে অন্নবস্ত্রের দুঃখ দূর করার। দয়া টয়া এদের ভিতর প্রকাশিত হবে। কিন্তু ঠাকুরের আসার প্রধান কাজ অনন্ত কালের জন্য দুঃখ দূর করে সুখ শান্তি আনন্দের বিধান করা। এ যেন ঠেলে ঠুলে ভক্তদের জগতের বাইরে নিয়ে নিজের স্বরূপ দেখিয়ে, তাদের আচার্য বানিয়ে, বীর বানিয়ে, ফস্ করে চলে গেলেন। তারা বুঝেছে, আগে ঈশ্বর পরে জগৎ।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি)—কি করবে মানুষ! দেহটা যে রয়েছে! দেহটা আছে বলেই এই সব। যেখানে individuality (জীবত্ব), সেখানেই এই কথা। এই জীবত্বটা, আমিত্বটাই জগৎ ব্যাপার চালাবার প্রধান force (শক্তি)। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সকলেরই এই এক কথা। জগতে থাকলেই দুঃখকষ্ট আছে। দাদারও ফলার। Individuality (জীবত্ব) থাকলেই যত গণ্ডগোল।

কাঁচের আলমারীর ভেতর জিনিস আছে। সব দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ছোঁয়া যাচ্ছে না। মিউজিয়ামে ছেলেরা হাত দিয়ে ধরতে যায়, কিন্তু ধরতে পারে না। মাঝে কাঁচ রয়েছে যে। তেমনি অহংকারটা আবরণ। এটাই জীবত্ব। এটা তাঁর কৃপায় সরে গেলেই জীব শিব। তখন সৃষ্টি-ফিষ্টি কিছুই নাই। যা থাকে তা মুখে বলা যায় না।

ঠাকুরের প্রধান চেষ্টাই ছিল সৃষ্টির ওপারের জিনিসটার ওপর মানুষের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়া। কতকগুলিকে নিজেই ঐ দৃষ্টি দিয়ে ঐ জিনিসটার সঙ্গে মিলন করে দিয়ে গেছেন। অপরদেরও বলেছেন, চেষ্টা কর ধৈর্য ধরে জগৎ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে, জগতের যে কর্তা, তাঁর সঙ্গে মিলনের। তার জন্য পথই দেখিয়ে গেছেন। অহংকারটা ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে সংসারে বাস কর। নিজের ঘরে থাক, নিজে ঈশ্বরের দাসী হয়ে, যেমন বড় ঘরে থাকে দাসী। শরীর ধারণ করলে অহংকার থাকবেই। আর তাতে কাজ করতে হবে। কাজ কর, তার ফলভোগ নিও না নিজে—ঈশ্বরকে দিয়ে দাও।

দাসীর যেমন অন্নবস্ত্রের অধিকার থাকে, তুমিও কেবল তাই নাও। একেই বলে নিষ্কাম কর্ম। এতে অহংকারও ক্রমশঃ ক্ষয় হয়। অথচ অহংকারের-দ্বারা কৃতকর্মের ফলভোগের জন্য অন্য জন্ম নিতে হবে না। আর এ জন্মেও আনন্দে থাকবে।

দেহবুদ্ধি আছে বলেই তাঁকে দর্শন করতে পারে না। এরই নাম অহংকার। তাঁর সঙ্গে যুক্ত করে বুদ্ধি দিয়ে, অহংকার নিয়ে থাকে। ক্রমে মনটা শুদ্ধ হয়ে যায় অনেকটা। তখনই আলোটা দেখতে পায়। কিন্তু কাঁচ স্বচ্ছ আবরণ থাকে অর্থাৎ মনবুদ্ধি চিত্ত অহংকার। এটা শুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মূল অবিদ্যার লেশ থাকে। তাই কাঁচের ভেতরের আলোটা ছুঁতে পারে না। ধরি ধরি, ধরতে পারছে না। যোগীদের অমন একটা অবস্থা হয়। এ যেন ঘরের চৌকাঠের কাছে বসে থাকা। ঘরের ভেতরের আনন্দের ছটা বাইরে আসছে। কিন্তু দরজা বন্ধ ভেতর থেকে। এটা ঈশ্বরের অধীন—মূল অবিদ্যা নাশ। মানুষ অতটাই করতে পারে চেষ্টা করে। অতটা এগুলেই হয়ে গেল প্রায়। ওখানে বসে কাঁদ, কখনও হাস, নাচ, আনন্দ কর। এই সব কথা ঠাকুর ভক্তদের জন্য রেখে গেছেন।

শ্রীম (যুবকের প্রতি)—ঠাকুরকে ধরতে পারলে আর ভয় নাই। নিজে বলেছেন কিনা—'আমার চিন্তা করলেই হবে।' কিন্তু তাঁকে ধরা কঠিন। কোন ঐশ্বর্য নাই। একেবারে ঢেকে এসেছেন।

অনেকে বিবেকানন্দকে বড় বলতো কিনা। তারা বলতো, 'অত বড় লোক চেলা, তাই রামকৃষ্ণের নাম।' ঠাকুর দীনভাবে থাকতেন। ওরা তাঁকে ধরতে পারতো না। ঠাকুর সকলকেই মান দিতেন। কেশব সেনকে বলেছিলেন, বাহাদুরী কাঠ তোমরা। আমরা হাবাতে কাঠ। ওঁর ভক্তরা মনে করলো, রামকৃষ্ণ ছোট, কেশব সেন বড়। তাই ব্রাহ্মসমাজের লোক নজীর দিত ঠাকুরের এই কথা। বলতো, এই দেখ, তিনিই বলেছেন নিজ মুখে, আমরা হাবাতে কাঠ আর কেশব বাহাদুরী কাঠ। (সকলের হাস্য)।

আবার দেখ, বিদ্যাসাগরকে বলে এলেন, তোমরা জাহাজ আর আমরা জেলে ডিঙ্গি। নরেন্দ্রকে বলেছিলেন, 'শ্বশুর ঘর'। এই সব কথা ব্রাহ্মসমাজের এরা আলোচনা করতো। বুঝতে পারে নি। তাই উল্টা অর্থ করতো।

ঠাকুর ছিলেন 'নির্মানমোহা'। তাঁর মানের আকাঙ্ক্ষা নাই, মোহও নাই। তিনি মান দিয়ে ওদের বড় করতেন। তা দেখে তাদের ভক্তরাও তাদের আরও মান্য করবে। ভাববে, 'পরমহংস মশায়ই' যখন অত সম্মান করছেন, তারা নিশ্চয়ই খুব বড়! বাপ যেমন ছেলেকে যা চায় তাই দেয়, ঠাকুরও তেমনি তাদের মান দিতেন। কখনও ছেলে বড় হলে বাপও ছেলেকে মান দেয়। এও তেমনি। কিন্তু তাদের followers (শিষ্যরা) তাঁর কথার অর্থ বুঝতে পারে নি।

এই ঠাকুর-family-র (পরিবারের) একজন লোক, নাম যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিবেকানন্দের কাছে লোক পাঠিয়েছিল এই বলে, তুমি নিজেই তো বড়—তুমি আবার 'রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ' করছো কেন? ও সব ছেড়ে দাও। আমরা তোমার leadership (নেতৃত্ব) মানবো। স্বামীজী শুনে হাসলেন। ওঁদের দোষ কি বল? কি করে বুঝবে ঠাকুরকে? প্রকৃতি বিভিন্ন। সত্ত্ব রজঃ তম—তিন রকম প্রকৃতি আছে। অধিকাংশ লোকই রজঃপ্রধান। তারাই বাইরে বাইরে দেখে। ভেতর দেখতে পায় না, তাই উল্টো বোঝে। যেমনি প্রকৃতি তেমনি আচরণ, তেমনি কথা।

বিবেকানন্দ Sages of India (ভারতীয় মহাপুরুষগণ) নামে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন মাদ্রাজে। তাতে রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, মাধব, নানক, চৈতন্য, এ সকলের নাম করে শেষে বললেন, আমি যে সকল মহাপুরুষগণের নাম করলাম এঁদের summation (সমষ্টি) হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

Highest idealকে (সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শকে) কি সকলে চিনতে পারে? যাঁরা চিনতে পারেন, বুঝতে হবে তাঁরা favoured few

(বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত জনকয়েক লোক)। তাই আমরা এদের অত ভালবাসি যারা তাঁকে সর্বদা চিন্তা করে।

গেরুয়া তো অনেকেই পরছে। কিন্তু সেই Highest idealকে (সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শকে) চিন্তা করে কয়জন? (বেলুড়) মঠের সাধুরা তাঁকে সর্বদা চিন্তা করেন। তাই তাঁদের সঙ্গ করতে ইচ্ছা হয়। তাই তাঁদের সংবাদের জন্য মন অত ব্যাকুল হয়।

বিবেকানন্দ বলেছিলেন, যদি কিছু সত্য বলে থাকি আমি, তা শ্রীরামকৃষ্ণের। অন্য সব কথা আমার নিজের। আবার বলেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গরাই কতকটা জানতে পেরেছেন তাঁকে, যতটা জানিয়েছেন যাঁকে। অনন্ত ভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণ। তার ইতি হয় না।

বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'I or anyone of his disciples, living for millions of years, cannot understand a millionth part of what he was.' আমি অথবা তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ যদি লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে তাঁর স্বরূপ জানবার চেষ্টা করি, তা হলেও তাঁর স্বরূপের লক্ষ লক্ষ ভাগের এক ভাগও জানতে পারবো না।

আবার বলেছিলেন, 'দাস দোঁহাকার জনমে জনমে।' আবার আরো বলেছিলেন, 'Out of a handful of dust lakhs of Vivekananda can be made by this man, Sri Ramakrishna'—এক মুষ্টি ধূলো থেকে লক্ষ লক্ষ বিবেকানন্দ সৃষ্টি করতে পারেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ।

আহা, আরতি আর স্তবে কি সব কথা বলেছেন, শাস্ত্রেও অমন expression (বর্ণনা) পাওয়া যায় না অবতারের সম্বন্ধে। বলেছেন, 'মর্ত্যামৃতং তব পদম্ মরণোর্ম্মিনাশম্। তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো॥' আবার 'খণ্ডন ভববন্ধন', 'নির্গুণ গুণময়', আবার বলছেন, 'জগদেকগম্য'। আর যে তাঁর শ্রীচরণে আশ্রয় নেয় তার কাছে, 'ভব গোষ্পদবারি যথায়', অর্থাৎ এই সংসারসমুদ্র গরুর পদচিহ্নে স্থিত গণ্ডুষমাত্র জলের ন্যায় তুচ্ছ ও সামান্য প্রতীত হয়।

আহা কি গুরুভক্তি! বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া কিছুই জানতেন না।

শ্রীম নীরব। আবার বিড় বিড় করিয়া নিজে নিজে কি যেন বলিতেছেন।

শ্রীম (স্বগত)—যা, সব গোল হয়ে গেল মা। কেন আর বিচার করাও মা, তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও মা!

আবার নীরব। ক্ষণকাল পর বড় অমূল্যকে বলিতেছেন, গান না একটা গান।

বড় অমূল্য গাহিতেছেন—

ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম।
অপূর্ব শোভন ভব জলধির পারে, জ্যোতির্ময়।
শোকতাপিত জন সবে চল সকল দুঃখ হবে মোচন,
শান্তি পাইবে হৃদয় মাঝে প্রেম জাগিবে অন্তরে ॥ ইত্যাদি।

গানটি আবার শ্রীমর ইচ্ছায় সকলে সমকণ্ঠে গাহিতেছেন। গান সমাপ্ত হইল।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ব্যাপার দেখে মনে হয়, দাদারও ফলার। হাঁ, মানবলীলার একটি গান গান, যেমন—'সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে।' এটি ঠাকুর নিজে গাইতেন।

বড় অমূল্য—এটা গাইতে পারবো না।

শ্রীম—আচ্ছা, যা জানেন তাই গান।

অমূল্য গাহিতেছেন—সুন্দর লালা নন্দদুলাল গোকুল কি রহনেবালা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—সর্বদা সজাগ থাকতে হয়, যেমন সঙ্গিনধারী সেপাই। আর পাল তুলে রাখতে হয়। কখন অনুকূল পবন বইবে, এই আশায়। 'পাল তোলা' মানে জপ ধ্যান করা, ব্যাকুল হয়ে কাঁদা। ব্যাকুলতার পরই 'সূর্যোদয়'। ব্যাকুল হয় কখন? যখন সমস্ত ভোগবাসনা ত্যাগ হয়ে যায়।

ঠাকুর বলেছিলেন, ঠিক হয়ে বসে থাক যে যেখানে আছ।

আর বসে বসে কাঁদ। আমি ঠিক জায়গায় নিয়ে যাব। বাইবেলেও আছে এই কথা। সজাগ থাক, কখন বর এসে যায়।

আহা, কি কথা! শুনলেই মন ওপারে চলে যায়।

এখন রাত্রি দশটা।

কলিকাতা, ৬ই আগষ্ট, ১৯২৭ খ্রীঃ
২১শে শ্রাবণ, ১৩৩৯ সাল, বুধবার শুক্লা ষষ্ঠী

ষোড়শ অধ্যায়

কাজে থাকবে দৃঢ়তা, শ্রদ্ধা ও শান্তি

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। সকাল আটটা। শ্রাবণের বর্ষণ মাঝে মাঝে হইতেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

আজ ৭ই আগষ্ট ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ। ২২শে শ্রাবণ ১৩৩৯ সাল। বৃহস্পতিবার, শুক্লা সপ্তমী ৩৫।৩৬ পল।

শ্রীম ছাদে অন্তেবাসীর টিনের ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। হাতে কথামৃতের তৃতীয় ভাগের কপি, ৪৯ পৃষ্ঠা হইতে ১২০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। ছাপার খুব ভীড় পড়িয়াছে। অন্তেবাসীর সহিত কথা হইতেছে।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—দিলচান বেয়ারাকে দিয়ে এই কপি শীঘ্র পাঠিয়ে দিন প্রেসে। আর খুব যত্ন করে প্যাক করে পাঠাবেন, তবে ওরাও সব জিনিসে যত্ন নেবে। মানুষের মন উড়ো উড়ো থাকে। যেখানে নিজের স্বার্থ আছে কেবল সেখানে মন থাকে। স্বার্থের শেষ কথা, হয় কামিনী নয়তো কাঞ্চন—টাকা-কড়ি, সুনাম। এ পাবার আশা না থাকলে কাজে মনোযোগ হয় না। যাদের এ ছাড়াও মনোযোগ হয় তাদেরই বলে যোগী। তারা দেখে সব কাজই ভগবানের, তাই সবেতে তাদের মনোযোগ। তাদের কাছে কাজের

ছোট বড় নাই। তাদের দৃষ্টি প্রথমে qualityতে (গুণে), quantity (পরিমাণ) পরে। এরূপ লোক খুব কম। তা হলেও তারাই জগতের আদর্শ। তাদের কাজের শুধু একটিই আদর্শ— ভগবানের কৃপা লাভ। মানুষ কাজ না করে থাকতে পারে না। তাই তারাও অপরের মত সর্বদা কাজ করছে! কিন্তু benefit (লাভ) নিজে নেবে না। তাদের এক উদ্দেশ্য কিসে ভগবানলাভ হয়। তাই নিষ্কামভাবে কাজ করছে। তাদের বলে কর্মযোগী।

একজনের যত্ন ও মনোযোগ অন্যে সঞ্চারিত হয়। প্রথমে না হলেও চেষ্টা করতে থাকলে পরে হবেই হবে। এ দিয়েও সেবা করা যায়। যাতে অপরের ভাল হয় সেটা নিষ্কাম হয়ে করলেই সেবা করা হলো। তাতে নিজের কল্যাণ ভগবানলাভ। অপরের কল্যাণ, তারা better men (ভাল মানুষ) হয়। তা হলেই সমাজ ভাল হয়। এই সমাজই জগতের অপর লোকদের উপরও influence (প্রভাব বিস্তার) করবে। অপর লোকও ক্রমশঃ ভাল হবে।

তাই ভক্তদের জীবন অমূল্য। তাদের সব কাজে দৃষ্টি ভগবানলাভে। তাই, কাজই তপস্যা। কাজে ঢিলা হলে আর হলো না। মন ঈশ্বরে বসবে না তা হলে। কাজ করেও আনন্দলাভ হবে না। নিষ্কাম কাজ করে মনে আনন্দ হলেই বোঝা গেল কাজ ঠিক হয়েছে।

ভক্তদের জীবন সর্বদা জগতের শিক্ষার জন্য। ঠাকুর এসে এ সব শিক্ষা দিয়ে গেছেন নিজে হাতে ধরে।

কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে তখন মনে করতে হয়, ঈশ্বরের জন্য করছি। তিনি নিজে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তা হলে বিরক্তি ও ক্লান্তি তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায়।

যাদের উদ্দেশ্য ভগবানলাভ তারা অক্লান্ত হয়ে সব কাজ করবে। কাজই বল, আর জপ ধ্যানই বল, সবই কাজ। এ সবই করবে সেবাবুদ্ধিতে। এইরূপ রুচিসম্পন্ন সেবকদের কাছে শিখবে প্রবর্তকগণ। তেমনি জপ ধ্যানে অরুচি হলেও, যাদের রুচি হয়েছে,

এমন লোকদের কাছে যাওয়া আসা করতে হয় খুব যত্ন করে। তা হলে রুচি ফিরে আসবে।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—প্রেসের লোকেরা, মনে কর, দেরী টেরী করে, কাজে অবহেলা। আমরা যদি ঠিক্ সময়ে সব দিই আর যত্ন করে শ্রদ্ধার সঙ্গে সব দেখে শুনে দিই প্রুফ, তবে তাদের উপর একটা প্রভাব পড়বে। এতে তাদেরও একটা উপকার হবে আর আমাদের কাজও হয়ে যাবে।

ভক্তের সর্বদা যোগ—শয়নে, স্বপনে, নিরবিচ্ছিন্ন তৈল-ধারার মত যোগ।

বেশী কাজের চাপে প্রবর্তকদের আবার অনেক সময় ঈশ্বরকে ভুল হয়ে যায়। কাজকেই ভুল করে ঈশ্বর মনে করে বসে। তখন সব ছেড়ে দিয়ে ধ্যান ভজন করতে হয়। তখন মনকে শানিয়ে নেওয়া, যেমন ক্ষুরকে শানায়।

শিক্ষার অভাব নাই, সারাজীবন শিক্ষা। তাইতো ঠাকুর বলতেন, সখী গো সখী, যতকাল বাঁচি ততকাল শিখি। সমাধিস্থ হয়ে থাকতে পারলে আর এ সবের দরকার নাই। তা যদি না পার, তবে সব কাজ তাঁর বলে কর।

অপরাহ্ণ চারটা। শ্রীম সিঁড়ির ঘরে বসিয়া আছেন, চেয়ারে দক্ষিণাস্য। শ্রীমর সামনে বেঞ্চিতে বসা, জগবন্ধু, মনোরঞ্জন প্রভৃতি। একটি ভক্ত সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছেন। মুখে বসন্তের দাগ। উপরে উঠিয়াই ভূলুণ্ঠিত হইয়া শ্রীমর পাদমূলে প্রণাম করিতেছেন। মুখে আনন্দের ছটা, নয়নদ্বয় প্রেমাশ্রুপূর্ণ। গদগদচিত্তে কথা কহিতে গিয়া কণ্ঠরোধ হইয়া যাইতেছে। আবেগভরে বলিতেছেন, 'আজ আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হলো'।

ভক্তটি শ্রীহট্টবাসী। নাম রজনী, বয়স চল্লিশ। প্রকৃতি নরম। আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে বলিতেছেন, 'কথামৃত পড়ে আপনাকে দর্শনের ইচ্ছা খুব প্রবল হয়। কিন্তু সুযোগ হয়ে ওঠে না। অনেক চেষ্টার ফলে আজ আমার সে বাসনা পূর্ণ হলো।'

ভক্তটি ব্রহ্মচারী। স্বভাবটি বেশ মিষ্ট। শ্রীম আদর করিয়া তাঁহাকে পাশে বেঞ্চিতে বসাইলেন। মনে হয় তাঁহার ভিতরটা খসিয়া গিয়াছে—অন্তরে সন্ন্যাস। শ্রীম তাঁহার সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (রজনীর প্রতি)—ঠাকুরকে চিন্তা করলে আপনি ভিতর ফাঁকা হয়ে যায়। ঠাকুর অবতার কিনা। তাই তাঁকে চিন্তা করলে ঈশ্বরের চিন্তা করা হল। তাঁকে যাদের ভাল লাগবে বুঝতে হবে তারা বড় ঘরের লোক। সংসারের দৃষ্টিতে তারা নগণ্য হলেও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তারা অতি বড়। ঠাকুর বলেছিলেন, যাদের শেষ জন্ম তাদের এখানে আসতে হবে। এ কথা এখনও সত্য। তিনি তো রয়েছেনই, মাত্র শরীরটা গেছে। শুনতে পাই ভক্তরা কেউ কেউ আজও তাঁকে দর্শন করছেন। তা ছাড়া, তাঁর কথা মূর্তিপরিগ্রহ করেছে। সর্বস্ব ত্যাগ করে ঐ সব মুর্তি বেলুড় মঠে থাকেন। যারা এঁদের ভালবাসবে, বুঝতে হবে তারা তাঁকে ভালবাসে। আবার যারা তাঁকে ভালবাসবে, তারা এঁদেরও ভালবাসবে। যে যাকে ভালবাসে সে তার সত্তা পায়।

ঠাকুরের কাছে আছে কি? ব্যাকুলতা। ঈশ্বরের জন্য এমন ব্যাকুলতা কেউ কখনও দেখে নি। যারা তাঁর জীবনের এ সব ঘটনা জেনে শুনেও তাঁকে ভালবাসে, বুঝতে হবে তাদের ভিতরও ব্যাকুলতা আছে। জপ ধ্যান তপস্যা তো কত লোক করছে। কিন্তু তাদের ঈশ্বরদর্শন হচ্ছে না কেন? এর উত্তর, ব্যাকুলতা নাই বলে। এই জন্মেই তাঁকে দর্শন করবো। তাঁর দর্শন না হলে এই শরীরধারণ করা বৃথা। যেমন শিশু মায়ের জন্য ব্যাকুল, এইরূপ যারা ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল, তারাই ঠাকুরকে ভালবাসবে।

ব্যাকুলতা হয় না কেন? সংসারের ভোগ এখনও বাকী আছে। খণ্ড পদার্থের জন্য, জাগতিক ভোগের জন্য মন লালায়িত, তাই ব্যাকুলতা হয় না সত্যিকার ব্যাকুলতা আসে ভোগান্তে। ভোগের বস্তু সংসারে বা স্বর্গে-ফর্গে কোথাও কিছুই নাই। যখন এই জ্ঞান

হয়, তখন ব্রহ্মানন্দ ভোগের জন্য তৃষ্ণা হয়। তখন কেবল ঈশ্বরের নির্মল আনন্দ চায়, যেমন চাতক বৃষ্টির ফটিক জল চায়। এই ব্যাকুলতার প্রতিমূর্তি ঠাকুর।

বাইরের সন্ন্যাস তো সাইনবোর্ড মাত্র। ভিতরের সন্ন্যাসই ঠিক। ভিতরের সন্ন্যাস মানে এক ঈশ্বরের আনন্দের জন্য ব্যাকুল। জগতের বস্তুসাধ্য আনন্দের বাসনা মন থেকে আপনি খসে পড়ছে। এই অবস্থাই সন্ন্যাস। ঠাকুরকে আন্তরিক যারা ভালবাসে, বুঝতে হবে তাদের ভিতরে সন্ন্যাস হয়ে গেছে। তাঁর ইচ্ছা হলে কারুকে আবার বাইরের সন্ন্যাসও দেন।

এখন সন্ধ্যা। ভৃত্য ছাদে হ্যারিকেন রাখিয়া গিয়াছে। শ্রীম সর্ব কর্ম পরিত্যাগ করিয়া ধ্যান করিতেছেন চেয়ারে বসিয়া উত্তরাস্য। ছোট জিতেন, ডাক্তার বক্সী, বিনয়, বলাই, মোটা সুধীর, গদাধর, ছোট অমূল্য, শান্তি, জগবন্ধু প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীমর সম্মুখে, দক্ষিণে ও বামে বেঞ্চিতে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন।

হেমচন্দ্র সরকার আসিয়া বসিয়া আছেন। ধ্যানান্তে শ্রীম তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সিঁড়ির ঘরে গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতেছেন। হেম সরকার কলেজের ইনস্‌পেক্টার, শ্রীমর প্রাক্তন ছাত্র ও ভক্ত। কথা শেষ হইলে হেমবাবু বিদায় লইলেন। শ্রীম পুনরায় ছাদে আসিয়া বসিয়াছেন। বড় জিতেনের প্রবেশ।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—আসুন আসুন, আপনি এলেই আমরা ideal worldএ (ভাবরাজ্যে) চলে যাই। নচেৎ নিচে পড়ে থাকি।

বড় জিতেন (যুক্ত করে)—করে দিন না মশায় ওটা। মনটা idealএ (ঈশ্বরে) মগ্ন হয়ে যাক।

শ্রীম (মুচকি হাস্যে)—তাহলে ওদের কি দশা হবে? কেশব সেনও ও-কথা বলেছিলেন। ঠাকুর চিকের ভিতর যারা আছে অর্থাৎ মেয়েরা, তাদের দেখিয়ে বলেছিলেন এই কথা। ওখানে ডুবে থাকলে এটা চলে কি করে? সংসার দেখবে কে? তিনি একটা

পাশ দিয়ে রেখে দেন সংসারে। যদি অসহ্য হয়, তবে কাঁদ তাঁর কাছে, apply (আবেদন) কর। তা হলে পাশ কেটে দেবেন। কারুকে কারুকে ছেড়ে দেন, যাদের দিয়ে লোকশিক্ষা দেবেন, তাদের। কারুকে আবার লোকশিক্ষার জন্য ঘরেও রাখেন—অন্তরে পূর্ণ সন্ন্যাস দিয়ে।

ভক্তদের বলেছিলেন ঠাকুর, বড় ঘরের দাসীর মত থাক। দাসী মনিবের ঘরকে আপনার ঘরের মত দেখে। কিন্তু জানে, এটা আমার নয়। আমার ঘর গ্রামে। সেখানে আমার ছেলেমেয়ে থাকে। অথচ দিনরাত কাজ করছে অবিরাম। কখন ছুটি হবে, কখন গিয়ে ছেলেদের দেখবে—অন্তরে জাগ্রত সদা এই ভাবনা। তেমনি ভক্তদের সংসারে থাকতে বলে গেছেন ঠাকুর।

সকলের সেবা করা ঈশ্বরের রূপ জেনে। তা হলে এটাই হয়ে পড়ে মুক্তির হেতু। যাতে বন্ধন তাতেই মুক্তি, মোড় ফিরিয়ে দিলে। যে-মাটিতে পড়ে যায়, সেই মাটি ধরেই আবার ওঠে লোক।

দুটোই পথ—idealise the real (জগৎকে ঈশ্বর-ভাবনা দিয়ে মণ্ডিত কর), এই একটা। আর একটা realise the ideal—ঈশ্বরকে সাক্ষাৎকার কর সত্যিকার রূপে। একটা পথে 'নেতি নেতি' করে—অর্থাৎ ঈশ্বর সংসারের কোন দ্রব্যই নয়, মনবুদ্ধি চিত্ত অহংকারও নয়। আর একটা পথ ইতি ইতি। অর্থাৎ সবই ঈশ্বর। ওটা destructive process (ধ্বংসাত্মক পথ)। আর একটা constructive process (সংগঠনমূলক পথ)। ঈশ্বরই সব হয়ে রয়েছেন—স্ত্রী পুত্র কন্যা এই ভাবনার সঙ্গে তাঁরই সেবা করা সকলের ভেতর।

একজন লোকের প্রবেশ। তিনি ছোট অমূল্যর সঙ্গে কথা কহিয়া বিদায় লইলেন। একজন ভদ্রলোক ছোট অমূল্যকে অনুরোধ জানাইয়াছেন, তিনি গিয়া যেন তাঁহার সঙ্গে দেখা করেন।

শ্রীম (ছোট অমূল্যর প্রতি)—তা হলে এক্ষুণি উঠুন। দেখা করে আসুন। কাজ সেরে রাখতে হয়। যোগীরা কাজ সেরে

ফেলে দেখেছি। তবে নিশ্চিন্তি। মনে অন্য চিন্তা রাখবে না কিনা ঈশ্বরচিন্তা ছাড়া।

একবার মনে জমতে আরম্ভ হলে আর রক্ষা নাই। পাহাড় হয়ে যায় মনে। যোগীদের মন যেন clean slate (পরিষ্কার স্লেট)। শুধু ভগবান কিসে দর্শন হয়—এই একটি মাত্র ভাবনা মনে। মেয়েরা যেমন সেজেগুজে বসে থাকে বরের প্রত্যাশায়, তেমনি যোগীদের ভাব।

যোগী মানে, যে প্রতিজ্ঞা করেছে কেবল ঈশ্বরকে চাই, অন্য কিছুই চাই না। যেমন চাতক বৃষ্টির ফটিক জল চায়, অন্য কিছু নেবে না, মরণপণ।

একজন ভক্ত—আমাদের কি ঐ অবস্থা হবে কখনও ?

শ্রীম—কেন হবে না ? ঠাকুরের ভক্তরা সব ঐ—যোগী। তারা ঘরেও থাকতে পারে কিম্বা সাধু হয়ে বের হয়েও যেতে পারে। তাঁদের দেখতেই মানুষ, কিন্তু ভিতরটা অন্য রকম। এরা সব চাতকের জাত। ঠাকুরের কথা যাদের শুনতে কইতে ভাল লাগে, তারা উঁচু ঘরের লোক।

গুপ্ত যোগী, যারা সংসারে আছে। জগৎ কি তাদের দাম দিতে পারে ? Brinjal-sellers (বেগুনের ব্যাপারী) যে সব লোক। জহুরী তাদের চেনে। ঠাকুর তাই ভক্তদের জন্য অত পাগল হতেন। মার কাছে কেঁদে কেঁদে বলতেন, মা এনে দাও তাদের। তিনি দাম দিতেন তাদের। কেউ হয়তো ছোকরা, কেউ বা ঘরে আছে। সবই নড়েভোলা। কিন্তু ঠাকুর তাদের না দেখলে অশান্ত হয়ে পড়তেন। ছুটে ছুটে তাদের বাড়ী চলে আসতেন। তিনি চিনেছিলেন এদের। এখনও যে আসছে ভক্ত সব, আরও আসবে কালে—এরা সবাই যোগী।

পরের দিন সকাল আটটা শ্রীম মর্টন স্কুলের চারতলায় নিজের ঘরে বসিয়া আছেন বিছানায়, পশ্চিমাস্য। বাম পার্শ্বে অন্তেবাসী বেঞ্চিতে বসা।

কিছুদিন হইতে শ্রীম স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতেছেন মাসিক বসুমতীতে, মঠের সাধুদের বিশেষ অনুরোধে। তাঁহার এই সকল প্রবন্ধ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের পঞ্চম ভাগের পরিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হইবে।

স্বামীজীর সম্বন্ধে যাহা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার কতকগুলি অতিরিক্ত ছাপান ফরম বসুমতী অফিস হইতে চাহিয়া আনা হইয়াছে। এইগুলি ঠাকুরের বিভিন্ন আশ্রমে সাধুদের কাছে পাঠাইতে হইবে। সেই কথা হইতেছে।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—আজ এই তিন আশ্রমে পাঠান—দেওঘর বিদ্যাপীঠে, কাশী অদ্বৈতাশ্রমে, আর বঙ্গের আশ্রমে। ঠাকুরের কথা সাধুদের অতি প্রিয়। এই সব কথা তারাই কতক বুঝতে পারে। তারা তাঁর কথার মূর্তি কিনা।

কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ঠাকুরের মূল কথা। এরা এই মহাবাক্যের রূপ ধারণ করে এসেছে। তাই তো ভক্তদের বলি সর্বদা তাদের দর্শন করতে। হাজার বই-ই পড় অথবা অন্য যা কিছুই কর, এ সবে ততটা হয় না, যতটা হয় সাধুদর্শনে। এ দেশে (বাংলায়) সাধু ছিল কোথায়? ঠাকুর আসার সঙ্গে সঙ্গে এ সব হচ্ছে।

অন্তেবাসী প্যাকেট তিনটি আঠা দিয়া আঁটিতেছেন। শ্রীম তাহা লক্ষ্য করিয়া মন্তব্য করিতেছেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—অত আঠা লাগাতে নেই, এতে waste (অপচয়) হয়। আর লাগেও না ভাল। Waste (নষ্ট) করতে নেই। যতটা দরকার ততটা নেওয়া। এই সব ছোট বিষয়ে নজর না রাখলে বড় বিষয়েও যত্নহীন হয়ে পড়ে লোক। চারদিকে চোখ চাই। ঠাকুরের শিক্ষা এই সব। খুব meaning (অর্থ) তার। আমরা কি জানতুম এ সব? তিনি সব জানেন। তাঁর দিব্যদৃষ্টি। কিসে কি হয় তিনি তা ভাল জানেন।

কাজ যা করি আমরা তা মনের সৃষ্টি। কাজ দেখে মনের অবস্থা বোঝা যায়। আল্‌গা মনের কাজ ছাড়া ছাড়া, সুন্দর হয় না।

খুব serious (ব্যাকুল) যারা তাদের কাজে ফাঁক নাই। তারা উঠে-পড়ে লাগে। আবার ভক্তদের কাজে এ সবই থাকবে—মনোযোগ, দৃঢ়তা, অধ্যবসায়, শ্রদ্ধা ও শান্তি।

স্বাধীন দেশের লোকেরা কাজে পটু হয়। স্বাধীনতা রাখতে হলে সকলকে খাটতে হয়। তাদের অনেকগুলি গুণ কার্যে প্রকাশ পায়। পাশ্চাত্যের লোক কত দৃঢ় হয় কাজে। আর কত অধ্যবসায় তাদের।

কিন্তু ভক্তদের কাজে এ সব গুণও থাকবে। অধিকন্তু থাকবে ঈশ্বরে সমর্পণ-বুদ্ধি। তাতেই ভেতরটা শান্ত থাকে। কেন? তারা যে 'সিদ্ধাসিদ্ধো নির্বিকার'।

Waste (অপচয়) করা ঠাকুর দেখতে পারতেন না। Waste (অপচয়) হচ্ছে দেখলে ঠাকুর প্রতিবাদ করতেন। ওরা, পাশ্চাত্যরা বলে, waste not want not—যারা মিতাচারী তাদের অভাব হয় না। যে অবস্থায় আছে তাতেই তারা খুশি। এই দেখ না, কত লোক কত উপার্জন করছে। আর যা-তা করে খরচ করছে। তাতে অভাব বাড়ছে। আর সারা জীবন কাজ করেও শেষ নাই, অবসর নাই। তাই ঠাকুর বলেছিলেন, লক্ষ্মীছাড়া থেকে কৃপণ ভাল। দুটোই extreme (শেষ সীমা)। দুটোই ভাল নয়। তবে নষ্ট করার চাইতে কৃপণ বরং ভাল।

কোনও বিষয় কি বাদ রেখে গেছেন ঠাকুর? তাঁর এক একটি কথা এক একটি সূত্র। তার ভাষ্য হয় volumes, যদি লেখা যায়। পশুত্ব থেকে দেবত্বে পৌঁছবার যা প্রতিবন্ধক আর সহায় তা সবই স্পষ্ট করে বলে গেছেন। শুধু তাই নয়। জোর করে ভক্তদের দ্বারা করিয়ে গেছেন। এই সব শিক্ষা যদি কেউ গ্রহণ করে তবেই জীবন সফল হল, দুঃখনিবৃত্তির পথে উঠলো, বুঝতে হবে।

শ্রীমর আদেশে অন্তেবাসী দশটার সময় ডাকঘরে গেলেন, হাতে স্বামীজী সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের প্যাকেট।

এখন রাত্রি পৌনে নয়টা। শ্রীম চারতলার ছাদে বসিয়া আছেন

চেয়ারে উত্তরাস্য। পাশে ভক্তগণ—ডাক্তার, বিনয়, ছোট অমূল্য, বড় জিতেন, ছোট জিতেন, বলাই, গদাধর, শান্তি, সিলেটের ভক্ত প্রভৃতি।

বিগত ১৯শে জুলাই শ্রীম ভক্তসঙ্গে ডাক্তারের মোটরে বেলেঘাটায় শুকলাল রায়ের গৃহে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তখন ঐ গৃহে একজন টাইফয়েড রোগে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার সংবাদ লইবার জন্য শ্রীম আজ আবার জগবন্ধুকে বেলেঘাটা পাঠাইলেন। জগবন্ধু ফিরিয়া আসিয়াছেন। রোগী এখন রোগমুক্ত, কিন্তু দুর্বল। আর সেবকগণ বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

শ্রীম—শুশ্রূষা যারা করে তাদের বিশ্রাম করতে হয়। তা নইলে এলিয়ে পড়ে শেষে। একজনকে লিডার হতে হয়। সে কেবল সেবকদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। আহার ও বিশ্রাম ঠিক সময়ে হয়, দেখতে হয়। জটিল ব্যাধি হলে আরও মুস্কিল। ঠাকুরের সেবা দীর্ঘকাল চলেছিল। যারা সেবা করতো তারা মাঝে মাঝে এলিয়ে পড়তো। তখন ঠাকুর বলতেন, কিরে তোরা কি আমায় দেখবি না? দোষ নিতেন না। তিনি তো জানেন human weakness (মানুষের দুর্বলতা)। এ শরীর নিয়ে বেশী দিন চলে না। তবুও নিয়ম করে চললে কিছুদিন চলে। শরীরের ধর্মই এই। তাই ক্রাইস্ট বলেছিলেন মৃত্যুর পূর্বে, 'The spirit is willing, but the flesh is weak.' (মন তো চাইছে মৃত্যু বরণ করতে, কিন্তু শরীর দুর্বল)।

একজন ভক্ত—ঘরে অসুখ থাকলে মন বড় চঞ্চল হয়।

শ্রীম—এই অসুখের relative value (ব্যবহারিক মূল্য) কত বড়। যার অসুখ হয় সে অনেক সময় বদলে যায়। তার বৈরাগ্য হয়। আবার ঘরের লোকেরও বৈরাগ্য হয়। ঈশ্বরে নির্ভর করতে শেখায় এই সব বিপদ। স্নেহে আকৃষ্ট সব জীব, রোগীকে ছাড়তে পারছে না। আবার শরীরের limitation (দুর্বলতা) রয়েছে। দোটানায় পড়ে যায়। যখন নিজেদের অহংকার fail (নিষ্ফল)

হয়ে পড়ে তখন নির্ভরতা আসে। ডাক্তারদেরও কারো কারো চৈতন্য হয়। হরি মহারাজের রোগে ডাক্তারদের চৈতন্য হয়েছিল। কি অসম্ভব সহনশীলতা, এই দেখে। ঢেলা দিয়ে তিনি ঢেলা ভাঙেন।

লোক প্রথম মনে করে, আমরা ডাক্তার কবিরাজ দিয়ে আর সেবা করে রোগমুক্ত করে ফেলবো। কিন্তু শেষে হালে আর পানি পায় না। তখন হয় নিরাশ। সেই নিরাশার ভেতর থেকে দেখা দেয় আশারূপী ভগবানের কৃপা। যদি রোগী মরেও যায়, তবুও এতে চৈতন্য এনে দেয় কারুকে কারুকে। বাঁচালেও এতে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। আরো ভাল জিনিস আছে ঈশ্বরের কাছে, এই বিশ্বাস হয়। সকাম থেকে ক্রমে নিষ্কাম হয়।

ঠাকুর বলেছিলেন, ডাক্তারগুলোর কি অজ্ঞানতা! বলে, আমি রোগ ভাল করে দেব। যে মালিক তাঁর দিকে লক্ষ্য নেই। দুই-ই চাই—চেষ্টা ও ঈশ্বরে বিশ্বাস। শুধু চেষ্টায় মনে শান্তি হয় না।

যাদের ভিতর পশুভাব অধিক, যাদের ভোগবাসনা অধিক, তারা প্রথমটায় ঈশ্বরবিমুখ হয়ে যায় বিপদে পড়ে। কিন্তু শেষে ফিরে আসতে হয় তাদের।

পশুভাবের প্রতিমূর্তিকে গীতায় অসুর বলা হয়েছে। বলেছেন—এদের আমি জন্ম জন্ম আসুরী যোনিতে ফেলে দিই। এ কাজ কি আর তাঁর প্রতিহিংসাবৃত্তি থেকে উৎপন্ন হয়েছে? না, তা নয়। কি করেন আর তিনি? জগৎ চালাবার জন্য তাঁর কতকগুলি নীতি আছে। সেগুলি অসুররা মানে না। তাই তাদের শাস্তি দেন। মার কি অন্তরে দ্বেষ থাকে? বাইরে হয়তো সন্তানকে মারছে। মা যেমন দুষ্ট সন্তানের পেছনে পেছনে থাকে যাবৎ না ঘরে ফেরে সন্তান, তেমনি ঈশ্বরও জীবের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন যাবৎ না মুক্ত হয় জীব, জীবত্ব থেকে। ভাল ছেলে, মন্দ ছেলে, মায়ের স্নেহে সবই ছেলে। ঘরের ছেলে যাবৎ না ঘরে ফিরে আসে, তাবৎ ঈশ্বর থাকেন সঙ্গে সঙ্গে।

আমার এক একটা বিপদ হতো আর ঠাকুর ছোকরা ভক্তদের

দেখিয়ে বলতেন, এদের শিক্ষার জন্য তোমার এ সব হচ্ছে। সংসার জ্বলন্ত অনল। এখানে সবই দুঃখ। সুখের লেশমাত্রও নাই, যথার্থ সুখের। এখন যে বিপদ হচ্ছে, এতে এরা (জগবন্ধু আদিকে দেখাইয়া) শিক্ষা লাভ করবে। এতে যাদের সংসার আছে তাদের চৈতন্য করিয়ে দেবে।

এই বিপদ আপদ কেন এই সংসারে? এর উত্তর—এ না থাকলে কেউ ঈশ্বরকে স্মরণ করতো না। Majestic height-এ (সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শে) উঠিয়ে দেয় মানুষের মনকে এই সাংসারিক বিপদ আপদ।

বিপদে যিনি অচঞ্চল, যেমন শ্রীকৃষ্ণ, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ, তিনিই হলেন ideal man (আদর্শ পুরুষ)। এই এক দিক। অন্য দিকে নরপশু—the animal man. একটুতেই একেবারে চঞ্চল। এর মাঝখানে human man (মানুষ)। The animal man will become God man—এই নরপশুই একদিন দেবমানব হবে। এইটাই ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সংবাদ।

বিপদ যেন কষ্টি পাথর, মনকে নির্মল করে দেয়। কুন্তীদেবী তাই বিপদ চেয়েছিলেন ভগবানের কাছে।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা। ৮ই আগস্ট, ১৯২৪ খ্রীঃ
২৩শে শ্রাবণ ১৩৩১ সাল। শুক্রবার, শুক্লা অষ্টমী ৩:১৬ পল

সপ্তদশ অধ্যায়

তাঁর জিনিস তাঁকে দেওয়ার নামই সন্ন্যাস

মর্টন স্কুলের চারতলার ছাদ। অপরাহ্ণ চারটা। শনিবারের ভক্তগণ আফিসের ফেরৎ আসিয়াছেন। ললিত রায়, ভোলানাথ মুখার্জী, তাঁর সঙ্গী প্রভৃতি। জগবন্ধু, গদাধর প্রভৃতি ভক্তগণও উপস্থিত আছেন। শ্রীম নিজ কক্ষে অর্গলবদ্ধ হইয়া ধ্যানমগ্ন।

শ্রীহট্টের ভক্ত রজনী আজ মঠে গিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল মঠে থাকেন। মঠের কর্তৃপক্ষ রাখেন নাই। তাঁহার মনে কষ্ট। ভক্তদের সঙ্গে এই সব কথা তিনি কহিতেছেন।

শ্রীম ছাদে উপস্থিত। যুক্তকরে সকলকে নমস্কার করিতেছেন। তাঁহার পায়ে হাত দিয়া নমস্কার করিতে দেন না। অধিকন্তু তিনিই সকলকে অগ্রে নমস্কার করিয়া থাকেন। আজ তাহাই করিলেন। কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়াই যুক্তকরে 'নমস্কার নমস্কার' শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে আসিয়াছেন। তিনি চেয়ারে উত্তরাস্য বসিয়াছেন, আর ভক্তগণ তাঁহার সামনে দক্ষিণাস্য বসা বেঞ্চিতে। এইবার আনন্দে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—কি সব কথা হচ্ছিল আপনাদের? ভক্তরা ঈশ্বরের কথা ছাড়া অন্য কথা কন না কিনা। অন্য কথা, বিষয়ের কথাকে চৈতন্যদেব বলতেন 'গ্রাম্য কথা'। স্বামীজী বলতেন, 'false talk' (মিথ্যা কথা)।

কোন্ অধ্যায়ের কথা হচ্ছিল আপনাদের? সবটাই একটা গ্রন্থ কিনা, মানুষ থেকে ঈশ্বর পর্যন্ত। With reference to God—ঈশ্বরীয় কথা হলেই বেদ হলো, উপনিষদ হলো। তাঁকে ছেড়ে দিয়ে কথা হলেই গ্রাম্য কথা হলো, বিষয়ের কথা হলো। এটা তুচ্ছ। আপনারা এটা নেবেন কেন? আপনারা যে বড় ঘরের লোক!

শ্রীহট্টের ভক্তকে মঠে থাকিতে দেওয়া হয় নাই। এই সম্বন্ধে ভক্ত-সভায় নানা সমালোচনা হইতেছিল। শ্রীম কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন? তাহা না হইলে ছাদে পা দিয়াই কেন জিজ্ঞাসা করিলেন, কি সব কথা হচ্ছিল আপনাদের? এই মহর্ষি বুঝি মানব মনের নিম্ন গতিবিধির বিষয় সম্যক্ অবহিত। তাই উচ্চে ঊর্ধ্বে আনন্দময় সুখময় ভূমিতে এই মনকে উঠাইতে চেষ্টা করেন। সেখানে গেলে মনের নিম্নগতি, দোষ-দৃষ্টি ভস্মীভূত হইয়া যায়। কেবল উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় শান্তিময় দিব্য দৃষ্টি, বিশাল দৃষ্টি বিরাজিত থাকে। একেই বুঝি বলে অহেতুক কৃপা। এই কৃপাদৃষ্টি না থাকিলে সংসার বিকট

অগ্নিময় মরুভূমিতে পরিণত হইত। মহাপুরুষগণের এই অহেতুক কৃপাদৃষ্টি মানুষের মনকে কণ্টকময় দুঃখজনক অজ্ঞানান্ধকার হইতে উঠাইয়া পুণ্য পবিত্র ভূমিতে শ্রীভগবানের অমল কোমল শ্রীপাদপদ্মে স্থাপন করিয়াছেন। কণ্টকবন হইতে দেবমন্দিরে, শীতাতপ হইতে সুশীতল গৃহকুঞ্জে, 'কাজলের ঘর' হইতে দিব্যোজ্জ্বল ধামে লইয়া যান সংসারতপ্ত জীব-মনকে। অবতার ও পার্ষদগণের এই এক কাজ। তাঁহারাই কেবল পারেন মানবের মলিন পঙ্কিল মনটাকে নির্মল স্বচ্ছ সুন্দর করিতে। শান্ত স্নিগ্ধ প্রসন্নোজ্জ্বল, জ্যোতির্ময় করিতে। এই একটি কার্যের জন্যই সপার্ষদ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণরূপে ধরাধামে সম্প্রতি অবতরণ করিয়াছেন।

জ্ঞানী ও শান্তমতি ভক্ত ললিত সবিনয়ে শ্রীমর সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন।

ললিত—এই এঁকে আজ মঠে থাকতে দেন নাই। দুপুরবেলায় তাড়িয়ে দিয়েছেন। ইনি খুব দুঃখিত। এই কথা হচ্ছিল।

শ্রীম—সাধুদের তাড়া খেতে হয়। এ এক প্রকার অনুগ্রহ। পুরীতে জগন্নাথের মন্দিরে শান্তিরক্ষকগণ এক প্রকার মৃদু চাবুকাঘাত করে যাত্রীদের পিঠে, যাতে গর্ভমন্দিরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে না থাকে। অনেকে দেখেছি চেয়ে নেয় আঘাত। বলে, কই আমায় মারলে না বাবা? তাদের বিশ্বাস, এই আঘাতে পাপ নাশ হয়, মন পবিত্র হয়—মানে, ভগবানদর্শন করতে গিয়ে আমি এই প্রহার-প্রসাদে ধন্য হলাম (সকলের হাস্য)। হাঁ, এও প্রসাদ!

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—সাধুদের আশ্রমে বাবুরা যায় বেড়াতে ইস্টিক হাতে। ফিরে এসে complain (অভিযোগ) করে—হাঁ, আমায় আদর তো করলোই না, উলটে অপমান করলো, এমন করলে, তেমন করলে। এ সব হীনবুদ্ধি লোক। এদের অন্তর্দৃষ্টি নাই।

পিতামাতা, গৃহ, পরিজন, সব ছেড়ে সাধুরা মঠে গেছে কিসে ভগবানলাভ হয়, এই এক উদ্দেশ্য নিয়ে। ওখানে গেছে কি তারা তোমার সঙ্গে 'নোকতা' (লৌকিকতা) করতে? এই জন্যই কি সব

ছেড়েছে? কি না ছিল তাদের? এক একজন অতি বড় বিদ্বান। অন্ন বস্ত্রাদি কিছুরই তো অভাব ছিল না তাদের! সর্বস্ব ছেড়েছে, কিসে ভগবানলাভ হয়।

সময়ে অসময়ে তুমি গিয়ে তাদের কাছে আদর যত্ন, আহারাদি চাইবে। তা কি করে দেয় মানুষ সব সময়? তুপুরে হয়তো পঞ্চাশ জনের আহার প্রস্তুত। গিয়ে হাজির একশ' জন। আবার রাঁধ, তবে খাও। এই করে কি তারা দিন কাটাবে? সারাদিনই তা হলে এতে যাবে। এর জন্য কি তারা এসেছে সব ছেড়ে ছুড়ে?

তারপর খরচ আসে কোথেকে? ভিক্ষার অন্ন। যে যা দেয়, তাতে ঠাকুরসেবা, সাধুসেবা, কোনও রকমে হয়। লোকের এদিকে দৃষ্টি নাই। ওরা তো কারো মনে কষ্ট দিতে ওখানে যায় নাই। কি করবে, অনেক সময় জেনে শুনে কঠিন হতে হয়—যাদের উপর ভার, তাদের। এ তো আর হোটেল নয়। সেখানেও পয়সা দিয়ে খেতে হয়। হক্ কথা বললে বাবু নারাজ। তা হলে আর কি করা যায়?

কেন, যাও না, খেয়ে দেয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা কও, সৎসঙ্গ কর। কোথায় যাবে তাদের পূজা করতে, তা না করে গিয়ে তাদের পূজা নেওয়া! কি ভয়ানক অন্যায়! তারা যে আমাদের সঙ্গে কথা কয়, তাদের যে আমরা দর্শন করতে পারি, এইটে কত বড় কৃপা!

তারপর সময়ও নাই। তাদের কত কাজ! এখন বসে তোমার সঙ্গে পলিটিক্স আলোচনা করবে। আবার প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সাধনভজন রয়েছে, মন ও বাইরের অবস্থার সঙ্গে লড়াই করতে হয়। কত দিকে তাদের কাজ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—যারা অভিযোগ করে তাদের এ সব চিন্তা করার অবসর নাই। নিজের স্বার্থটি দেখা, অপরের লাভালাভে উদাসীন। যাদের এই সামান্য বুদ্ধি বিবেচনার অভাব, তারা কি করে ব্রহ্মবুদ্ধি লাভ করবে? কি করে ঈশ্বরদর্শন করবে? যে

মুনের হিসাব করতে পারে না, সে কি করে মিছরীর হিসাব করবে? ছি ছি, কি হীনবুদ্ধি সব মানুষ!

তাদের দর্শনেই আমাদের কত লাভ, একেবারে চৈতন্য করিয়ে দেয়। কি না, এরা সর্বস্ব ছেড়ে ভগবানলাভে ব্রতী। সকল দুঃখ গ্রহণ করছে। গুরু যা বলছেন তাই পালন করতে চেষ্টা করছে। আজ লাহোরে প্লেগ। গুরু আদেশ করলেন, যাও নারায়ণবুদ্ধিতে গিয়ে সেবা কর। এতেই তোমাদের তপস্যা হয়ে যাবে। অমনি ছুটল সেখানে। মরণের ভয় নাই। কোথায় মহামারী, কোথায় বন্যা, কোথায় দুর্ভিক্ষ, কোথায় লোকের আপদ, গুরুর আদেশে সেখানে গিয়ে হাজির। কি সোনার চাঁদ সব ছেলে! দেখলে চোখ জুড়ায়, প্রাণ শীতল হয়। এদের দেখে কোথায় মন প্রাণ শরীর সমর্পণ করবে ঈশ্বরে, তা না করে অভিযোগ—আমায় অপমান করলো, খেতে দিল না, কথা কইল না, এই সব ভাব। এ সব মহা স্বার্থপরভাব, হীন বুদ্ধি। এ সব ছাড়তে হবে। পার তো ওদের সেবা কর, নচেৎ দর্শন করে নিজের বিলুপ্ত চৈতন্য ফিরিয়ে আন। বল, আমাদেরও সকলেরই এরূপ করা উচিত, গৃহেই থাকি আর সন্ন্যাসীই হই, সব ছেড়ে। সর্বস্ব ভগবানে সমর্পণের চেষ্টা করা উচিত। ভূত-প্রেতের সেবায় এই অমূল্য জীবন নষ্ট না করে, দেবসেবায় লাগান উচিত। এই স্ত্রী পুত্র পরিজন, ঈশ্বরের রূপ, দেবমন্দির—এ ভেবে এদের—ভগবানের সেবা করলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। আর এদেরও দেবভাব জাগ্রত হয়।, গৃহই তখন আশ্রম হয়ে যায়। প্রাচীন ভারতে এই সব দেবভাব জীবন্ত ছিল। সাধুদের নিষ্কাম সেবাব্রত দেখে তো এই শিক্ষাই লাভ করা উচিত। তা না করে তাদের দোষ ধরা!

শ্রীম একটু নীরব। আবার কথামৃত বর্ষণ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুর ভক্তদের দিয়ে ভিক্ষা করাতেন, যাদের সন্ন্যাসের অবস্থা দেখতেন। তবে তো অহংকার ও অভিমান কম পড়বে? কাশীপুরে মেয়েদের দিয়েও ভিক্ষা করিয়েছিলেন। গিন্নী (শ্রীমর ধর্মপত্নী) ভিক্ষা করেছিলেন। বলরামবাবুর স্ত্রী

ভিক্ষা করেছিলেন। লক্ষ্মীও ভিক্ষা করেছিল। আরো কেউ কেউ করেছিল। পুরুষ ভক্তদের দিয়ে তো করিয়েছিলেনই। কেন এ সব করালেন ঠাকুর? তাতে অভিমান যায়। অভিমান গেলেই স্বরূপের জ্ঞান হয়। অষ্ট পাশে বদ্ধ কিনা জীব!

যতদিন গৃহে আছে ভক্তগণ, ততদিন যে মস্ত অপরাধ করছে গৃহী ভক্তগণ। কেন যায় না সন্ন্যাস নিয়ে? এদিকে যাবে না, আবার অভিমান—আমি অতবড় জ্ঞানী, আমি হেন, আমি তেন।

তাঁকে সব দিতে হবে, সবাইকে। কেন? না, সবই যে তাঁর। তুমি মালিক হয়ে গেছ। তুমি যে অপরের ধনে ধনী। কিন্তু এ জ্ঞান ভুলে গেছ। অধিকন্তু অভিমান করছো, আমার এই সব ধন-দৌলত, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, গৃহ, পরিজন। কোন্‌টা তোমার, বিচার করে দেখ না একবার। এই শরীরটাই কি তোমার? তুমি কি রক্তমাংস সৃষ্টি করতে পার? তারপর মন প্রাণ বুদ্ধি? এ সবই যে তাঁর। সবই ঈশ্বরের, আমরা বলছি, আমাদের। তাঁর জিনিস তাঁকে দেওয়ার নামই সন্ন্যাস। তুমি দাস হয়ে থাক। অভিমানটাকে বল, তুমি ঈশ্বরের দাস। তা বাহ্য সন্ন্যাস নিয়ে বের হয়েই যাও, অথবা গৃহেই থাক। তুমি তাঁর দাস।

ভিক্ষা করলে অহংকার কমে যায়। তখন সত্যিকার অহংকারটা জাগ্রত হয়। তখন দেখে আমি তাঁর। ভিক্ষা করা মানে, ভগবানের দুয়ারে গিয়ে দাঁড়ান, প্রার্থনা করা শরীর ধারণের উপকরণের জন্য। এতে নিচের 'আমিটা' sublimated (মহত্তর পথে উন্নীত) হয়। ঋষিরা কত দিক দেখে তবে এ সব ব্যবস্থা করেছেন।

যার ভগবানে বিশ্বাস নাই, সে ভিক্ষা করতে পারে না। আবার গুরুবাক্য শুনে কাজ করলে ধীরে ধীরে ভক্তি ও বিশ্বাস লাভ হয়। ছোট 'আমি'টা বড় 'আমি'তে পরিণত হয়। দুষ্ট 'আমি'টা শিষ্ট হয়। গরল অমৃত হয়। শেষে জীব শিব হয়। মানুষের পুত্রগণ 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' হয়।

শ্রীম (একজন যুবকের প্রতি)—একদিন কতকগুলি ভক্ত

যাচ্ছেন দক্ষিণেশ্বর। ঠাকুর যাচ্ছেন কলকাতায় গাড়ি করে। রাস্তায় দেখা। এর মধ্যে গাড়ি থামিয়ে একজন লোককে (শ্রীমকে) তুলে নিলেন। গাড়িতে জায়গা আছে। কিন্তু অপরদের নিলেন না। ঠাকুরের সঙ্গে গাড়িতে যিনি এসেছিলেন, তিনি বললেন ওঁরাও আসুন না, জায়গা আছে। ঠাকুর তখন তীব্রস্বরে বললেন, না, তারা হেঁটেই যাবে। কেন এটি করলেন? তিনি কি নিষ্ঠুর? নিশ্চয় না। অমন স্নেহময় লোক তো আমরা জীবনে কখনও দেখি নাই। তবে কেন এ করা? তিনি ইচ্ছা করেন, এরা দাসভাবে থাকুক। ও-টি করলে (হেঁটে গেলে), দাস ভাবটি থাকে। তা না হলে আবার কর্তাগিরি বেড়ে যায়।

একদিন কাশীপুরে একজন ভক্তকে একটা বাটি কিনে আনতে বললেন। আর একজন বললেন, বাটি রয়েছে। ঠাকুর শুনে বললেন—না, তা হলেও সে আনুক। দুপুর বেলা। ভক্তটি না খেয়ে জোড়াসাঁকো এলেন। তারপর বাটি কিনে নিয়ে যান। কেন, এ-টি করলেন? ঠাকুর জানতেন, এ কথাটি সারা জীবন সে ভাববে। তাতে তার কল্যাণ হবে। পরে মনে বল আসবে, যখন ভাববে, আমি ভগবানকে একটি বাটি কিনে এনে দিয়েছিলাম। এতে তার পরম মঙ্গল হবে, জীবন্ত ধ্যান হবে।

ললিত প্রভৃতি ভক্তগণ বিদায় লইলেন। এখন রাত্রি সওয়া আটটা। শ্রীম ছাদ হইতে উঠিয়া আসিয়া সিঁড়ির ঘরে চেয়ারে বসিয়াছেন, দোরগোড়ায় দক্ষিণাস্য। জগবন্ধু ও স্বামী গিরিজানন্দ থিওজফিক্যাল সোসাইটি হইতে বক্তৃতা শুনিয়া আসিয়াছেন। সেখানে ব্রাহ্মণ ও নহুষ রাজার কথা হইয়াছিল। শ্রীম নীরবে সব শুনিলেন।

শ্রীমর ইচ্ছায় শান্তি এখন কথামৃত পাঠ করিতেছে। ঠাকুর 'পেনেটি'র চিড়ার মহোৎসবে গিয়াছেন। নিবিষ্ট মনে সমগ্র বিবরণটি শুনিলেন। এবার ঐ বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—কেন যাওয়া এই মহোৎসবে? এর

মানে আছে। পুরানো তীর্থ উদ্ধার করতে যাওয়া। সাধারণ মানুষ তো ঈশ্বরকে ধরতে পারে না। তাই ঋষি ও মহাপুরুষগণ তীর্থ, দেবালয়, মহোৎসবাদির ব্যবস্থা করেছেন। সারা ভারত জুড়ে এই ব্যবস্থা। অন্য দেশেও এ সব আছে। জনগণ এসে অন্ততঃ বছরে একদিন ঈশ্বরের নাম করবে, দেখবে, ভক্তসঙ্গে আনন্দ করবে। সংসারের চাপে সব ভুল হয়ে যায়। তীর্থাদিতে এলে ঈশ্বরের স্মরণ হয়, সৎসঙ্গ হয়। তখন স্বরূপের সন্ধান হয়, অল্প সময়ের জন্য হলেও। তাতে মনে বল আসবে, শান্তি সুখ আনন্দ লাভ হবে।

অবতার আসেন, not to destroy but to fulfil (বিনাশের জন্য নয় কিন্তু সম্পূর্ণ করার জন্য)। চৈতন্য-নিত্যানন্দ এসে ঐখানে তীর্থ করেছেন পাঁচ শ' বছর পূর্বে। তাঁদের অন্তরঙ্গ ভক্ত রাঘব পণ্ডিত, রঘুনাথ দাস ওখানে ছিলেন। এঁরা পার্ষদ। ঐ 'পেনেটি'তে ঠাকুর গিয়ে নূতন করে আবার জ্বালিয়ে দিলেন আগুন। নিব-নিব হয়ে যায় কিনা। ভগবানের ভাব চাপা পড়ে যায়। ওটাকে উস্কে দিলেন। এখন চলবে আবার কয়েক শ' বছর ধরে। তিনি নিজে বলেছেন, আমি চৈতন্য। তাই 'পেনেটি'তে গিয়ে পাঁচ শ' বছরের ব্যবধানরূপ আবরণটি ভেঙ্গে দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণ চৈতন্য-ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হবে এই করে। এই প্রকারে ধর্মের শিখা জাগ্রত ও জ্বলন্ত করেন ভগবান।

আবার ঐ সময় ইংরেজিপনা ঢুকেছিল সমাজে। ঐ সব তীর্থ মানতো না লোক। ঈশ্বরের নামে লজ্জা ছেড়ে দিয়ে নৃত্য করা, উচ্চৈঃস্বরে নাম সংকীর্তন করা ইংরেজিনবীশ লোক পছন্দ করতো না। এই মোহ ভেঙ্গে দিলেন। ঠাকুরের সাঙ্গোপাঙ্গ সবই ইংরেজঘেঁষা লোক। নরেন্দ্র নৃত্য করছে ঠাকুরের সঙ্গে!

আর একটা দিকও আছে। জনসাধারণের সঙ্গে এক না হতে পারলে সত্যিকার ধর্ম হয় না। সকলের সঙ্গে দীনভাবে ঈশ্বরের ভজন কীর্তন হয়। আমি পণ্ডিত, আমি মানী, আমি ধনী, আমি কুলীন, এ সব অভিমান চূর্ণ করতে নিজে গিছলেন ভক্তদের নিয়ে

ওখানে। আর নিজে উন্মত্ত হয়ে নৃত্য ও কীর্তন করেছিলেন ওখানে। বললে তো যাবে না ভক্তরা। তাই নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিছলেন ওখানে।

তাঁর প্রতিটি কাজের অর্থ অতি সুগভীর। মানুষ ভাবে, অমনি একটা ঘটনা হয়েছিল 'পেনেটি'তে। তা নয়, সব planned (সুপরিকল্পিত)। জনসাধারণের জন্য ধর্মের সহজ edition (সংস্করণ) মেলা ও উৎসবাদি। ভারতময় ছড়িয়ে রেখেছেন এই উৎসবাদি মহাপুরুষগণ।

কিছুকাল হইতে শ্রীমর শরীর মাঝে মাঝে অসুস্থ হইতেছে। বামহস্তে ও পৃষ্ঠে একটা বেদনা হয়। ইহা যায় কিসে, ভক্তগণ আলোচনা করিতেছেন ডাক্তার বক্সীর সঙ্গে। ভক্তাগ্রণী বড় জিতেন নানা রকম উপদেশ দিতেছেন। অপর সকলেও তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিতেছেন। শ্রীম নীরবে সব শুনিতেছেন। ভক্তদের সব আলোচনা থামিলে শ্রীম কথামৃত বর্ষণ করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আমরা মানুষ, মনে করি আমরা সব ভাল করে ফেলবো। তা হয় না। এর উপরও আর একটা বড় planner (পরিকল্পনাকারী) আছেন। তাঁর planই (কাজই) শেষ অবধি টেকে। আমরা মনে করি, আমরা কর্তা। তাই পরিকল্পনা করি, চেষ্টা করি। কিন্তু বস্তুতঃ আমাদের উপর আর একজন কর্তা আছেন। সেই বড় কর্তার ইচ্ছাতেই সব হয়। (মন অতীতে সংলগ্ন করিয়া) ঠাকুরের শরীর তখন সবেমাত্র গেছে। আমরা তখন ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে পড়াই। একসঙ্গে তিনটা স্কুলের হেড মাস্টার আমরা। একঘণ্টা করে পড়াতে হতো এক একটা স্কুলে। পাল্কী করে যেতাম। কখনও ট্রামে। একদিন ট্রাম বদলাচ্ছি বড়বাজারে। সেখানে একটি সাধু দেখলাম, বসা। চেহারাটি ঠাকুরের মত। আসন করে বসা, ছেলেমানুষের ভাব। তাঁর কাছে গিয়ে রোজ দাঁড়িয়ে থাকতাম। রোদ লাগতো বলে ছাতাটি উপরে ধরে রাখতাম। এঁকে দেখে ঠাকুরের উদ্দীপন হতো।

উনি একদিন কৃপা করে আমায় বললেন, তুমি আমায় হাওড়ার গাড়ীতে বসিয়ে দিতে পার? আমি বললাম, যে আজ্ঞে। এরপর একদিন তাঁকে নিয়ে গিয়ে হাওড়ায় গাড়ীতে বসিয়ে দিলাম টিকিট করে। তিনি কৃপা করে আমাকে ছোট এক টুকরো কাগজ দিলেন, আর বললেন, এইটি মাদুলিতে ভরে সঙ্গে রাখবে। তাহলে আর তোমার অভাব, দুঃখ কষ্ট কিছু থাকবে না। গাড়ী ছাড়লে আমি মনের আনন্দে ঐটি নিয়ে চলছি। হাওড়ার পনটুন ব্রীজের মাঝখানে এসেছি। তখন দক্ষিণেশ্বরের দিকে দৃষ্টি পড়তেই ঠাকুরের কথা মনে হল। তখন লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল। তখন ঐ কাগজটি মাথায় ঠেকিয়ে গঙ্গার জলে বিসর্জন করে দিলাম। লজ্জা হলো এই ভেবে, ঠাকুর যে আমায় সর্বদা দেখছেন। তিনি যে বলে গেছেন নিজ মুখে, তোমার আর ভাবনা কি? তোমার যে গুরুলাভ হয়েছে। তাঁর এই মহাবাক্য স্মরণ হতেই লজ্জায় ম্রিয়মাণ হলাম। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে পরমানন্দে বাড়ী ফিরি।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—তাঁর নাম নেওয়া মস্ত বড় ওষুধ। তার বাড়া আবার ওষুধ কি? সাধুরা বলেন, ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং, বৈদ্যঃ নারায়ণো হরিঃ—তাঁকে স্মরণ করলে সর্ব দুঃখ নাশ হয়।

বড় জিতেন—মুসলমান ভক্তরা একটা ন্যাশনাল দুঃখ প্রকাশ করে থাকে প্রতি বৎসর মহরমে।

শ্রীম—গল্পে পড়েছিলাম, ইয়াজিদের চেলার কথা। একজন বলেছিল, বাবা অমন মার মেরেছে যে আজও বুক চাপড়াচ্ছে। আরও কতকাল থাকবে।

সংসারের দৃষ্টিতে এই সব সুখদুঃখ চলতে থাকে। কখনও যাবে না। তাই ঋষিরা এই দুঃখ প্রকাশ করার পক্ষে ছিলেন না। এ তো আছেই, থাকবেও। কিসে আনন্দলাভ হয় তার চেষ্টা তাঁরা করেছিলেন। সেইজন্য হিন্দুদের ভিতর এটার তত চল নাই। জন্মোৎসব কর, বিজয়োৎসব কর, এ খুব ভাল। শোকের কথায় মানুষের মন দেবে যায় কিনা! তাই সাধুরা কেউ মরে গেলে

তের দিনের দিন আনন্দোৎসব করে। কি না—শরীর ছেড়ে ব্রহ্মে লীন হয়ে গেছেন, তাই আনন্দোৎসব।

শোক দুঃখের কথা শ্রবণ না করে স্বরূপের কথা শ্রবণ করা ভাল। যখন মনে এসে পড়ে শোক দুঃখের কথা, তখন মনকে বোঝাতে হয়, এ সব ক্ষণস্থায়ী। আজ আছে কাল নাই। কিন্তু সকল জীবেরই স্বরূপ—আনন্দ শান্তি প্রেম, সচ্চিদানন্দ।

সংসারের এই সব শোকদুঃখ যেন ছায়াবাজী—এই আলো, এই আঁধার। আজ শুনলে—ইনি ভাল, কাল মন্দ। এই জন্ম হলো, আবার শুনলে, মরে গেছে। যেন বায়স্কোপের ছবি আসছে, যাচ্ছে। (সহাস্যে) একবার বায়স্কোপে একটা পিকচার দেখাচ্ছিল। তা'তে cavalry charge (অশ্বারোহী সৈনিকের আক্রমণ) দেখে একটি লোক মনে করলো সত্যিকার ঘটনা। সে পর্দা তুলে ওটা দেখতে গিছলো। আমি বললাম, না কিছুই হয় নাই। কিন্তু ওর ধারণা হয়েছিল সত্যিকার ঘটনা। এমনি সংসার। মানুষের কাছে সত্যিকার বলে ধারণা করিয়ে দেয় তাঁর মহামায়া, তাঁর অবিদ্যা শক্তি। বস্তুতঃ কেবল তিনি আছেন, স চ্চদানন্দ। সংসার দু'দিনের জন্য, নিত্যসত্য ঈশ্বর। তিনি আবার মানুষ হয়ে এসেছেন। এই সে দিন চলে গেলেন—মাত্র আটত্রিশ বছর আগে। তিনি কৃপা করে আমাদের শ্রীপদে আশ্রয় দিয়েছেন। আপনাদেরও আশ্রয় দেবেন। আর পরে যারা আসবে তাদেরও আশ্রয় দেবেন। তাঁর নাম যে দীনশরণ জগবন্ধু !

মর্টন স্কুল, কলিকাতা। ৯ই আগষ্ট ১৯২৪ খ্রীঃ
২৪শে শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল। শনিবার, শুক্লা পঞ্চমী ২৫।৪১ পল

অষ্টাদশ অধ্যায়

ধোঁয়া আকাশকে মলিন করতে পারে না

১

মর্টন স্কুলের ছাদ। সকাল সাতটা। শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন, আর জগবন্ধুর সহিত কথা কহিতেছেন। আজ ১২ই আগস্ট, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ। ২৭শে শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল। মঙ্গলবার, শুক্লা দ্বাদশী ৬।৫৬ পল।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি)—তাহলে আপনি আসুন। একে (রজনীকে) সঙ্গে নিয়ে যান। দক্ষিণেশ্বরের সব দেখাবেন—সব স্থান ও সব লোক, যার সঙ্গে ঠাকুরের সম্পর্ক আছে। এঁড়েদহে স্টীমার-ঘাটের উত্তরের দিকে মাঠ পার হলেই গদাধরের পাঠবাড়ী। গদাধর দাস নিত্যানন্দের শিষ্য ছিলেন, সাধু। এখানে থেকে তপস্যা করতেন। এখানেই শরীর যায়। ঐ সমাধি রয়েছে। ঠাকুর সেখানে প্রায়ই যেতেন ভক্তদের নিয়ে। ওখানে মন্দিরের দরজার ওপর একটি বড় ছবি আছে। নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য বিভোর হয়ে নৃত্য করছেন নগর সংকীর্তনে। চৈতন্যদেবকে দেখে গাভী আহার ছেড়ে তাঁর শ্রীমুখ পানে চেয়ে আছে। মাঝি হাতের বৈঠে হাতে রেখে অবাক হয়ে দেখছে মুখচন্দ্র। কুলবধূ জলে নেমে স্নান করছে। কিন্তু দৃষ্টি গৌর-মাধুরীতে নিমগ্ন। তার কলসী ভেসে যাচ্ছে। সেদিকে লক্ষ্য নাই। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে দেখিয়েছিলেন এই ছবিটি।

দক্ষিণেশ্বরের সর্বত্রই পবিত্র। ত্রিশ বৎসর সেখানে লীলা প্রকাশ করেন। তাঁর পায়ের ধূলোতে সমস্ত বাগানটি পবিত্র হয়ে গেল। তাঁর অঙ্গস্পর্শে সেখানকার বায়ুমণ্ডল, বৃক্ষকুঞ্জ সব পবিত্র। দেবগণ ঋষিগণ ওখানে বৃক্ষরূপ ধারণ করে অবতারলীলার

মাধুর্য উপভোগ করছেন। প্রতি ধূলিকণাতে ধর্ম জীবন্ত হয়ে বাস করছে।

স্টীমারঘাট থেকে আসার রাস্তায় যোগীন স্বামীর পূর্বাশ্রম সাধন চৌধুরীদের বাড়ী। এ সব স্থানেও ঠাকুর যাতায়াত করতেন।

কালীবাড়ীর সব পবিত্র। কি কাণ্ড হয়ে গেছে সেখানে! কি লীলা হয়ে গেছে ঐ স্থানে! ত্রিশ বচ্ছর ধরে অবতারলীলা চলেছিল এই পুণ্যভূমিতে। কালীঘরে ধ্যান করতে হয়। আর নাটমন্দির, ঠাকুরের ঘর আর পঞ্চবটীতেও ধ্যান করতে হয়। এ সব স্থান যেন শুকনো দেশলাই। একবার ঘষলেই দপ করে জ্বলে উঠে! এ সব স্থানে বসে ঠাকুর ধ্যান করতেন কি না। তাঁর শক্তি ওখানে রয়েছে। Atmosphereএ (আবহাওয়ায়) থাকে ঐ শক্তি। ওখানে বসে ধ্যান করলেই ঐ শক্তি জাগ্রত হয়। সাধকের সহায় হয়। তা দিয়ে মন স্থির হয়। গঙ্গার জলে পড়ে গেলে জল লাগবে তো গায়ে। এও তেমনি। ঐ sublime atmosphereএ (ঐ দিব্য আবহাওয়ায়) প্রবেশ করলে মন এমনি ঐতে ডুবে যায়। চেষ্টা করতে হয় না। এরই নাম তীর্থ। কত চিন্তা করেছেন ঠাকুর! কত দর্শন হয়েছে ঈশ্বরের সঙ্গে, আবার কত কথা। যত রকম ভাবে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করা সম্ভব ঠাকুর এক জীবনে নিজ শরীরে তা উপভোগ করেছেন। এ সব ভাব তো রয়েছে। এই অমূল্য ঐশ্বর্য মানুষ ভোগ করতে জানে না। ঈশ্বর নিজে মানুষ-শরীর নিয়ে এসে ভক্তদের জন্য এই সব রেখে গেছেন। গেলেই মনে উদ্দীপন হয়। সংসারের জ্বালায় জ্বলে যারা যাবে ঐ আবহাওয়ায়, তারা গঙ্গাজলে স্নানের মত মনকে ঠাণ্ডা শীতল করে নাইয়ে আসবে। আবার এ শান্ত মন নিয়ে কতক দিন বেশ সংসারে থাকতে পারবে। এইরূপ বারবার যাবে, বারবার মনকে শান্ত করে আসবে।

তারপর দক্ষিণেশ্বরে রামলালদাদার বাড়ীও দর্শন করতে হয়। মা-ঠাকরুণ সেখানেও থাকতেন, লক্ষ্মী থাকতেন। যদু মল্লিকের

বাগান, শম্ভু মল্লিকের বাগানেও যেতে হয়। ঠাকুর প্রায়ই যেতেন। যদু মল্লিকের বাগানে ক্রাইস্ট ঠাকুরের শরীরে প্রবেশ করেছিলেন। যুগলবাবুর সঙ্গে দেখা করতেন। আলমবাজারের কাছে বাড়ী। ঠাকুর তাঁকে ভালবাসতেন। ঐখানে নটবর পাঁজার বাড়ী। ছেলেবেলায় গরীব ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের বাগানে গরু চরাতেন তিনি। ঠাকুর তাঁকে ভালবাসতেন। পরে তাঁর বাড়ীঘর, খুব ঐশ্বর্য হয়েছিল। তিনি তেলের কল করে বহু ধন লাভ করেন। খবর নেবেন তো তাঁর বংশের কে কে আছেন। এঁরা ঠাকুরকে ভালবাসতেন, যখন তাঁকে প্রায় কেউ জানতো না। তাই এঁরা আমাদের পূজ্য ও প্রিয়জন।

আলমবাজারের মঠ দেখবেন। স্বামীজী আমেরিকায় দিগ্বিজয় করে এসে ওখানে ছিলেন। প্রথম মঠ হয় বরানগরে। সেই স্থানটিও দর্শন করবেন। ওখানেই আদর্শ মঠ স্থাপিত হয়েছিল। দিন রাত এক কৌপীন পরে সব ধ্যান ধারণাতে নিমগ্ন থাকতেন। একখানা বহির্বাস ও একখানা উত্তরীয় ছিল, আর এক জোড়া চটী জুতা। যে মঠের বাইরে যেতেন, ঐ সব পরে যেতেন। ঠাকুর সবে চলে গেছেন। সকলের মনে তীব্র বৈরাগ্য। তাঁদের চোখের সামনে থেকে জগৎ অন্তর্হিত হয়ে গিছলো, অমনি ব্যাকুল বৈরাগ্য। কাশীপুরের বাগানও দেখাবেন। ওখানে দশ মাস ঠাকুর ছিলেন। ভক্তসঙ্ঘ ওখানেই সৃষ্টি হয় তাঁর অসুখে। ঠাকুর কাশীপুরের সর্বমঙ্গলাকে দর্শন করতেন। ভক্তদের ওটাও দর্শন করা উচিত। আর কাশীপুরের শ্মশান। এখানে ঠাকুরের লৌকিক দেহের অগ্নিসৎকার হয়। কালে এ সব স্থানে জগতের জনগণের পুণ্য মহাতীর্থ হবে। সর্বদা এ সব দর্শন করতে হয়। বৃদ্ধ শরীর যেতে পারে না। আপনারা দর্শন করে এসে বলবেন। তাই শুনবো। ঠাকুর বলেছিলেন, যাদের খুব strong imagination (প্রবল কল্পনাশক্তি) আছে, তারা শুনেও চৌদ্দ আনা দর্শন করতে পারে মনশ্চক্ষুতে। আমরা এখন এই উপায় অবলম্বন করেছি।

জগবন্ধু রজনীকে লইয়া রওনা হইতেছেন, তখন আসিলেন মুকুন্দ। ইনি রেক্টার, শ্রীমর অতি স্নেহভাজন। জগবন্ধুকে বলিলেন, এই একেও নিয়ে যান। (মুকুন্দের প্রতি) যাও, তুমিও দেখে এস সব মহাতীর্থ। (ভক্তদের প্রতি) উপাধ্যায়ের আসার কথা আছে। এলে তাকেও বলবো তোমাদের সঙ্গে গিয়ে meet (দেখা) করতে। উপাধ্যায় ঢাকার লোক। যান যান, দেরী হয়ে যাচ্ছে, শীঘ্র রওনা হন।

আজ শ্রীমর দক্ষিণেশ্বরের জন্য একটি দিব্যভাবের উদয় হইয়াছে। যে আসে তাহাকেই বলিতেছেন, যাও ওখানে যাও। তিনি বুঝি দিব্যদৃষ্টিতে দর্শন করিতেছেন দিব্য জ্যোতির্ময় ধাম দক্ষিণেশ্বর—ধরাতে অবতীর্ণ বৈকুণ্ঠ। ঠাকুর একদিন দেখিয়াছিলেন, দক্ষিণেশ্বরের বৃক্ষলতা, ফলফুল, মানুষ, ঘরবাড়ী, সব জ্যোতির্ময়। বিড়ালটি পর্যন্ত জ্যোতির্ময়। তাই ভক্তগণকে বলিতেছেন, যাও দর্শন করিয়া এস। ইহাতে পরম কল্যাণ হইবে নিশ্চয়। ভগবান মানবশরীরে ত্রিশ বৎসর ছিলেন সেখানে। অবতার-লীলার শ্রেষ্ঠ তীর্থ। ঠাকুরের শরীর না থাকিলেও তাঁহার ভাবরাশি সেখানে জীবন্ত ও জ্বলন্ত। অজানাভাবেও ঐ ঈশ্বরীয় ভাব সমুদ্রের বায়ুপ্রভাবে প্রবেশ করিলেও ভক্তগণের মনপ্রাণ শান্ত সুশীতল হইবে, প্রাণে ভগবদ্‌স্পর্শ অনুভূত হইবে। ইহাও এক প্রকার ঈশ্বরদর্শন, পরোক্ষ দর্শন।

শ্রীমর নির্দেশমত ভক্তগণ জগবন্ধু, রজনী, ছোট নলিনী প্রভৃতি পূর্বাহ্ণেই সমগ্র দক্ষিণেশ্বর ধাম দর্শন করিলেন ও ঠাকুরের দর্শনে ধন্য ও কৃতকৃত্য জনগণকে দর্শন করিলেন। কালীবাড়ীতে মধ্যাহ্নে মায়ের প্রসাদ আহার করিয়া, বিশ্রামান্তে পদব্রজে আলমবাজারে দর্শনীয় স্থানাদি দেখিয়া ৺কাশীপুর-উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। শ্রীমর সহিত ভক্তগণ এই উদ্যানে কয়েকবার আসিয়াছেন। তাই শ্রীম-কথিত পবিত্র স্থানসমূহ দর্শন ও প্রণাম করিয়া কাশীপুর শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। তৎপর সর্বমঙ্গলা দর্শনান্তে কাশীপুরে

ডাক্তার বক্সীর বাড়ীতে সওয়া সাতটায় আসিলেন। ডাক্তারের মোটরে ডাক্তার ও বিনয়ের সহিত রাত্রি সাড়ে আটটায় তাঁহারা মর্টন স্কুলে শ্রীম-সমীপে উপস্থিত হইলেন। ক্ষণকালের মধ্যেই বর্ষা শুরু হইল।

শ্রীম সিঁড়ির ঘরে বসা চেয়ারে। রজনী, বলাই, বড় অমূল্য, শান্তি প্রভৃতিও বসিয়া আছেন। দক্ষিণেশ্বর প্রত্যাগত ভক্তদের দেখিয়া আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, এই যে আসুন। আপনাদের জন্যই বসে আছি উদগ্রীব হয়ে চাতকের মত। সেই Holy Landএর (পুণ্য মহাতীর্থের) সংবাদ বলুন, যেখানে ভগবান অবতারলীলা প্রকাশ করেন দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরে। এখনও সব ভাবরাশি তাজা আছে ঐ পবিত্র স্থানে। সেখানে যে যায় তাতেই ঐ ভাব সংক্রামিত হয়। তাই তো যেতে বলি সবাইকে।

বেশ হলো, a good day's work, সারাদিনের পুণ্যকর্ম। যেদিন ভগবানের কাজে ব্যতীত হয় সেই দিনই সুদিন। এ ছাড়া সব দুর্দিন। এ উপার্জনই থাকবে অনন্ত কাল। আর সব উপার্জন শেষ হয়ে যাবে শরীর ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে।

উপাধ্যায় যায় নাই জানিয়া বলিলেন, ওটা ছিদ্র কলসী, ওটাতে জল ঢাললেও থাকবে না। শ্রীমর আদেশে ভক্তগণ সমস্বরে গাহিতেছেন রমণীর নেতৃত্বে: "রামকৃষ্ণ চরণ-সরোজে ভজ রে মনমধুপ মোর। কণ্টকে আবৃত বিষয় কেতকী, থেকো না থেকো না তাহে বিভোর।"

এই বার শ্রীম ডাক্তার ও বিনয়কে সঙ্গে লইয়া মোটরে মহরম দেখিতে গেলেন কারবালা ট্যাঙ্কে। শ্রীরামকৃষ্ণের উদার শিক্ষায় সকল ধর্মমতই শ্রীমর অতি প্রিয়।

২

মর্টন স্কুল। চারতলার সিঁড়ির ঘর। রাত্রি আটটা। শ্রীম দক্ষিণাস্য চেয়ারে বসা দোরগোড়ায়। শ্রীমর বাম পার্শ্বে ও সম্মুখে

ভক্তগণ বসা বেঞ্চিতে, বড় জিতেন, ডাক্তার, বিনয়, অমৃত, জগবন্ধু প্রভৃতি। কথাবার্তা হইতেছে। আকাশে বাঁকা চন্দ্র। আজ ১৩ই আগস্ট ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, ২৮শে শ্রাবণ ১৩৩১ সাল, বুধবার, শুক্লা ত্রয়োদশী। ১।১৮ পল, পরে চতুর্দশী ৫৪ দণ্ড'৫৬ পল।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—নববিধান ব্রাহ্মসমাজ থেকে আমাদের ভাদ্রোৎসবের নিমন্ত্রণ এসেছে। আগামী কাল থেকে আরম্ভ হবে। আপনারা সব যাবেন। ওখানে ঠাকুরের দৈবী স্পর্শ রয়েছে কি না। কতবার এসেছেন ওখানে। এটি একটি তীর্থ হয়ে রয়েছে। দর্শন করলে উদ্দীপন হয়। কেশববাবুকে কত ভালবাসতেন ঠাকুর। তাঁর ভিতর ঠাকুর নিজের উচ্চ উদার ভাব ঢুকিয়ে দিছলেন নিজে। তার জন্যই নববিধানে ভক্তগণ 'মা, মা' বলে পরম ব্রহ্মের উপাসনা করেন। ঠাকুরের ভক্তগণ, আপনারা গেলে ঐ ভাব আরো জাগ্রত হয়ে ওঠে। ঠাকুর বলেছিলেন, কুঁড়ো ফেল। তা হলে রাঙ্গাচোখ বড় রুই মাছ আসবে গভীর জল থেকে। অর্থাৎ ভাবরূপী মীনের আবির্ভাব হবে, ভগবানের উদ্দীপন হবে।

মানুষ বলে বেড়ায়, কই ভগবান। দেখতে পাচ্ছে না, চোখের সামনে। তাঁর কত চিহ্ন রয়েছে। প্রথম তো হলো অবতারই ভগবান। দ্বিতীয়, তাঁর সঙ্গের লোকেরা রয়েছেন। তাঁদের কাছে তাঁর জীবন্ত ভাব রয়েছে। সেই ভাবস্পর্শে তাঁরা ধন্য ও জগদ্‌বরেণ্য। তৃতীয়, তাঁর লীলাস্থল। যেমন দক্ষিণেশ্বর। জগতের লোক আসছে ওখানে, ঐখানে ঐ দিব্য ভাবের টানে। ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতিও তাঁর লীলাস্থল। পাঁচশো বছর পরে এ নিয়ে research (গবেষণা) হবে হয়তো, ঠাকুর এসেছিলেন কিনা ওখানে, এই বিষয় নিয়ে। হয়তো, তখন লোক বিস্ময় প্রকাশ করবে—ভগবান মানুষ-শরীর নিয়ে এখানেও এসেছিলেন, বলে। কিন্তু এখন যারা আছে তারা বিস্ময় প্রকাশ করছে না সময়ের নিকটে বলে। সকলে চিনতে পারে না কিনা অবতারকে। তাই নিকটে থেকেও ভগবান কোথায়, ভগবান আছেন কি না—করে করে বেড়ায়। আর

চতুর্থ হলো, ঠাকুরের মহাকাব্য—'কথামৃত'। অত সব প্রমাণ রয়েছে, জীবন্ত সব প্রমাণ, তবুও বিশ্বাস হচ্ছে না। এইটিকে বলে মায়া।

যাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে তারা এই সবের ভিতর ঈশ্বরের হাত, তাঁর মার্ক দেখতে পাবে। তারাই শ্রেষ্ঠ লোক জগতে। তারা পরমহংসের জাত।

অতো ছড়াছড়ি ঈশ্বরীয় ভাবের, সব জ্বল জ্বল করছে তবুও ঘুরে মরে—ঈশ্বর কই, ঈশ্বর কই বলে চীৎকার করে। এই তো মাত্র ক'টা বছর হয়েছে তিনি চলে গেছেন—মাত্র আটত্রিশ বছর। অত বড় মহাতীর্থ দক্ষিণেশ্বর রয়েছে, তাঁর ঘর, বিছানা-পত্র, খাট-পালং সবই রয়েছে। তারপর কত সাধু ভক্ত। তিনি যদি ভগবান না হবেন, তবে কার সাধ্য অত সব সোনার চাঁদ ছেলেদের পিতামাতা, বাড়ী-ঘর ছাড়িয়ে আনতে পারে? এই সব হীরের টুকরো ছেলেরা হৃদয়ে বুঝতে পারছে তাঁর প্রেমস্পর্শ। তাদের হৃদয়ে পৌঁছেছে তাঁর আহ্বান—এসো, তোমরা কে কোথায় আছ এসো। আমি এসেছি তোমাদের জন্য। 'আমায় ধর'। আমি ঠিক নিয়ে যাব তোমাদের এই সংসার সমুদ্রের অপর পারে যেখানে নিত্য সুখ শান্তি আনন্দ বিরাজমান। মধুর আকর্ষণে যেমন ভ্রমর আসে তেমনি এই সব নব যুগের নবীন যোগীগণ, সর্বস্ব ছেড়ে তাঁর চরণে আশ্রয় নিয়েছে। সংসার তাদের কাছে আলুনী লেগেছে। তাই তা ছেড়ে চলে এসেছে নবযুগের নবীন সন্ন্যাসীগণ সর্ব দুঃখ বরণ করে—অমৃতের আকাঙ্ক্ষায়।

এইটে সব চাইতে বড় প্রমাণ—ঠাকুর ভগবান।

শ্রীম (স্বগত)—এই ঘরের কাছে উৎসব তবুও যাবে না। নিমন্ত্রণ নাই বা হলো। (বড় জিতেনকে লক্ষ্য করিয়া) ঠাকুর রামবাবুকে বলেছিলেন, যেখানে ভগবানের কথা হয়, তাঁর উৎসব হয়, সেখানে এমনিই যাওয়া যায়, বিনা নিমন্ত্রণেও। ভগবানের নিজ মুখের বাণীও রয়েছে। নাহং বৈকুণ্ঠে তিষ্ঠামি, যোগীনাম্ হৃদয়ে ন চ। যত্র মদ্ভক্তাঃ গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

বড় জিতেন—ওদের কথা ভাল লাগে না। ঠিক ঠিক বলতে পারে না।

শ্রীম (উত্তেজিত ভাবে)—তাঁকে ঠিক ঠিক কে বলতে পারে? I challenge him—আমি তাকে বিচার-যুদ্ধে আমন্ত্রণ করছি। তা কি কেউ পারে? তাঁকে প্রকাশ কেবল তিনিই করতে পারেন ঠিক ঠিক। অন্য কেউ নাই ত্রিভুবনে। ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হয় না, ঠাকুর বলেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে।

সকলেরই একটা আবরণ হয়ে যায়। ঘর বাড়ী, দেহ মন, বুদ্ধি বাসনা, পূর্ব সংস্কার, education, environment (শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিকতা) এ সবের influence (প্রভাব) এসে পড়ে। তাতেই বোঝবার যো নাই ঠিক ঠিক। একটা shade (আবরণ) পড়ে যায় বুদ্ধির সামনে। এই আবরণটি মহামায়ার কাজ। ঠিক ঠিক কেবল সমাধিতে বোঝা যায়। বলতে গেলেই আবরণ থাকবে —যেমন বাল্ব, আলো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ছোঁয়া যায় না। তবুও ফাঁক দিয়ে যতটা বের হয়, ব্যবহার জানলে তাতেই হেউঢেউ।

এটি intellectual discussionএর (বুদ্ধি-বিচারের) কর্ম নয়। খুব rational (যুক্তিযুক্ত) হলেই লোকে বলে বেশ। বুদ্ধির ওপারের কথা। শুদ্ধ-বুদ্ধি হলেও ঠিক ঠিক বলতে পারা যায় না। বোঝে সে-ই, প্রাণ বোঝে যার।

ঠাকুরের জীবন্ত sparks (দিব্যজ্যোতিঃ-স্ফুলিঙ্গ) কেশববাবুতে ঢুকেছে। এর থেকে তাঁর শিষ্যদের কাছে এসেছে। Dim (হীনপ্রভ) হলেও ঐ অমৃতের কণিকা।



এখন রাত্রি প্রায় নয়টা। আকাশ ভরিয়া চাঁদের আলো বাহিরে। আগামী কাল পূর্ণিমা। শ্রীমর বাম হাতে হাই বেঞ্চির উপর একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বলিতেছে। তিনি ঘরে গিয়া 'কথামৃত' লইয়া আসিলেন। বলিলেন, একটু কথামৃত পাঠ হোক—এই বলিয়া জগবন্ধুর হাতে প্রথম ভাগের সপ্তম খণ্ড বাহির করিয়া দিলেন—

১৯শে আগস্ট, ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দ। উপস্থিত শ্রীম, অধর সেন, বলরাম, নরেন্দ্র, কাপ্তেন প্রভৃতি। চতুর্থ পরিচ্ছেদ পাঠ শেষ হইয়া গেল, সকলে নীরব। শ্রীম এইবার কথা বলিতেছেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—শুনছেন, যেখানে ঈশ্বরচিন্তা হয়, সেখানে বিনা নিমন্ত্রণেও যাওয়া যায়। নিজের যে লাভ তাতে। নিজে কৃতার্থ হয়। ঠাকুর কেশব সেনের কাছে যেতেন ঈশ্বরীয় কথা কইতে ও শুনতে। কাপ্তেন তা পছন্দ করতেন না। উনি বলতেন, কেশব সেন ভ্রষ্টাচার, উনি বাবু—সাধু নন। শুনে ঠাকুর আপত্তি করলেন, একেবারে মুখ বন্ধ করে দিলেন কাপ্তেনের। বললেন, তুমি যেতে পার লাট সাহেবের কাছে টাকার জন্য। তাতে দোষ নাই। আর আমি যাই কেশবের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা কইতে। সে ঈশ্বরচিন্তা করে, ঈশ্বরের নাম করে। তা হলেই হলো, যেখানে ঈশ্বরের নাম হয়, চিন্তা হয়, কথা হয়, সেখানে নির্বিচারে যাওয়া যায়। তা সংসারী লোক পছন্দ না করলেও।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—একজন ভক্তকে (শ্রীমকে) অষ্টাবক্র-সংহিতা দেখতে বলেছিলেন। কিন্তু ভক্তের ভাব শুদ্ধা ভক্তি। ভক্ত জ্ঞানও চান। একাধারে দু'টি। আজ নিজেই অষ্টাবক্র-সংহিতার কথা উত্থাপন করে সমাধান করলেন। বলছেন, একাধারে জ্ঞান-ভক্তি হতে পারে। কৃষ্ণকিশোরের নাম করলেন। বললেন, যার মনের গণ্ডী ভেঙ্গে গেছে সে ভক্ত হলেও জ্ঞান অভ্যাস করতে পারে। সাধারণ ভক্তের জন্য ভক্তিযোগের ব্যবস্থা দিলেন। গৃহস্থের পক্ষে জ্ঞানযোগ ভাল নয়। তার পক্ষে ভক্তিযোগ। কেমন সুন্দরভাবে দু'টি মতের মিলন করে দিলেন। বলছেন, ধোঁয়া দেয়ালকে ময়লা করে কিন্তু আকাশের কিছু করতে পারে না।

পাঠক—এর মানে কি ?

শ্রীম—সংসারী লোকের মন ছোট, সীমাবদ্ধ, নিজ দেহ, পুত্র কন্যা পরিজনাদিতে গণ্ডীবদ্ধ। জ্ঞানযোগে তার অনিষ্ট হবে—যেমন ধোঁয়াতে দেয়ালের অনিষ্ট হয়। কিন্তু যার মন গৃহে থেকেও

ভগবানে নিমগ্ন, এইরূপ উচ্চাধিকারীর—আমি ব্রহ্ম, সোঽহং, এ সব ভাব অনিষ্ট করতে পারে না, যেমন কৃষ্ণকিশোর, যেমন পাণ্ডবগণ বলেছিলেন, প্রহ্লাদের জ্ঞান ভক্তি দুই-ই ছিল। অধিকারী সন্ন্যাসী যেমন জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ একসঙ্গে অভ্যাস করতে পারে, তেমনি অধিকারী ভক্তও ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ এক সঙ্গে অভ্যাস করতে পারে। পরম ভক্তিতেও গণ্ডী ভেঙ্গে যায় আবার জ্ঞানেতেও ভাঙ্গে। যোগীরা ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়ই।

মোহন—দেশপ্রেমিকরা সকলকে ভালবাসে নিজের দেশের। এটাও কি দয়া ?

শ্রীম—না। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন এই বুদ্ধিতে যে ভালবাসা সেটা দয়া। ঠাকুর তো তাই বললেন। আমার দেশ, আমার দেশবাসী—এতেও অজ্ঞানের আবরণ আছে। জগতের জীবমাত্রেই ঈশ্বর আছেন, এটি দয়া। আমার আত্মীয়—স্ত্রী পুত্র কন্যা, এ ভাব অজ্ঞান থেকে হয়। ভগবান এ সকলের ভিতর আছেন, এ ভাব দয়া থেকে হয়। এদের দেখাশোনা করা, সেবা করা যদি ঈশ্বরবুদ্ধিতে হয় তবে এর দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি হতে পারে। ভক্তিলাভ হবে ক্রমশঃ ভগবানে। মায়া থেকে দয়া বড়, দয়া থেকে ঈশ্বরবুদ্ধিতে সেবা আরো বড়।

আমার পরিজনের সেবা থেকে আমার দেশের সকলের সেবা বড়। তার চাইতে বড় সর্বভূতের ভিতর ভগবান আছেন এই ভাব নিয়ে সেবা।

ঠাকুর বিদ্যাসাগর মশায়কে দেখতে গিছলেন এই জন্য। তিনি পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডী ছাড়িয়ে জনসাধারণের সেবা করতেন বলে। কিন্তু এরও উপরে আর একটি আছে। সেটি সর্বভূতে ঈশ্বরের সেবা। উপলক্ষ সর্বজীব, কিন্তু উদ্দেশ্য ঈশ্বরের সেবা। এইটি বলতে গিছলেন বিদ্যেসাগর মশায়কে। বলেছিলেন, তুমি এই সব সেবা-কার্য করছ। যদি নিষ্কাম হয়ে কর, অর্থাৎ ঈশ্বরবুদ্ধিতে কর, তবে চিত্ত শুদ্ধ হবে, ঈশ্বরলাভ করতে পারবে। বিদ্যেসাগর মশায় এটা

ধরতে পারেন নাই। গান্ধী মহারাজের সেবা—ঈশ্বরবুদ্ধিতে সেবা, এটা খুব বড়। তিনি দেশপ্রেমিক নন, দেশবাসীর ভিতর যে 'রাম' আছেন তাঁর প্রেমিক। দেশপ্রেমিক থেকে বড় 'রাম'-প্রেমিক।

অন্তেবাসী—ঠাকুর বললেন, মনের উপর থেকে অজ্ঞানাবরণ যত কমবে বিক্ষেপও তত কমবে। ঐ ঈশ্বরে মতি-গতিও তত বাড়বে। সাগরের নিকট নদীতে জোয়ার ভাঁটা দেখা যায়। এই আবরণ কমে কি করে?

শ্রীম—সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবায়। আর ঈশ্বরের নাম গুণ কীর্তন। সাধুদের আবরণ কমে গেছে। তাদের সেবা ও সঙ্গ করলে তাদের মতই হয়ে যায়।

বড় জিতেন—জ্ঞানীর ভিতর একটানা গঙ্গা প্রবাহিত, এটা বোঝা গেল না, এটা কি?

শ্রীম (উচ্চ হাস্যে)—এটা ছাড়া বাকী সবটাই বুঝে ফেলেছেন তো? মানে, জ্ঞানীরা বলে—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। আর তার সঙ্গে যোগ করে দেয়—অহং ব্রহ্মাস্মি, সোঽহম্। ব্রহ্ম সত্য—এটা ধরে থাকে জ্ঞানীরা। বলেছিলেন, যেমন একজন বাঁশিতে একটা শব্দ ধরে থাকে 'ভোঁ'। আর অন্যরা নানা রাগ-রাগিণী বাজায়। এটা হলো ভক্তিযোগ। ভক্তরা ভগবানের সঙ্গে লীলা বিলাস করে। গঙ্গায় সাঁতার দেয়, কখনও ডোবে কখনও ওঠে—ব্রহ্মসমুদ্রের বরফ হয়ে টাপুর টুপুর করে।

কলিকাতা। ১৩ই আগস্ট, ১৯২৪ খ্রীঃ ২৮শে শ্রাবণ ১৩৩১ সাল
বুধবার, ত্রয়োদশী ১।১৮ পল, পরে চতুর্দশী ৫৪।৫৬ পল

ঊনবিংশ অধ্যায়

ঠাকুরের ভাব যে ধারণ করে সে ধন্য

আজ পূর্ণিমা তিথি। ভাদ্রোৎসব। মেছুয়াবাজারের নববিধান ব্রাহ্মসমাজে সারাদিনব্যাপী উৎসব। মন্দিরের বাহিরে ও অভ্যন্তরে সর্বত্র নানারূপ পত্রপুষ্প ও নানা রঙের বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সজ্জিত। সকাল হইতে ভজন কীর্তন, সারমন (sermon) হইতেছে। ব্রাহ্ম ভক্তগণ নির্মল বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিতেছে যাইতেছে। খোলের সহযোগে কীর্তনের ধ্বনি রাজপথে শোনা যাইতেছে। মন্দিরের ভিতর 'পুলপিটে' বসিয়া আচার্যগণ (প্রমথ সেন আদি) কখনও বক্তৃতা করিতেছেন, কখনও 'মা মা' রবে ব্রহ্মময়ীর উপাসনা করিতেছেন।

এখন সকাল সাতটা।

শ্রীম অন্তেবাসীকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, পশ্চিম দিকে উত্তরের দরজা দিয়া। শ্রীমর মন অন্তর্মুখীন। বুঝি বা শ্রীরামকৃষ্ণের এই মন্দিরে শুভাগমনের কথা ভাবিতেছেন। শ্রীম যেন লুকাইয়া ব্রহ্মরস উপভোগ করিতেছেন। ব্রাহ্ম ভক্তগণের নিকট তিনি সুপরিচিত হইলেও, তাঁহার ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে, তিনি দীনহীনভাবে এই ভগবৎমন্দিরে বসিয়া, যেন অপরের অলক্ষ্যে ভগবানের আনন্দ সম্ভোগ করিতে চান। অপর লোক আসিয়া সম্মুখে আসন গ্রহণ করিতেছেন। শ্রীম সকলের পিছনে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, ভগবানের কাছে দীনহীনভাবে যাইতে হয়। তবেই অন্তরে প্রেমানন্দের সঞ্চার হয়। উঁচু ঢিপিতে জল দাঁড়ায় না।

একটি ভক্ত শ্রীমর পাশে বসিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টি ও মনোযোগ শ্রীমর উপর। আচার্যের সারমন কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু মনের সংযোগ শ্রীমর মুখমণ্ডলে প্রতিবিম্বিত ভাবপ্রবাহে সন্নিহিত থাকায়,

অন্তরে রেখাপাত করিতে পারিতেছে না। ভক্ত ভাবিতেছেন, গতকাল ভক্তসংসদে শ্রীম বলিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা কেশববাবুর ভিতর দিয়া এই সমাজ-মন্দিরে ঢুকিয়াছে। এখন dim (ক্ষীণপ্রভ) হইলেও ইহা ঐ অমৃতের কণিকা। ভক্ত দেখিতেছেন, শ্রীম যেন অনর্গল বচনবিলাসের বারিধি মন্থন করিয়া ঠাকুরের অমৃত-কণিকা আহরণ করিতেছেন। আর একটি জিনিস ভক্ত লক্ষ্য করিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট স্নাতক বহু দৈবীগুণসম্পন্ন শ্রীম, কি করিয়া এই নিরভিমানিতার ঐশ্বর্য লাভ করিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যে সমাজ-মন্দিরের বাহিরের রাজপথে আসিয়া ভক্তকে বলিতেছেন, সরল ব্যাকুল অন্তরে ডাকিলে মা ব্রহ্মময়ী কৃপা করেন। আর বিষয়বুদ্ধি পরিত্যাগ না করিলে মায়ের কোলে আশ্রয় লাভ করা যায় না। মা তো সদাই আশ্রয় দিতে চান, কিন্তু আশ্রয় চায় কয় জন? প্রমথবাবুর এই কথাগুলি ঠাকুরের অমৃত-কণিকা। কেশববাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র ইনি। তিনি অনেকবার ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছেন। কেশববাবুর ভিতর দিয়া এই সব অমৃত-কণিকা তাঁহার ভক্তদের ভিতর সঞ্চারিত হইয়াছে। ওখানে গেলে এই সব লাভ হয়। ঠাকুর কি দুইটি লোকের জন্য আসিয়াছেন? তাঁহার আগমন জগতের সকলের কল্যাণের জন্য। যে যতটা ধারণ করিতে পারিয়াছে তাঁহার ভাব, সে তত ধন্য। তাঁহার মহাবাক্য নানা যন্ত্রের ভিতর দিয়া জগৎময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। যত দিন যাইবে, লোক ততই ঠাকুরের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবে।

অপরাহ্ন পাঁচটা। শ্রীম অন্তেবাসীর ঘরে আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, যান যান নববিধানে, এখন আবার বক্তৃতা হবে। আর ভজন শুনবেন। ত্রৈলোক্যবাবুকৃত গানগুলিও লেখা হয়েছে ঠাকুরের নানা ভাবের ভিত্তির উপর। এগুলিও শুনতে হয়। চারদিক হতে বহির্মুখীন মনকে ঠাকুরের কথামৃত-বাণে বিদ্ধ করলে তবে হয়। Relentless efforts (অবিরাম চেষ্টা) চাই। তবে যদি মন বশে আসে। একবার ছাড়া পেলে মন লক্ষ যোজন দূরে

ফেলে দেয়। রণক্ষেত্রে যেন সৈনিক, এমন হওয়া চাই। বার বার চেষ্টা করছে, কখনও একটু এগুল, আবার পিছে পড়ে গেল। আবার এগুল। এই করে যুদ্ধ করতে হয় মনের সঙ্গে—'মারি নয় মরি' এই পণ করে। একেও (উপাধ্যায়কে) নিয়ে যান। দেখলে উদ্দীপন হবে। আমরাও আসছি একটু পরে। অতগুলি ভক্ত তাঁকে ডাকছে। সেখানে তাঁর আবির্ভাব হয়। যান যান, অমন দিন আর হয় না।

এক ঘণ্টা পর, ছয়টার সময় শ্রীম পুনরায় নববিধানে আসিয়াছেন। সঙ্গে অনেকগুলি ভক্ত—মুকুন্দ, ডাক্তার, বিনয়, বড় অমূল্য, ছোট নলিনী, বলাই প্রভৃতি। 'হিলিংবাম'ও (দুর্গাপদ ঘোষ) আসিয়াছেন। শ্রীম জোর করিয়া সকলকে লইয়া আসিয়াছেন। তিনি জানেন, মানুষের দুর্বলতা। অহংকারে অন্ধ মানুষ। কিন্তু এই সব পাকা আচার্য কৌশলে ভক্তগণকে আনিয়া ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দেন অমৃত-সাগরে। তখন তাহারা আনন্দে সুধা-রস পান করে। এই অহংকারের আবরণ যিনি ভেদ করিয়া দেন তাঁহাকেই বলে গুরু। অমৃতরসের সন্ধান পাইলে মধুকরের মত শেষে আপনি যায় মধুসংগ্রহে। ভিতরের মনটাতে আনন্দের সন্ধান পাওয়াইয়া দেওয়াই অবতার ও তাঁহার পার্ষদের কার্য।

সমাজ-মন্দিরের পশ্চিমাংশে শ্রীম বসিয়া আছেন ভক্তসঙ্গে। অনেকক্ষণ বক্তৃতা হইল। এইবার আরতি, বেদীর সামনে। ব্রাহ্ম ভক্তগণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপদানে মোমবাতি জ্বালাইয়া নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের আরতি করিতেছেন। হাতের দীপ তালে তালে উচ্চে নিচে আন্দোলিত হইতেছে। আর মুখে, 'জয় মা, জয় মা' ধ্বনি। মগ্ন হইয়া কেহ কেহ মৃদু নৃত্যে হাতের দীপ দিয়া শূন্যে অর্ধগোলাকার বৃত্ত অঙ্কিত করিতেছে, চক্ষু নিমিলিত কাহারো কাহারো। কেহ কেহ ভাবে মগ্ন। সেই ভাব মুখমণ্ডলে অঙ্কিত। উহাতে মুখমণ্ডল মনোরম দেখাইতেছে।

এক ঘণ্টা আজিকার উৎসবানন্দ উপভোগ করিয়া শ্রীম ভক্তসঙ্গে বাহির হইয়া আসিলেন। এখন সন্ধ্যা সাতটা।

মর্টন স্কুলের সম্মুখে ফুটপাথে দাঁড়াইয়া শ্রীম ভক্তদের সহিত কথা বলিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আজ পূর্ণিমা, আবার ঝুলন। আরো আছে। আজ আবার চন্দ্রগ্রহণ। সনাতন ধর্ম আজ মূর্তিমান হয়ে উঠবে। লক্ষ লক্ষ লোক আজ গঙ্গাস্নান করবে। এসব দৃশ্য দেখলে মনে হয়, তা হলে কিছু আছে এতে।

ডাক্তার বক্সী—মোটর তো রয়েছে সঙ্গে, তা হলে একবার চলুন গঙ্গায়।

শ্রীম মোটরে আরোহণ করিলেন। সঙ্গে গেলেন ডাক্তার, বিনয়, বড় অমূল্য ও ছোট নলিনী। বড়বাজার ঘাটে গঙ্গা ও ভক্ত যাত্রী দর্শন করিয়া ফিরিবার সময় কাশী মল্লিকের ঠাকুরবাড়ীতে ঝুলন দেখিলেন। আবার বড়বাজার ঘাটে গেলেন। তারপর গঙ্গার ধার ধরিয়া নিমতলা শ্মশানঘাট পর্যন্ত গেলেন। সর্বত্রই অসংখ্য লোক স্নান করিতেছে। বৈদ্যুতিক আলোকে সব ঘাট দিনের মত দেখাইতেছে। স্বেচ্ছাসেবকগণ স্নানার্থীদিগকে সাহায্য করিতেছে। তারপর দর্শন করিলেন বাগবাজারের মদনমোহন-মন্দির। এখানেও ঝুলন। এবার ঠনঠনিয়ার মা-কালীকে দর্শন করিতেছেন।

জগবন্ধু, বলাই ও রজনী ইতিপূর্বেই কালীবাড়ীতে বসিয়া ধ্যান ও জপ করিতেছিলেন। শ্রীম ও ভক্তগণ আসিয়া তাঁহাদের পার্শ্বে বসিলেন। অল্পক্ষণ পরে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া শ্রীম হাতে চরণামৃত লইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ঠাকুরবাড়ীতে যাইবেন।

জগবন্ধু বলিলেন, কি সুন্দর রাত্রি—পূর্ণিমা, আবার চন্দ্রগ্রহণ। আজ রাতটা মঠে কাটালে হয়।

ডাক্তার সমর্থন করিলেন। মোটরে পুনরায় আহিরীটোলা ঘাটে আসিলেন ভক্তগণ—জগবন্ধু, ডাক্তার, বিনয়, বলাই, ছোট নলিনী। এক টাকা দিয়া একটি নৌকা করিয়া ভক্তগণ ভাসিলেন গঙ্গাবক্ষে।

হাওয়া ও জোয়ার দুই-ই অনুকূল। নৌকা অতি বেগে

চলিতেছে। শিরোপরি পূর্ণচন্দ্র। তাহার কিরণ জলে প্রতিবিম্বিত। জল চক্ চক্ করিতেছে। মা যেন আজ নৃত্যময়ী। কলিকাতা হইতে বরানগর পর্যন্ত গঙ্গার দুই তীরে বৈদ্যুতিক আলো মালার মত দুলিতেছে। চন্দ্রগ্রহণের জন্যই এই বিশেষ আয়োজন। সহস্র সহস্র স্বেচ্ছাসেবক দাঁড়াইয়া আছে স্নানার্থীদের সেবায়।

শালিখায় গঙ্গাতীরে এক মাড়োয়ারী ভক্তের বাগানবাড়ীতেও আজ ঝুলন। সেখানেও বৈদ্যুতিক আলোর ছড়াছড়ি। তাহার আভায় আকাশ উদ্ভাসিত।

ভক্তগণ এই সব দেবদৃশ্য দেখিতেছেন, আর চলিতেছেন, উত্তর দিকে গান গাহিতে গাহিতে।

গান। গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি কাশীকাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায়॥

গান। আমায় দে মা পাগল করে (ব্রহ্মময়ী)
আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে॥
তোমার প্রেমের সুরা পানে কর মাতোয়ারা
ওমা ভক্ত চিত্তহরা ডুবাও প্রেমসাগরে॥
তোমার এ পাগলা গারদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে,
কেহ নাচে আনন্দভরে ;
ঈশা মুসা শ্রীচৈতন্য, ওমা প্রেমের ভরে অচৈতন্য,
হায় কবে হব মা ধন্য, (ওমা) মিশে তার ভিতরে॥
স্বর্গেতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেমনি চেলা,
প্রেমের খেলা কে বুঝতে পারে ;
তুমি প্রেমে উন্মাদিনী, পাগলের শিরোমণি,
প্রেমধনে কর মা ধনী, কাঙ্গাল প্রেমদাসেরে॥

গান। ভবে সেই সে পরমানন্দ।
যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে॥
সে জন না যায় তীর্থপর্যটনে কালী ছাড়া কথা না শুনে কানে,
সন্ধ্যাপূজা কিছু না মানে, যা করেন কালী সে-ই সে জানে॥

কালীর চরণ যে করেছে মূল, সহজে হয়েছে বিষয়েতে ভুল,
ভবার্ণবে পাবে সে কূল, মূল হারাবে সে কেমনে ॥
রামকৃষ্ণ কয় এমন জনে, লোকের নিন্দা না শুনে কানে
আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে কালী নামামৃত পীযূষপানে ॥

গান। এসেছে নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে,
(তাঁর) বিবেক-বৈরাগ্য-ঝুলি দুই কাঁধে সদা ঝুলে।
শ্রীবদনে মা মা বাণী পড়ি গঙ্গা সলিলে,
(বলে) ব্রহ্মময়ি, গেল মা দিন দেখা ত নাহি দিলে ॥
নাস্তিক অজ্ঞানী জনে সরল কথায় শিখালে,
যেই কালী, সেই ব্রহ্ম, নাম ভেদ এক মূলে ॥
'একোয়া' 'ওয়াটার' 'পানি' 'বারি' নাম দেয় এক জলে,
'আল্লা' 'গড' 'ঈশা' 'মুশা' 'কালী' নাম ভেদে বলে ॥
দীন ধনী মানী জ্ঞানী বিচার নাই জাতি কুলে,
আপন-হারা পাগল-পারা সরলে নেহারিলে ॥
দুবাহু তুলিয়ে ডাকে, আয়-রে তোরা আয় চলে,
তোদের তরে কৃপা করে বসে আছি বিরলে ;
যতন করি পারের তরী বেঁধেছি ভবের কূলে ॥

রাত্রি সাড়ে এগারটা। ভক্তদের নৌকা আসিয়া মঠের ঘাটে লাগিয়াছে। মঠ নীরব, প্রকৃতি নীরব, নীরব গঙ্গাবক্ষ। সব নীরব। ভক্তগণ নীরবে ঠাকুরঘরের সোপানে প্রণাম করিলেন। অতঃপর মহারাজ, মা ও স্বামীজীর মন্দিরে প্রণাম করিয়া মঠের ঘাটে ফিরিলেন। মঠের অঙ্গনে স্বামী বিজয়ানন্দ ভক্তদের অভ্যর্থনা করিলেন সাদরে।

গঙ্গার ঘাটে অনেকগুলি সাধু বসিয়া আছেন—ভাব মহারাজ, বসন্ত মহারাজ, সনৎ মহারাজ, প্রভৃতি। সাধু ও ভক্তগণ পুনরায় সমস্বরে গাহিতেছেন, 'এসেছে নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে।'

গ্রহণ লাগিয়াছে রাত্রি সাড়ে বারোটায়। সকলে বসিয়া ধ্যান-

জপ করিতে লাগিলেন। স্বামী প্রবোধানন্দ একাসনে ভোর পর্যন্ত বসিয়া রহিলেন। ভোর হইয়াছে, গঙ্গার অপর পারে কোলাহল শোনা যাইতেছে। স্নানার্থীগণ মুক্তি-স্নান করিতেছেন।

কি দেবদৃশ্য! গঙ্গার পশ্চিম তট। সর্বত্যাগীগণের আশ্রম। সম্মুখে পতিতপাবনী জাহ্নবী। অদূরে মহাতীর্থ, বর্তমান জগতের— দক্ষিণেশ্বর। ঐখানে শ্রীভগবান নরদেহে ত্রিশ বৎসর ধরিয়া অবতার-লীলা করিয়াছেন। আবার অপর পারে কাশীপুর মহাশ্মশান। যেখানে নরদেহী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নশ্বর দেহকে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইয়াছে। গঙ্গার উভয় তীরে বিজলীর মালা।

সারা রাত সাধু ও ভক্তগণ ধ্যান ভজনে কাটাইতেছেন। ভগবদ্ভাব-সঞ্চারী, হৃদয়োন্নয়নকারী কি পবিত্র দৃশ্য! মানুষের জীবনে এই দেবদৃশ্য দর্শন ও আনন্দ সম্ভোগের সুযোগ একদিনের জন্য হইলেও সে ধন্য, কৃতকৃত্য। শাস্ত্রবিবৃত বৈকুণ্ঠ-সুখের কথা সত্য হইলে সাধারণ মর্ত্য-জনগণের নিকট কল্পনার দৃষ্টিতে অনুভূত। আর আজের এই আনন্দ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জীবন্ত অনুভূতি। বহু পুণ্যফলে এ সম্মিলন ঘটে।

আজ রজনীতেও কেহ কেহ সকল কলুষপূর্ণ কর্মে নিরত! আর এই সাধু ভক্তগণ এই পবিত্র মঠভূমিতে বসিয়া সকল কলুষহারীর ধ্যানে নিমগ্ন। ধন্য সাধুগণ, ধন্য ভক্তগণ, ধন্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ! ধন্য তাঁহার পার্ষদগণ শ্রীম প্রভৃতি! তাঁহাদের দিব্যস্পর্শে ভক্তগণের হৃদয়মন্দির উন্মুক্ত, দিব্য আনন্দ উপভোগে তাহারা সমর্থ। একজন আনন্দে আপ্লুত হইয়া প্রভাতে গাহিতেছেন:

গান। ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম,
অপূর্ব শোভন ভবজলধির পারে, জ্যোতির্ময়।
শোকতাপিত জন সবে চল, সকল দুঃখ হবে মোচন;
শান্তি পাইবে হৃদয় মাঝে, প্রেম জাগিবে অন্তরে।
কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ, না জানি কি ধ্যানে মগন,
স্তিমিত-লোচন কি আনন্দরস পানে ভুলিল চরাচর;

কি সুধাময় গান গাহিছে সুরগণ, বিমল বিভুগুণ-বন্দন ;
কোটি চন্দ্র তারা উলসিত, নৃত্য করিছে অবিরাম ॥

কলিকাতা
১৪ই আগস্ট, ১৯২৪ খ্রীঃ, ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল
বৃহস্পতিবার, গ্রহণপূর্ণিমা, ৫।১।৫৩ পল

বিংশ অধ্যায়

ঠাকুরের লীলাস্থলী ভারতের জাতীয় মনুমেণ্ট

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। সন্ধ্যার কিছু দেরী আছে। শ্রীম চেয়ারে উত্তরাস্য বসিয়া আছেন। সম্মুখে তিনদিকে বেঞ্চিতে বসা ভক্তগণ। শ্রীম অবতার, তীর্থ ও ভারতীয় সংস্কৃতির কথা কহিতেছেন। বেলুড় মঠের স্বামী গিরিজানন্দ আসিয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। পুনরায় তাঁহার সহিত ঐ সকল কথার পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

শ্রীম—আমার আন্তরিক ইচ্ছা কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানটি মঠের হাতে আসে। এখানে ঠাকুরের দেহাবশেষ রয়েছে। স্বামীজী নিজের মাথায় দেহাবশেষের কলসীটি এনে এখানে সমাহিত করেছিলেন। আবার ঠাকুর রাম দত্ত মশায়ের এই বাগানে এসেছিলেন। নিচের বৈঠকখানায় বসেছিলেন। আর মন্দিরের পূর্ব দিকের তুলসীকুঞ্জে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেছিলেন। আবার রামবাবু এইখানে থেকে সর্বদা ঠাকুরের চিন্তা করতেন। এই সব আগুন এখানে রয়েছে। এ-টি একটি মহাতীর্থ। রামবাবুর শরীর যায় এইখানে। আমরা অনেকবার অনেক সাধু ভক্তদের নিকট বলেছি এ-টি মঠের হাতে যায়।

আর কাশীপুর উদ্যান। এ-টিও মঠের হাতে গেলে ভাল হয়। আমরা খবর করেছিলাম। লাখখানেক হলে পাওয়া যায়। এখানে ঠাকুর দশ মাস ছিলেন। ভক্তসঙ্ঘ তৈরী হয় এখানেই। স্বামীজীকে নির্বিকল্প সমাধি প্রদান করেন এখানে। ভক্তদের যাকে যা কিছু দেবার এখানেই দিয়ে যান। এখানেই বলেছিলেন, যে রাম যে কৃষ্ণ সেই-ই ইদানীং রামকৃষ্ণ। পরে এ সব স্থান দর্শন করতে জগতের সব লোক আসবে। অযোধ্যা, দ্বারকা, কুশীনারা দেখতে যেমন লোক যায়।

এ সব স্থান মঠের হাতে থাকা উচিত। কারণ মঠ একটা organisation (প্রতিষ্ঠান)। এর বহুকাল ধরে একটা পরম্পরা চলছে। কোন ব্যক্তির হাতে থাকলে তাতে কলুষ শীঘ্র আসে। একজন হয়তো খুব ভক্তিভাবে চালালো। কিন্তু অপরদের কাছে একটা দায়সারা কাজে পরিণত হতে পারে। মঠের সাধুরা তো সর্বস্ব ত্যাগ করে এসেছেন। ঠাকুরকেই জীবনের সর্বস্ব করে এসেছেন। তাই তাঁরা এই সব পুণ্যস্মৃতি রক্ষায় সশ্রদ্ধ ও অবহিত থাকবেন সর্বদা। তাই ঠাকুরের সব স্মৃতিস্থানগুলি মঠের হাতে আসা উচিত। পরে এ সব মহাতীর্থ হবে সকলের কাছে। এখন পবিত্র কেবল ভক্তদের কাছে। যত দিন যাবে ততই ঠাকুরের নাম প্রচার হবে। ততই এ সব স্থানের মাহাত্ম্যও বাড়বে। এই সব ভবিষ্যতে ভারতীয় ভাবধারার national monuments (জাতীয় স্মৃতিতীর্থ) হবে।

দেখ না, অদ্যাবধি ক'টা রণবীরের স্মৃতিতীর্থ পূজিত হয়ে আসছে! কিন্তু ধর্মবীরগণ স্মরণাতীত কাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতে পূজিত। ঋষিরা কবে এসেছিলেন—ভৃগু বশিষ্ঠাদি। কিন্তু আজও তাঁদের নাম সর্বত্র বিঘোষিত। রামকে কৃষ্ণকে কয়জন বীরভাবে পূজা করে? সকলেই তাঁদের পূজা করে—ঈশ্বরের অবতার বলে।

অতি উচ্চ চিন্তা করেছেন ঋষিরা। সে চিন্তার বিনাশ নাই। সেই চিন্তার সঙ্গে তাঁদের নামটিমাত্র কালের প্রবাহে ভেসে এসেছে।

কেন? কারণ তাঁরা যে চিন্তাটি করেছেন সে-টি অজর অমর সুখশান্তি-স্বরূপ। তাই মানুষ সে-টি বহন করে নিয়ে এসেছে—হৃদয়ে ধারণ করে।

লোক বলে এটা ভাল, ওটা ভাল—এটাতে সুখ, ওটাতে সুখ। এই করে করে যখন তাদের কল্পিত সব সুখ শেষ হয়ে যায়, যখন দেখে, জাগতিক এটা-ওটাতে অনাবিল সুখ নাই, বুঝতে পারে, বিষয় থেকে উৎপন্ন সুখের সঙ্গে দুঃখ বিজড়িত, অতএব এতে একটানা সুখ নাই। তখনই তারা বৃহৎ সুখের, ব্রহ্মানন্দের সন্ধান করে। সেই বড় সুখের সন্ধানের সঙ্কেত ঋষিরা আমাদের জন্য রেখে গেছেন, তাই তাঁরা চিরপূজ্য।

জীবগণকে, ভক্তগণকে দুঃখসমুদ্রে ভাসমান দেখে ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। এসে পুনরায় নূতন করে ব্রহ্মচিন্তা জাগ্রত ও জীবন্ত করে দেন। তখন ব্যক্তি ও সমাজে শান্তি, তখন সুখ।

ঋষিগণ জীবগণকে 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলে আহ্বাম করেছেন। কত ভরসা! পিতামাতার মত বলেছেন—বাছা, যখনই কোথাও সুখ শান্তি সত্যিকার মিলবে না, তখনই এই মহাবাক্যের আশ্রয় নিও। তখন তোমাদের 'লুপ্ত জ্ঞান' ফিরে আসবে, সুপ্ত চৈতন্য জাগ্রত হবে। ঠাকুরও অবতাররূপে এই মহাবাক্যই রেখে গেছেন আমাদের জন্য। বলেছিলেন, যখন কোথাও যথার্থ সুখ শান্তি পাবে না, তখন প্রার্থনা করো, জগতের পেছনে যদি কেউ থাক তবে আমার সুখ শান্তি বিধান কর। নিশ্চয় তিনি এসে সুখ শান্তি দিয়ে যাবেন। এ সব তো মানুষের কথা নয়, ভগবানের নিজ মুখের কথা। মানুষ বিশ্বাস করতে পারে কই? তাঁরই মায়াতে মুগ্ধ জীবগণ। তাই আবার প্রার্থনা করতেও শিখিয়ে গেছেন—মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না মা, শরণাগত শরণাগত।

ঋষিদের, অবতারদের মহাবাক্য যুগে যুগে মানুষ-শরীর ধারণ করেন। স্থান ও কালের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে এই মহামানবগণ এই দুঃখময় জগতে শান্তি সুখের মরূদ্যানের সৃষ্টি করেন। তাঁদের চরণ-চিহ্নিত ঐ সব স্থানই তীর্থ নামে পরিচিত।

ঠাকুরের নামের সঙ্গে বিজড়িত কোন্ চিন্তা, কোন্ সুখ? যে চিন্তা, যে সুখ চিরকাল স্থায়ী, তাই—'The everlasting peace and happiness'—'পরাং শান্তিং', 'ভূমা'। 'ভূমা বৈ সুখং ; নাল্পে সুখমস্তি'।

এই দুঃখময় সংসারে কি করে মনকে আনন্দময় সর্বদা রাখা যায়, সে উপায় তিনি দেখিয়ে গেছেন—কথায় ও নিজের জীবনে। যেন নৌকোর বাচ খেলা হচ্ছে। এই ব্রহ্মানন্দে মগ্ন, জগতের জ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত। পরক্ষণই ব্যুত্থিত হয়ে দেখছেন, সেই ব্রহ্মই জীব জগৎরূপে প্রকাশিত। তখন বলছেন, 'মা, মা'। ব্রহ্মকেই মা বলছেন—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'।

জগৎকে ছাড়েন নাই তো। জগৎকে ব্রহ্মময় করে রেখেছেন। ছাদ ও সিঁড়ি একই চূণ-সুরকিতে গঠিত। জীবকে বলেছেন, তুমি বড় ঘরের ছেলে, এটা জেনে সংসারে থাক। এরই নাম ব্রহ্মজ্ঞান। তা হলে এখানকার সুখ দুঃখের সংঘাতে অভিভূত হবে না। সর্বাবস্থায় স্থির থাকতে পারবে। খেলনাতে ভুলবে না। মনে থাকবে আমি অমৃতের সন্তান।

আবার বলছেন, মন যদি একেবারে ব্রহ্মচিন্তায় নিবিষ্ট না হয়, তা হলে এই সব জীবগণকে ব্রহ্মের সাকার রূপ বলে দেখতে আরম্ভ কর—'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্'। এদের শ্রদ্ধা কর, ভক্তি কর, সেবা কর। তা হলেও চিত্ত শান্ত হবে, সেই শান্ত চিত্তে সুখ অনুভূত হবে সর্বাবস্থায়। এ-টি practical vedanta—দৈনন্দিন জীবনে আচরণীয় বেদান্ত।

এইরূপে দুটো extreme (প্রান্ত)—আপাতবিরুদ্ধ প্রতীয়মান দুটি ভাবের সম্মিলন করেছেন। True to the kindred points of heaven and earth—ব্রহ্ম ও জীব জগতের সম্মিলন করে দিয়েছেন—ব্রহ্ম point of view—ব্রহ্মদৃষ্টি দিয়ে। এই দৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্বটাই ব্রহ্মময় হয়ে যায়, ঈশ্বর সম্পর্কে পবিত্র হয়ে যায়।

Western evolutionists পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশবাদীদের এ

দৃষ্টি নাই। তারা নিম্নদৃষ্টি দিয়ে জগৎকে দেখছে। জগতের স্রষ্টার দিকে তাদের দৃষ্টি নাই। ডারউইন এই নিম্নদৃষ্টি দিয়ে জগৎকে দেখে বলছেন, মানুষ সৃষ্ট জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পাথর, পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী হতে ক্রমে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। Involution, অর্থাৎ ঈশ্বরই এই সব হয়ে আছেন, এ কথা তারা মানে না। এ দৃষ্টি তাদের নাই। এই দৃষ্টি হয় আত্মদ্রষ্টাদের, ব্রহ্মদ্রষ্টাদের। জগতের পশ্চাতে এক মহা চৈতন্যশক্তির দ্রষ্টাদের। তাঁরা বলেন, 'সদেব সৌম্য ইদমগ্রে আসীৎ একমদ্বিতীয়ম্'। ঠাকুর আরও স্পষ্ট করে এই নাস্তিক যুগে জোর দিয়ে বলেছেন, আমি কি বিচার করবো, আমি দেখছি মা-ই এই সব হয়ে রয়েছেন।

(সহাস্যে) missing link (হারানো সম্পর্কটা) খুঁজে পাচ্ছিল না তারা—মানুষের পূর্বাবস্থাটা কি ছিল। অনেক গবেষণার পর বললো—বানর মানুষের পূর্বপুরুষ।

একজন ভক্ত—নিচের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে তো মনে হয় এ কথা ঠিক। বানরের অনেক কাজে মানুষের বুদ্ধির প্রকাশ পায়।

আর এক ভক্ত—ঠাকুরের দৃষ্টি বানরদের উপরও পড়েছে। বলেছিলেন, একদিন দেখলাম কতকগুলি বানর পঞ্চবটীতে বসে আছে, কি শান্ত, যেন ধ্যান করছে। একটু পরেই দেখি লংকাকাণ্ড—লাফালাফি, দৌড়াদৌড়ি হুলুস্থুলু ব্যাপার। আচ্ছা, এই বানরদের কি মুক্তি হবে, ঠাকুরের দৃষ্টি তো তাদের উপর পড়েছে?

শ্রীম—হাঁ, দক্ষিণেশ্বরে অনেক বানর ছিল তখন। এখনও মাঝে মাঝে দেখা যায়। বানররা তাঁকে দর্শন করেছিল। তারা ধন্য। যদি বল, ওরা কি জানতো, তিনি অবতার? তার উত্তর, তিনি তো জানতেন, তিনি অবতার। তাঁর শুভ দৃষ্টি তো তাদের উপর পড়েছে। আমরা বিশ্বাস করি কিনা পুনর্জন্মবাদ। এতে আর কি আশ্চর্য যে তারা মুক্ত হয়েছে—তাঁকে দর্শন করে। বেদান্ত মতে বলে, মানুষ-শরীরে মুক্তি হয়। বেদান্তের ভাষ্য ভাগবতের মতে, মানুষেতর জীবগণও মুক্ত হয়ে গেছে অবতারাদির সৎসঙ্গের কৃপায়।

চৈতন্যদেবকে কে জিজ্ঞাসা করেছিল, বেদান্তের ভাষ্য উনি লেখেন না কেন। উনি উত্তর করলেন, ভাগবত না থাকলে বরং লেখা যেতো। ভাগবত বেদান্তের ভাষ্য।

দক্ষিণেশ্বর ও কামারপুকুরের বৃক্ষাদি দেব ঋষি গন্ধর্ব। তাঁরা এই রূপ নিয়েছেন অবতারলীলা সম্ভোগের জন্য। ঠাকুর এই সবই জ্যোতির্ময় দেখতেন, অর্থাৎ চিন্ময়। তাঁর কৃপায় ভক্তরাও কেউ কেউ এঁদের এই জ্যোতির্ময়রূপে দেখেছেন। ভক্তগণ বৃন্দাবনের বৃক্ষাদিকে চিন্ময়রূপে দর্শন করেছেন। চিন্ময় শ্যাম চিন্ময় ধাম।

ছুটো দৃষ্টি—একটা বিচার-দৃষ্টি, একটা ভক্তি-দৃষ্টি। ভক্তের দৃষ্টিতে এ সবই সত্য।

ঠাকুর বলতেন, আমি মাকে সাকার দৃষ্টি দিয়ে দেখেছি। আবার নিরাকার দৃষ্টিতেও দেখেছি। তিনি সাকার নিরাকার আরও কত কি। তাঁর ইতি হয় না। একটি বস্তুকে নিয়েই এই ছুই মত।

যারা, মানুষ-শরীরে, মুক্তি হয় এ কথা বলেছেন, তাঁদের মতও সত্য। অপরটাও সত্য। বিরোধ নাই, একটা অপরটার পরিপূরক। মানুষজন্মের উপর stress (জোর) দিয়েছেন, তবে মানুষ সচেতন হবে, জন্ম সার্থক করবে, তাই। যিনি নিমেষে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন আবার নিমেষে বিনাশ করেন, তাঁর পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই। তুমি reason (যুক্তি) চাইছো সব কথায়। তা তোমার reasonএর (যুক্তির) দৌড় কতটুকু ? জ্বর একটু বাড়লেই প্রলাপ, একেবারে অচৈতন্য। এই helpless (অসহায়) জীববুদ্ধির দৌড় অতি অল্প।

বর্তমান Biologistদের (জীবতত্ত্বজ্ঞদের) দৃষ্টিও নিম্নদৃষ্টি, সীমাবদ্ধ দৃষ্টি। শাস্ত্র-দৃষ্টি, বেদ-দৃষ্টি, অবতার-দৃষ্টিতেই কেবল সকল সমস্যার সমাধান হয়। যে সরল বিশ্বাসে ঠাকুরের কথা বিশ্বাস করবে তাকে অতশত ভাবতে হবে না। জগদম্বার মুক্তার হার তার গলায় শোভা পাবে।

আজ ১৫ই আগস্ট, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল, শুক্রবার কৃষ্ণা প্রতিপদ ৪৮৷২৭ পল।

স্বামী গিরিজানন্দ 'মিষ্টিমুখ' করিয়া বিদায় লইলেন। শ্রীম তাঁহার নিকট মঠের সমস্ত সংবাদ লইয়াছেন। ভক্তগণ অনেকে উপস্থিত।

এখন সন্ধ্যা। শ্রীম ভক্তসঙ্গে ধ্যান করিতেছেন। ধ্যানান্তে কথামৃত পাঠ হইতেছে। তিনি নিজে কথামৃত ৪র্থ ভাগ ২৪ খণ্ড বাহির করিয়া দিলেন—১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দ, ৯ই আগস্ট। এখন শ্রাবণ মাস (আগস্ট)। শ্রীম আজকাল এই সময়ের লীলাকথা শুনিতেছেন। পাঠক অন্তেবাসী।

দ্বিজের পিতা আসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাকে মান দিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—আহা, কি স্নেহ ভক্তের জন্য। দ্বিজকে বাড়ীতে যাতনা দেয়। তা থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য তার পিতার কাছে নিজে ছোট হয়েছেন। (সহাস্যে) কি অদ্ভুত পুরুষ, কি কৌশলে দ্বিজের পিতার দোষের কথা বললেন,—শুনেছিলাম আপনি নাকি ঘোর বিষয়ী। তা তো নয়। আবার বললেন, ছেলে ভাল হলে বুঝতে হবে বাপের পুণ্য ছিল। (সহাস্যে) বাপের সামনে দ্বিজকে সন্দেশ খেতে দিলেন। বাপ মনে করবে, আমার ছেলেকে ভালবাসেন উনি। ভক্তবৎসল নিজে পাখার বাতাস দিলেন দ্বিজের পিতাকে। দেখ ভক্ত কত প্রিয়। আবার বললেন, আমার শরীর ভাল থাকলে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরাদি দেখাতাম। মেঝেতে মাদুরে একসঙ্গে বসলেন। আবার বাপের গায়ে হাত দিলেন। এর মানে, তাঁর অশুভ সংস্কার নাশ করে দিলেন যাতে দ্বিজকে এখানে আসতে বাধা না দেয়। মানুষ গুরুর ঋণ শোধ করতে পারে না তাই। ভক্তের সব ভার ভগবান নেন।

দ্বিজের পিতার উপরও কৃপা হল। তাঁকে প্রকারান্তরে উপদেশ দিলেন। সোজাসুজি বললে অহংকারে আঘাত পড়বে। তাই দ্বিজের নাম করে বললেন সব কথা।

বললেন, সংসারে মনটিকে আগে সোনা বানিয়ে থাক। মাখন

হয়ে জলে থাক। অর্থাৎ ভগবানের ভক্ত আগে হও, তারপর সংসার কর। তখন নিত্য অনিত্য জ্ঞান জাগ্রত থাকবে। এরই নাম বিবেক। হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্গ। অর্থাৎ মনকে ভগবানের ভালবাসায় রঙ্গিয়ে সংসার কর। এর মানে এই—আমি ঈশ্বরের লোক, জগতের নয়, এই জ্ঞান লাভ ক'রে। ঈশ্বর আগে পরে জগৎ।

কথামৃতের এই সব কথা ভক্তরা জানতে পারলে তাদের মনে জোর আসবে। ভরসা আসবে এই ভেবে—ভগবান ভক্তের পেছু পেছু থাকেন। তাকে রক্ষা করেন সর্বদা। তা হলেই অর্ধজীবন্মুক্ত।

পাঠ চলিতেছে। এবার মহিমাচরণের সঙ্গে কথা হইতেছে। মহিমাচরণ ঠাকুরকে মনে করেন একজন সাধু মাত্র। অবতার মানেন না—বেদান্ত পড়েন। কিছু পরোপকার করেন। তাঁর মত, ঠাকুর প্রাক্তনের ফলে অত বড় হয়েছিলেন।

শ্রীম—দেখ না, কত কৃপা মহিমাচরণের উপর। কত রকমে তাঁকে বলেছেন যে, ঠাকুরের ভিতর ভগবানের পূর্ণ আবির্ভাব। বলছেন, 'এর ভিতর মা স্বয়ং ভক্ত লয়ে খেলা করছেন।' তাঁর নিজের মুখের এ সব কথা শুনেও মহিমাচরণ ধরতে পারছেন না—এর ভিতর তিনিই (ঈশ্বরই) আছেন। তিনবার এ কথাটি বললেন ঠাকুর।

বড় জিতেন—মহিমাচরণ অততেও কেন ধরতে পারছেন না?

শ্রীম—তিনি না ধরা দিলে কার সাধ্য তাঁকে ধরে? বই-পড়া পাণ্ডিত্যের কর্ম নয়। রামকে মাত্র বারজন ঋষি চিনেছিলেন, ভগবান বলে। অপরে বলতো জ্ঞানী। মহিমাচরণ বলেন, সাধনা করলে সকলেরই ঠাকুরের অবস্থা হতে পারে। আজ ঠাকুর তা নিজ মুখে protest (আপত্তি) করলেন। বললেন, এতে (ঠাকুরে) কিছু বিশেষ আছে। সাধনের দ্বারা তা হয় না। নজীরস্বরূপ বললেন, মাধবীতলায় তিন দিনেই নির্বিকল্প সমাধি দেখে তোতাপুরী নিজে নির্বিকল্প সমাধিবান্ হয়েও, বলতে লাগলেন, আরে এ কেয়া রে। পরে সে বুঝতে পারলে—এর ভিতর কে আছে। আমার বাবা জানতেন এর ভিতর রঘুবীর অর্থাৎ ঈশ্বর।

এই অহংকারটা মহিমাচরণের ভিতর তিনিই রেখে দিয়েছেন। লীলায় বিচিত্রতা চাই। নইলে একঘেয়ে হয়ে যাবে যে। ও একটা থাক। মহিমাচরণের ভাব রক্ষা করলেন—বলছেন, 'হাঁ।··· ভক্ত তাঁর বৈঠকখানা।' উনি মনে করেন কর্মফলে ঠাকুরের এই অবস্থা। ঠাকুর ঈশ্বরের ভক্ত—ঈশ্বর নন, এই ভাব মহিমাচরণের। অথবা সকলেই ঈশ্বর। সাধন দ্বারা এই ঈশ্বরত্ব লাভ হয়—'অহং ব্রহ্মাস্মি।'

একজন ভক্ত—'ঘরের ভিতর একটি ছোট জ্যোতি', এ-টিই কি মায়া ?

শ্রীম—হাঁ, সেই ব্রহ্মজ্যোতি ব্রহ্মশক্তিই মায়ার উদ্ভবস্থল। বলেছেন, এইটিতে জগৎ ডুবে আছে। তাই গীতায় বলেছেন, এ-টি দৈবী অর্থাৎ ভগবানের দ্বারাই সৃষ্ট। এর এলাকায় সমগ্র জগৎ। এ-টি পার হওয়া যায় কেবল ঈশ্বরের কৃপায়—'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাম্ তরন্তি তে।' এই মায়াই সচ্চিদানন্দকে ঢেকে রেখেছে। তাঁর কৃপাতেই কেবল এই আবরণ দূর হয়। চণ্ডীতে আছে, জ্ঞানীদেরও চিত্ত নিয়ে খেলা করেন এই মহামায়া। যাবৎ শরীর তাবৎ তাঁর অধীন। অত শক্তিমান বলেই, ঠাকুর মানুষের ভাবে, সর্বদা প্রার্থনা করছেন—মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।

বড় জিতেন—ঠাকুর তো স্পষ্ট বললেন, এখান থেকে ওরা হরিনাম আর মায়ের নাম নিয়ে গেল। কিন্তু ব্রাহ্মরা কেউ কেউ অস্বীকার করে এই কথা।

শ্রীম—ঠাকুরের বাণী ধ্রুব সত্য। কে স্বীকার করলো, কে না করলো, কি আসে যায়। যা সত্য তা ফলবেই, ফলেছে যে। ম্যাক্সমুলার এ-টি ধরেছিলেন, ওদের ভেতর 'মা' কোত্থেকে এলো। স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হলে তখন বুঝতে পারলেন যে ঠাকুরের কাছ থেকে 'মা' নাম নিয়ে গেছে। মানুষের বুদ্ধির দৌড় কত! মানুষ মনে করে, আমরা বুদ্ধি দিয়ে একজনকে বড় করে ফেলবো। কিন্তু

তা হবার যো নাই। ঈশ্বরের বুদ্ধিই সত্য, চিরস্থায়ী। তাই তো ঠাকুরের কথা সকলে নিচ্ছে, জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা। যারা মনে করতো বুদ্ধি দিয়ে কেল্লা মাত করবো তাদের কথা কেউ শুনছে না। তাদের পাত্তাও নাই। জগতের অতল তলে ডুবে যাচ্ছে।

ডাক্তার—স্বপ্নে ঈশ্বরদর্শন হয় কি?

শ্রীম—কেন হবে না? ঠাকুর বলেছেন স্বপ্নসিদ্ধের কথা। স্বপ্ন-সিদ্ধ, হঠাৎ-সিদ্ধ সাধন-সিদ্ধ নিত্য-সিদ্ধ—এ সবই সত্য, ঠাকুর বলেছেন।

ডাক্তার—এই ভক্তটি কে, যিনি স্বপ্নে চৈতন্যদেবকে দর্শন করেছেন? আবার জাগ্রতাবস্থায়ও অন্য দর্শন করেছেন?

শ্রীম—ভক্তরা কেউ কেউ গোপনে থাকতে চান। তাই নাম দেওয়া হয় না। এই ভক্তটি (শ্রীম) ও নরেন্দ্র উভয়ের উপর ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কার পড়েছিল। তাই তাঁরা স্বপ্নে ও জাগ্রতাবস্থায় ঈশ্বরীয় রূপ দর্শনে সন্দিহান ছিলেন। তাই বললেন, হাঁ, আজকাল নরেন্দ্রের দর্শন হচ্ছে জাগ্রতাবস্থায়। এই ভক্তটির স্বপ্নে চৈতন্যদেবের দর্শনের কথা শুনে ঠাকুরের চক্ষে জল এসেছিল। আর গদগদ হয়ে বলেছিলেন, 'আহা, আহা'।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। তারপর আবার কথামৃত বর্ষণ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—কি আশ্চর্য মহামায়ার খেলা! ছয় সাত বার ঠাকুর বললেন, এর ভেতর ঈশ্বর এসেছেন। তবুও মহিমাচরণের মনের আবরণ দূর হলো না। আবার বললেন, এখানে যারা আসবে তাদের দুটো জিনিস জানলেই হবে। প্রথম, আমি কে—তারপর, ওরা কে। এ-টিও ধরতে পারলো না মহিমাচরণ।

তিনি ইচ্ছা করলে সব হয়। এক নিমেষে মহিমাচরণের সব বদল করে দিতে পারতেন। তবে করেন নি কেন? এর উত্তর, লীলায় বিচিত্রতার দরকার। এখানে ঠাকুর মানুষের প্রকৃতির বিবরণ দিচ্ছেন যে! বিশ্বাস ও বিচার। একজন ভক্তকে বলেছিলেন, বল আর বিচার করবে না (শ্রীমকে)। কিন্তু এখানে মহিমাচরণের

কথা মেনে নিলেন। সাধন করলে সকলেই পরমহংসদেব হতে পারবে। কেন মানলেন? যদি বল, এর দু'টি কারণ। প্রথমটি, তবে হীন অধিকারীরাও সাধন করবে। আর দ্বিতীয়, ঠাকুর যে স্বচ্ছ স্ফটিক। গণ্ডীহীন, অসংখ্য অসীম ভাবময়। যে ভাবের কাছে যখন থাকেন সেই ভাব ধরেন। মহিমাচরণের ভাবটি হীন হলেও একটা ভাব তো বটে, তাই মানলেন। এ-টি ধরে সাধন করে করে যখন কোন খেই পাবে না তখন আসবে বিশ্বাস, শরণাগতি। তখনই বুঝতে পারবে ঐ মহাবাক্যের অর্থ—'আমি' কি, আর ওরা কে জানলেই হবে।

মোহন—ঠাকুর বলছেন, যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকবে তাকে এখানে আসতেই হবে। আসতেই হবে। যদি তাই হয় তবে তো গোঁড়ামি এসে গেল। শাক্ত, বৈষ্ণব, খ্রীস্টান মতে সকলেই মুক্তির জন্য শাক্ত বৈষ্ণব খ্রীস্টান বানিয়ে তবে ছাড়বে।

শ্রীম—না, এতে গোঁড়ামি নাই। তিনিই বলেছেন, যত মত তত পথ। সব মত সাধন করে বলেছেন এ কথা। তিনি তো বলেন নি, সকলকেই আমাকে ভজতে হবে। তাহলে গোঁড়ামি আসতো। তিনি যা বলেছেন—এর অর্থ, শাক্ত, বৈষ্ণব, খ্রীস্টান—আপন আপন মতের সাধন কর। কিন্তু যদি আন্তরিক হয় অর্থাৎ যদি ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল তবে শেষে বুঝতে পারবে তার ইষ্টই এখন রামকৃষ্ণ-রূপ নিয়েছেন। এতে গোঁড়ামি কোথায়? ব্রহ্ম ও শাক্ত অভেদ মূলে। সেই মূল থেকেই যে কালী কৃষ্ণ ক্রাইস্ট হয়েছে। সকলেই আপন মত ধরে চলুক। আন্তরিক হলে শেষে বুঝতে পারবে নিজের ইষ্টেরই আবির্ভাব রামকৃষ্ণরূপে। মিশির সাহেব ঠাকুরকে ক্রাইস্টরূপে দেখেছিলেন। কালী মাকে প্রণাম করে চেয়ে দেখে বেদীর উপর ক্রাইস্ট। বাইবেলে আন্না ও সিমিয়ানের কথা আছে। তাঁরা ক্রাইস্টকে ইষ্টরূপে গ্রহণ করেন নি। কিন্তু আন্তরিকতা ছিল বলেই—শিশু ক্রাইস্টকে বেদীর সামনে দেখেই আনন্দে গদগদ হয়ে পূজা করেছিলেন ঈশ্বরের অবতার বলে। ক্রাইস্ট তখনও অবতার

বলে প্রকাশিত হন নি। বয়স তখন মাত্র এক মাস। শুনেছি, ঠাকুরের কাছে অনেক খ্রীস্টান ভক্ত, মুসলমান ভক্ত এসে পরিপূর্ণ হয়ে গেছেন অন্তরঙ্গদের যাবার পূর্বে।

এটা গোঁড়ামি নয়। সত্য। এটাই প্রমাণ যে ঠাকুর অবতার। মূলে এক সত্য, প্রকাশে বিভিন্ন, অন্তেও সেই একই।

কলিকাতা, ১৫ই আগস্ট, ১৯২৪ খ্রী:
৩০শে শ্রাবণ ১৩৩১ সাল, শুক্রবার, কৃষ্ণা প্রতিপদ ৪৮।২৭ পল

একবিংশ অধ্যায়

আমড়া গাছে আম ফলাতে পারেন মা

১

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। এখন অপরাহ্ণ চারিটা। আজ শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি। আকাশে মাঝে মাঝে সাদা মেঘ ভাসিতেছে। আকাশ অনেক পরিষ্কার।

শনিবার বলিয়া ভাটপাড়ার ললিত, ভোলানাথ মুখার্জী, বসন্ত ও একজন বন্ধু আসিয়াছেন। অফিসের ফেরৎ। প্রায় প্রতি শনিবারই এঁরা আসিয়া থাকেন।

শ্রীম নিজকক্ষে দরজা বন্ধ করিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন। ভক্তগণ অন্তেবাসীর সঙ্গে শ্রীম প্রভৃতি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তদের সম্বন্ধে নানা কথা কহিতেছেন।

সন্ধ্যা হয় হয়। শ্রীম বাহিরে আসিলেন আর ভক্তদের কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। গাড়ীর সময় সমাগত দেখিয়া ভক্তগণ বিদায় লইলেন।

শ্রীম সিঁড়ির ঘরে আসিয়া বসিয়া আছেন, চেয়ারে দক্ষিণাস্য।

তাঁহার সম্মুখে ও বামে বেঞ্চিতে বসা ভক্তগণ—বড় জিতেন, বলাই, শান্তি, ডাক্তার, বিনয়, ছোট অমূল্য, জগবন্ধু প্রভৃতি অনেক ভক্ত। সকলে শ্রীমর সহিত ধ্যান করিতেছেন। ধ্যানান্তে কথামৃত বর্ষণ করিতেছেন। উপাধ্যায়ের প্রবেশ।

শ্রীম (উপাধ্যায়ের প্রতি, নিজের শরীর দেখাইয়া)—এর ভিতর তিনটে জিনিস রয়েছে—thinking, feeling and willing (চিন্তাশক্তি, অনুভবশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি)। মনে অবসাদ এলে এই willing (ইচ্ছাশক্তি) আমাদের বল দেয়। তিনিই মানুষকে এই will power (ইচ্ছাশক্তি) দিয়েছেন। এই যে আপনি মঠে যাবেন বলেছেন, এটা হল will powerএর (ইচ্ছাশক্তির) কাজ। এই ইচ্ছাশক্তি না থাকলে জগৎ চলে না। ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন এই ইচ্ছা। তা হলে এর খুব scope (অধিকার) রয়েছে। এই অধিকারের ভিতর কাজ করলেই মানুষ দেবতা হয়ে যেতে পারে—ঈশ্বরদর্শন হয়।

যেমন একটা গরু। তার গলায় রশি বাঁধা। যতটুকু লম্বা ততটুকু সে চারদিকে ঘুরে ফিরে খেতে পারে। এটা তার অধিকার। এই রশিটাই মানুষের সংস্কার। সংস্কারের অধীন মানুষ। মালিক গরুর রশিটা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। আর একটা এর সঙ্গে যোগ করে দিতে পারে। কিংবা একেবারে রশিটা খুলে দিতে পারে। মানুষকে তেমনি এই সংস্কারের উপরে উঠিয়ে দিতে পারেন, নূতন সংস্কার যুক্ত করে দিতে পারেন। একেবারে বদলেও দিতে পারেন। ঠাকুর বলেছিলেন, আমড়া গাছে আম ফলাতে পারেন মা, প্রয়োজন হলে।

মহিমাচরণের ভাব ছিল, মানুষ কর্মফলের অধীন। তাকে তা ভোগ করতেই হবে। ঠাকুর ভাবে সায় দিয়ে বললেন, হাঁ প্রাক্তন। আবার সেই সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভক্তদের লক্ষ্য করে বললেন, তোদের বেশী কিছু সাধন করতে হবে না। এইটা জানলেই হবে—প্রথম, আমি কে, আর দ্বিতীয়, তোরা কে।

একজন ভক্ত—ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে সব হতে পারে, এটা তো ঠিক। কিন্তু ভক্তের ইচ্ছা হলেও কি তার ইচ্ছাশক্তি বাড়িয়ে দেন ?

শ্রীম—হাঁ, দেন। তীব্র ইচ্ছা, তীব্র ব্যাকুলতা হলে হয়। ঠাকুর বলেছিলেন, ছেলে ব্যাকুল হলে, আহার নিদ্রা ছেড়ে দিলে, বাপ তার হিস্যে আলাদা করে দেয়।

মোহন—'যমেবৈষ বৃণুতে'—মুণ্ডকোপনিষদের এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাও শংকরাচার্য এইরূপ করেছেন। বলেছেন, 'যে সাধক তাঁহাকে পাইতে ইচ্ছা করে, তাহার এই প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলেই তিনি লভ্য'।

শ্রীম—তা বই কি। উপনিষদে উভয়ই আছে। কখনও ঈশ্বরের ইচ্ছা, কখনও ভক্তের ইচ্ছা। ঠাকুর বলেছেন, ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে মা দেখা দেন। সাধকের অবস্থায় ভক্তের ইচ্ছাই প্রধান। অনাহার অনিদ্রায় কাঁদলে বাপ মা ইচ্ছা পূর্ণ করে।

ঠাকুর বলেছিলেন, চুম্বক ছুঁচকে টানে। ছুঁচও আবার চুম্বককে টানে। হরিতকীবাগানে একটি ভক্তের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত ঠাকুর। কোনও সংবাদ দেন নাই পূর্বে। ভক্ত তাঁকে দেখেই বললেন, কোথায় আমি যাব, তা আপনি এসেছেন। তখনই বলেছিলেন ঐ কথা।

তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে ভক্তের ইচ্ছার সংযোগ হলে ভক্ত হয় পালোয়ান। দুর্বল মহাপরাক্রান্ত হয়।

শ্রীম (মুচকি হাস্যে উপাধ্যায়ের প্রতি)—তা হলে আপনি নিশ্চয় যাচ্ছেন মঠে।

উপাধ্যায় (মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে)—আমি তা হলে কিছু নিয়ে যাব কি ?

শ্রীম—বেশ তো, সন্দেশ, মিষ্টি, ফল নিয়ে যাবেন।

উপাধ্যায় (চঞ্চলভাবে)—না, আমি ওখানে কিছু দেব কি ?

শ্রীম—তা-ও হয়। একটা টাকা দিলেন ঠাকুরের ভোগের জন্য। আগেই গিয়ে কিন্তু দেবেন। ঠাকুরদের প্রণামাদি শেষ হলেই আফিসে গিয়ে দেবেন। আর জোড়হাত করে বলবেন, আমি

এখানে আজ প্রসাদ পাব। (নয়ন হাস্যে) আর সাধুর মার খাওয়া ভাল, কি বলেন ?

উপাধ্যায় (অনিচ্ছায়)—আ—জ্ঞে—হাঁ।

শ্রীম—আপনাদের পূর্বপুরুষরা সব আচার্য ছিলেন। তাই তো নাম উপাধ্যায়। ঋষিরা সব জগৎগুরু কিনা। এই সব আচরণ তাঁদের। এই সব কথাও তাঁদের। সাধুদের কাছে যেতে হয় নম্র হয়ে। কৃতার্থ হতে যাওয়া। তাঁদের দর্শনেই কৃতার্থ। তারপর তাঁদের পীড়া দিতে নাই। যেমন, অসময়ে গিয়ে আহারে বসা, না বলে কয়ে। তাঁরা সব ছেড়ে ওখানে গেছেন। নিশ্চিন্তে ভগবানের চিন্তা করবেন বলে। আমরা যে তাঁদের দেখতে পাচ্ছি, তাই কত ভাগ্য। এর ওপর আবার জ্বালাতন করা উচিত নয়। তাঁদের সেবা করতে যাওয়া, সেবা নিতে যাওয়া নয়। কৃতার্থ হতে যাওয়া, কৃতার্থ করতে যাওয়া নয়।

উপাধ্যায় বড় চঞ্চলচিত্ত। আর কথা ঠিক রাখিতে পারে না। অধিক কথা বলে—বক্‌বক্ করে। কয়দিন বলিয়াছে মঠে যাইব, কিন্তু যায় নাই। একদিন দক্ষিণেশ্বর যাইবে বলিয়া কথা দিয়াও যায় নাই।

অন্তেবাসীর মুখে দক্ষিণেশ্বর যায় নাই শুনিয়া, সেইদিনই শ্রীম বলিয়াছিলেন, এ-টা ছিদ্র কলসী—জল থাকবে না। কিন্তু আজ আবার তাহার উপর কৃপা বর্ষণ করিতেছেন। যদি বা শোধরায়। কি অহেতুক কৃপা মহাপুরুষের। নানা ভাবে তাহার মনে আত্মসম্মান বোধ ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিতেছেন। পূর্বপুরুষদের নামে যদি উহা ফিরিয়া আসে, সেই উপায়ও অবলম্বন করিয়াছেন।

২

এখন মহরম চলিতেছে। বড় জিতেন এই কথা তুলিয়াছেন। বলিতেছেন, আজকাল ঈশ্বরের মুসলমান ভক্তরা তাঁকে নিয়ে আনন্দ করছেন।

শ্রীম—তা আর করবে না? ভগবান ছাড়া যে আর যথার্থ

আনন্দ নাই। মহম্মদ এই আনন্দের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। কত ভালবাসা দিয়ে গেছেন ভক্তদের, তবে তো এরা আজও তাঁর নামে আনন্দ করছে! অত বছর হয়ে গেল তবুও তাঁকে ভুলতে পারে না। ভালবাসা না পেলে কেউ কিছু করে না। এই ভালবাসা বিলোতে ভগবান মাঝে মাঝে মানুষ হয়ে আসেন। মহম্মদরূপে এসে আরবের শুষ্ক মরুভূমিতে প্রেমের স্রোত প্রবাহিত করে গেছেন।

তিনি নিজেকে পয়গম্বর অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলেছেন। ওরা অবতার মানে না। ক্রাইস্ট কিন্তু নিজেকে অবতার বলেছেন—'I and my Father are one'—আমি আর আমার পিতা অর্থাৎ ঈশ্বর এক। আবার বলেছিলেন, আমাকে দেখলেই ঈশ্বরকে দেখা হল।

মোহন—মহম্মদ কেন ক্রাইস্টের মত বলেন নি ঐ কথা—আমি আর ঈশ্বর এক? রাম, কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ এঁরা সকলেই ঐ কথা বলেছেন—আমি ঈশ্বরের অবতার। ঠাকুর তো মুসলমান ধর্ম সাধন করে এক দাড়িওয়ালা জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ দর্শন করেছিলেন। ইনিই তো মহম্মদ—ঈশ্বর।

শ্রীম—ঐ সব দেখে মনে হয় অবতারবাদ প্রচলিত ছিল না। ক্রাইস্ট অবতার বলায়, পুত্র বলায় ক্রুশে বিদ্ধ হলেন! তিনি নাই বা বললেন, তাতে কি আসে যায়? তাঁর ভেতর যে শক্তি প্রকাশ হয়েছে, তাতেই প্রমাণিত হচ্ছে তিনি অবতার। অবতার ছাড়া কে পারে এই অদ্ভুত অমানবীয় কর্ম করতে? রাম, কৃষ্ণ, ঠাকুর এঁরা বিশেষ ভক্তের কাছে অবতার বলে প্রকাশ করেছেন নিজেদের। সাধারণ লোকের কাছে এ কথা বলেন নি। তাদের কাছে ভক্ত বলেছেন। মহম্মদও বলতে পারেন হয়তো কারুকে কারুকে। সব কথার তো রিপোর্ট নাই।

আর এক কথা আছে। মহম্মদ প্রচার করেছেন নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের। অবতার হলেই সাকার হয়ে গেল। তা হলেই বিরোধ হয়ে যাবে। তাই ঈশ্বর নিরাকার সগুণ। তাঁর বার্তাবাহক মহম্মদ।

উপনিষদেও অবতারবাদ প্রচ্ছন্ন। অদ্বৈত বেদান্তে অবতার মানে না। ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজও অবতার মানে না। মহম্মদের অতিমানবীয় জীবনটি দেখ না। তিনি বলছেন, একমাত্র আল্লাই মালিক। তিনিই মহান। তাঁকে ভালবাস তন-মন-ধন সর্বস্ব দিয়ে। আর যা কিছু সব মিথ্যা, দু'দিনের,—সঙ্গে যাবে না। তাঁর প্রতি ভালবাসাই সঙ্গে যাবে।

আহা, কি প্রেম দিয়ে সবাইকে বেঁধে রেখেছেন। শরীর ত্যাগের পূর্বে অসুস্থ থাকায় একদিন মহম্মদ মসজিদে আসতে পারেন নি। পাঁচশ' ভক্ত একসঙ্গে কেঁদে উঠলো তাঁকে না পেয়ে। সেই কান্নার রোল তাঁর কর্ণে পৌছালে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। অপরের কাঁধে ভর করে এলেন মসজিদে। কত প্রেম ঢেলেছেন তবে এ-টি হয়েছে। যাবৎ জগতে চন্দ্র সূর্য উঠবে তাবৎ প্রেমের এই কথাটি জীবন্ত হয়ে থাকবে।

মোহন—কেহ কেহ বলেন, ঠাকুরের মুসলমান ও খ্রীস্টান ধর্ম সাধনের উদ্দেশ্য ধর্ম-সমন্বয় ছাড়াও আর একটা আছে—সেটা সমাজসংস্কার। হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টানের বিবাদ মিটবে, ঠাকুরের মুসলমান ও খ্রীস্টান ধর্মের সাধনার দ্বারা।

শ্রীম—হবে হয়তো। মূলে এক। সেখানে বিবাদ নাই। সেখানে এক সত্য। এ-টা মনে থাকলে বাইরের adjustment (মিলন) সহজ হবে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—যখন ভগবান অবতার হয়ে আসেন তখন ধর্মের একটা উন্মাদনা বেড়ে যায়! কালক্রমে, মলিন হয়ে যায়। তখন আবার আসেন। মলিন হলেও একটা প্রবাহ চলতে থাকে। বুদ্ধ, ক্রাইস্ট, মহম্মদের ধর্মপ্রবাহ চলছে।

এখন এসেছেন ঠাকুর, সবে টাটকা। তারপরও চলবে এই প্রবাহ কতকাল। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতাটাই হল ধর্মের প্রাণ। কালক্রমে এটা চলে যায়, প্রবাহ থাকে।

ভগবানের দেবলীলা, জগৎলীলা, নরলীলা। নরলীলার ভিতর এই অবতারলীলা।

অনাদিকাল থেকে ভাল মন্দ দু'টো প্রবাহ চলে আসছে। অবতার এসে ভালটার জোর বাড়িয়ে দেন। মন্দটা চাপা পড়ে যায় তখন। আবার মন্দ বেড়ে যায়। আবার ভাল প্রবাহ আসে। এই করে জগৎ চলছে।

ঠাকুর বলেছিলেন, 'আমায় ধর'। তাহলে মন্দ প্রবাহ কিছু করতে পারবে না। এখন তাঁরই যুগ।

কারবালা ট্যাঙ্কে আজ মহরমের উৎসব হইতেছে।

শ্রীম—অতকাল কলিকাতায় রইলুম কিন্তু কারবালা ট্যাঙ্কের উৎসব দেখা হয় নি। তাই সেদিন ডাক্তারবাবুর মোটরে গিয়ে দেখে এলুম। আমরা too late (খুব দেরীতে) গিছলাম, তখন ন'টা বেজেছে। তখন সব শেষ হয়ে এসেছে, মহরমের আনন্দ। বাতাসা ভোগ দেওয়া হল। আমাদের আবার প্রসাদ দিলেন ওঁরা।

আহা, কি ভালবাসা মহম্মদের উপর। তাঁর মেয়ের ছেলেকে নির্মমভাবে মেরেছিল, তাই ওরা শোক করছে, তের শ' বছর হয়ে গেছে তবুও। কত ভালবাসাতে হয় এ-টি!

মহম্মদের উপর কেন এ ভালবাসা? তিনি যে ভালবাসায় ভক্তদের ডুবিয়ে রেখেছেন। ভালবাসা না দিলে ভালবাসা পাওয়া যায় না। ভালবাসা না দিলে ধর্মসংস্থাপন হয় না। ভাগ্যিস্ আমরা ঠাকুরের সঙ্গে ছিলাম, তাই এ-টা কতক বোঝা যাচ্ছে। ঠাকুর ভক্তদের কিনে নিয়েছেন ভালবাসায়। তাঁর ভালবাসার ঋণ কি কেউ অনন্ত জীবনেও শোধ করতে পারে!

এই সব দেখে ঠাকুর কেন মুসলমান হয়েছিলেন তিন দিন, তার একটা glimpse (আভাস) পাওয়া যাচ্ছে।

মোহন—মহম্মদের আরো অনেক গুণ ছিল। তিনি একাধারে তিন ছিলেন—রাষ্ট্রপতি, সৈন্যাধ্যক্ষ ও ধর্মগুরু। তাঁর তৈরী brotherhood (ভ্রাতৃসঙ্ঘ) দেখলে মনে হয় বর্তমান গণতন্ত্রবাদও তাঁর কাছে ঋণী। তাঁর জীবনযাত্রা সরল ছিল, নিজে কাপড়, জুতো সেলাই করতেন। মসজিদনির্মাণে সকলের সঙ্গে শ্রমজীবীর কাজ

করতেন। গৃহকার্যে মেয়েদের সহায়তা করতেন, দয়া সহানুভূতি কত কি ছিল।

শ্রীম—আমরা তাঁর ভালবাসারই চিন্তা করছি। প্রেমস্বরূপ ভগবানকে চিন্তা করে করে প্রেমময় হয়ে গিছলেন। এই দৈবী ভালবাসার এক কণাতে মানুষ দেবতা হয়ে যায়।

৩

এখন আটটা। কথামৃত ছাপা হইতেছে। খুব কাজের ভিড়। জগবন্ধুর উপর সব ভার। শ্রীম তাঁহাকে বলিলেন, আপনি প্রুফ দেখুন। এরা (বিনয়, শান্তি, বলাই) কপি ধরুক। তৃতীয় ভাগের অষ্টম ও নবম ফরম্ আর চতুর্থ ভাগের প্রথম ফরম্ দেখা হইতেছে। শ্রীম ঐ পাঠ শুনিয়া মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করিতেছেন।

শ্রীম—ঠাকুর বলছেন, ঋষিরা ভয়তরাসে। কিন্তু নারদাদি তা নন। এর মানে তাড়াতাড়ি কাজ করে নেওয়া। বলেছিলেন, আম খেয়ে যেমন মুখ পুঁছে ফেলা। আপনার কাজ হয়ে গেলেই হলো। খাদি কাঠ আপনি ভেসে যায় কিন্তু বাহাদুরি কাঠ অপরকে তুলে নেয় আপনিও ভাসে। বিজ্ঞানী নির্ভীক। দু' হাত তুলে নাচে। এর মানে সাকার নিরাকার দুই লয়। ব্রহ্মজ্ঞানে ডুবে গেলেও আনন্দ, আবার ফিরে এলেও সেই আনন্দ। কারণ তখন দেখে, যিনি নিরাকার তিনিই সাকার—জীবজগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন।

একজন ভক্ত—শশধর পণ্ডিতকে বেশী শাস্ত্র পড়তে কেন মানা করলেন ঠাকুর ?

শ্রীম—নিজেই বলছেন, শুষ্ক তর্ক বিচার এসে যায়। আখের ছিবড়ে চোষা, আর আখ চোষা। তফাৎ নয় কি ? অল্প পড় আর সাধন কর। বিবেক বৈরাগ্য, ঈশ্বরে ভালবাসা, এ ছাড়া শাস্ত্রপাঠ বৃথা। উল্টো উৎপত্তি হয়। বলতেন, যদি ছিল রোগী বসে, বস্থিতে শোয়ালে এসে। আবার বলেছিলেন, বাজনার বোল হাতে আনতে হয়। শাস্ত্রের কথা জীবনে দেখাতে হয়। পণ্ডিতকে তো বললেন, সমগ্র গীতা সভাষ্য কণ্ঠস্থ করলে কি হবে, যদি ত্যাগ, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে

ভালবাসা না থাকে? তাই বললেন, গীতার সার 'ত্যাগী'। সব ছেড়ে ঈশ্বরকে ধরা, তাঁকে ভালবাসা। কেমন? না, যেমন বাছুরের ডাক। বাছুর ব্যাকুল হয়ে ডাকলে গাভী এসে যায়।

মোহন—জ্ঞানীর ভাব—'ভয়তরাসে' এতে জ্ঞানীকে নিন্দা করলেন না কি? ভক্তকে বাড়ালেন?

শ্রীম—না। এখানে তুলনা করলেন জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীর। জ্ঞানী ও ভক্তের নয়। ঈশ্বর দর্শনের পরের কথা উভয়ই। একজন ব্রহ্মে ডুবে গেলেন এক হয়ে রইলেন। অপরজন বিদ্যার আমি, ভক্তের আমি নিয়ে ফিরে এলেন। এসে দেখলেন, ব্রহ্মই নামরূপ হয়েছেন, জগৎ হয়েছেন। সব ব্রহ্মময়, কার ভয় করবে? নিজেও ব্রহ্ম, জীবজগৎও ব্রহ্ম। দুর্বাসা জ্ঞানোন্মাদ, সব ব্রহ্মময় দেখে।

পণ্ডিতকে এও বললেন, আগে সাকারে মন স্থির কর, পরে নিরাকারে যাও। ভাব ভক্তি অভ্যাস আগে করলে পরে অ-ভাবের, নিরাকারের চিন্তা সহজ হয়। ভাব থেকে অ-ভাবে, আবার অ-ভাব থেকে ভাবে—এই পুরো রাস্তা। ঠাকুরের কৃপায় তাঁর অন্তরঙ্গরা এইভাবে যাতায়াত করেছেন। নরেন্দ্রকে অ-ভাব থেকে ভাবে আনলেন। আবার রাখালকে ভাব থেকে অ-ভাবে নিলেন। আর একজন ভক্তকেও (শ্রীমকে) ভাব থেকে অ-ভাবে নিয়েছিলেন। আবার অ-ভাব থেকে ভাবে। তিনি জ্ঞান ও ভক্তি একাধারে দুই-ই চেয়েছিলেন।

আসল কথা, ঠাকুর বলতেন, সচ্চিদানন্দে প্রেম। তা জ্ঞানপথ দিয়েই হোক, ভক্তিপথ দিয়েই হোক। প্রথম নিজের ভাবানুযায়ী সাধন করতে হয় যত্ন করে। আন্তরিক হলে তিনি নিজেকে দেখিয়ে দেন সেই ভাবে। প্রয়োজন মনে করলে অপর ভাবটিও দেখান। বলতেন, যদু মল্লিকের সঙ্গে দেখা কর যো সো করে, তিনিই দেখিয়ে দেবেন, বলে দেবেন, তাঁর কত ধন, ঐশ্বর্য।

অন্তেবাসী—পণ্ডিতকে ঠাকুর বললেন, তুমি ছানাবড়া হয়ে আছ। এর মানে কি?

শ্রীম—মানে, অনেকটা তৈরী হয়ে আছে। পূজা-পাঠ, জপ-ধ্যান, শাস্ত্রাধ্যয়ন, সদাচার—এ সব পালন করছেন। এখন দু পাঁচ দিন রসে ডুবে থাকতে বললেন। এর মানে কিছু দিন তপস্যা করতে বললেন। হাতে আনবার চেষ্টা করা। শাস্ত্রজ্ঞান ছানাবড়া—তপস্যা দ্বারা ভাব-ভক্তি লাভ করা, রসে ডুবে থাকা। কেমন বললেন, 'দু পাঁচ দিন'। অরুচি, তাই অল্প কর।

মোহন—'এস দু' হাত তুলে নাচি।' এই কথার significance (মর্মার্থ) কি ?

শ্রীম—নিত্য লীলা দুই-ই সত্য। জ্ঞানীরা কেবল ব্রহ্মালয়, জগৎলয় নয়। ব্রহ্ম গ্রাহ্য, জগৎ ত্যাজ্য। কিন্তু যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। শুধু, জ্ঞানী যাঁরা তাঁরা ভয়তরাসে, বলছেন। কিন্তু বিজ্ঞানী দেখে, ঐ ব্রহ্মই নামরূপে জগৎ হয়েছেন। তাই ঠাকুর বললেন, তাঁকে চিন্তা করে মন অখণ্ডে লয় হলেও আনন্দ, আবার লীলাতে মন রেখেও আনন্দ। তিনি একঘেয়ে নন। ঠাকুর নিত্য লীলা দুই-ই লন। বলেন, যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য। এই সব ঠাকুরের নিজের অবস্থা বর্ণন। এ-সব শাস্ত্র। লোকে ঝগড়া করে কিনা। কোন্‌টা বড় কোন্‌টা ছোট, কিংবা কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা। ক্ষুদ্রাধার জীব। একটা ভাব নিয়ে থাকে। অপরের ভাবকে মিথ্যা বলে। বেদান্তের কত বড় সমস্যা মিটিয়ে দিলেন তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ অনুভূতির সহায়ে। বলছেন, নিত্যকৃষ্ণ নিত্যভক্ত আছে। গোপীরা নিত্যকৃষ্ণ চায়। ঠাকুর দুই-ই লন, সাকার নিরাকার। বলেছিলেন, উত্তরে শুনেছি বরফ আছে, গলে না। এই উপমাটি নিত্যকৃষ্ণের।

বড় জিতেন—সেদিন কথা হয়েছিল, ঠাকুর বলছেন, সংসারী জ্ঞানী যেমন কাঁচের ঘরে থেকে ভিতর-বার দেখছে। আর সর্বত্যাগী জ্ঞানী যেন, সূর্যের আলোতে মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। আজও এই কথা পড়া হলো, অর্থ কি ?

শ্রীম—যেমন দীপের আলো আর সূর্যের আলো। ঘরে থাকলে,

মনটা ঘর-কুটুম্বাদিতে থাকে। সর্বত্যাগীর 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। 'সূর্যের আলো' ঠাকুরের, চৈতন্যদেবের। এই সব তাঁর নিজের অবস্থা বর্ণনা। 'সর্বত্যাগী' মানে ঠাকুর, চৈতন্যদেব। ঠাকুরের কৃপায় ঠাকুরের ভক্তরাও ঘরে থেকেও সূর্যের আলো দেখছেন। ঠাকুরের ভক্তদের বিশেষ আছে। ঠাকুরের কৃপায় সব হয়।

পণ্ডিতকে তো তাই বললেন, সাকার হোক নিরাকার হোক ডুব দাও। তাঁকে নিয়ে পাগল হও। তাঁকে ভালবাস। তা জ্ঞান-পথেই হোক কিম্বা ভক্তিপথে। তাঁকে ভালবাসাই ধর্ম। প্রেমোন্মাদ জ্ঞানোন্মাদ দুই-ই সত্য। তাঁর উপর ভালবাসা এলে তাঁর কৃপায় সব সংশয় যায়। সাকার নিরাকার সব দেখিয়ে দেন। গোপীদের ব্রহ্মজ্ঞান ও প্রেম দুই-ই ছিল। সাধন চাই।

রজনী শ্রীহট্ট হইতে আসিয়া শ্রীমর কাছে ছিলেন। মঠে থাকার ইচ্ছা। সেখানে স্থান না হওয়ায় আজ তাঁহাকে চিঠি দিয়া গদাধর আশ্রমের মহন্ত স্বামী কমলেশ্বরানন্দের কাছে পাঠাইয়াছেন। একজন ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন রজনী গিয়াছেন কিনা। কিসে ভক্তদের সদাশ্রয় লাভ হয় আর সাধুসেবা ঘটে শ্রীম এইজন্য সর্বদা ব্যস্ত। উনি বলেন, এ ছাড়া ধর্ম হয় না, হাজার পড় আর বিচার কর। এরই নাম practical vedanta (ফলিত বেদান্ত)।

কলিকাতা, ১৬ই আগষ্ট ১৯২৪ খ্রীঃ
৩১শে শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল, কৃষ্ণা দ্বিতীয়া ৪৬।৩ পল

দ্বাবিংশ অধ্যায়

নববিধান ব্রাহ্মসমাজে শ্রীরামকৃষ্ণ-কেশব মিলন

১

মর্টন স্কুল। চারতলার শ্রীমর কক্ষ। এখন অপরাহ্ন চারটা। অন্তেবাসীকে শ্রীম একটি কাজের কথা বলিতেছেন।

শ্রীম—(অন্তেবাসীর প্রতি)—আজ নববিধান ব্রাহ্মসমাজে 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশব মিলন' আলোচনা হবে। প্রতি বৎসরই এই বিষয়ে আলোচনা হয় এইসময়। আমাদের নিমন্ত্রণ আছে। আপনি যান। ওখানে কেশববাবুর ভাইপো আচার্য প্রমথবাবু, নন্দবাবু প্রভৃতি ঠাকুরের সম্বন্ধে আলোচনা করবেন। এঁরা সব ঠাকুরের ভালবাসা পেয়েছেন, মহৎ লোক। আপনি আমাদের তরফ থেকে যান। ওখানে গিয়ে ঐ আলোচনাতে যোগদান করুন।

কথামৃত থেকে ঠাকুরের জীবনচরিতটি পাঠ করবেন, প্রথম ভাগের প্রথম দিকে যা আছে। আর প্রথম ভাগের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় পড়বেন—কেশব-সঙ্গে ঠাকুরের নৌকাবিহার। সকলের শেষে পড়বেন, দ্বিতীয় ভাগের দশম খণ্ডের প্রথম দ্বিতীয় ও পঞ্চম অধ্যায়। তা হলেই মোটামুটি ঠাকুর ও কেশবমিলনের একটা জীবন্ত ছবি পাওয়া যাবে।

তা'তেই ওঁদের স্মৃতিতে ঠাকুরের কথা যা আছে তা সব বেরিয়ে আসবে। তাঁর ভালবাসা পেয়েছেন তাঁরা। কখনও ভুলতে পারবেন না। অন্তরে গেঁথে রয়েছে। একটু খোঁচা দিলেই ঐ প্রেমনির্ঝর গলে পড়বে।

প্রমথবাবু লোক খুব মহৎ। বিয়ে করেন নি—মহাত্মা লোক। কত বড় বংশে জন্ম! বৈষ্ণব কিনা—এঁদের বাড়ীর লোক।

আমাকে পড়ে শোনান তো।

অন্তেবাসী শ্রীমকে প্রথম ভাগের জীবনী, আর দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পড়িয়া শুনাইতেছেন।

শ্রীম—এই চরিতামৃতটি পড়লে ব্রাহ্ম ভক্তরা স্মরণ করতে পারবেন, অনন্ত ভাবময় ঠাকুর। নইলে তাঁদের মনে যে রংয়ের সুপ্ত ছবিটি আছে, কেবল সেইটি মনে হবে। মানুষের মনের ধারণাশক্তি অল্প। সে-টি দিয়ে যে যেটুকু বুঝেছে শুধু সে-টির কথাই বলবে। এই করে করে গোঁড়ামি ঢোকে সম্প্রদায়ে। এই জীবনীটি শুনলে মনে হবে তাঁর কথা। মনে হবে তিনি সকল সম্প্রদায়ের লোক। ব্রাহ্ম ভক্তরা যাচ্ছে। আবার সনাতনী হিন্দু, আর্যসমাজ, মুসলমান খ্রীস্টান যাচ্ছে তাঁর কাছে। তাঁর কোন সম্প্রদায় নাই। যদি বলতে হয় তবে বলা যেতে পারে অসম্প্রদায়ী সম্প্রদায়। সর্বধর্ম-সমন্বয় আচার্য তিনি।

এই backgroundএ (পৃষ্ঠ ভূমিকায়) পড়লে, ব্রাহ্ম ভক্তসঙ্গে বিশেষ করে কেশব সেনের সঙ্গে ঠাকুরের সম্পর্কটি আরও সমুজ্জ্বল ও জীবন্ত হয়ে উঠবে। এইটি না থাকলে দাম কম পড়ে যায়। খালি উপদেশ মানুষ মনে রাখতে পারে না। একটি গ্রাম্য বালক কি করে জগৎগুরুর আসন অধিকার করলেন তা মূর্ত হয়ে উঠবে।

অন্তেবাসী এবার প্রথম ভাগের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পড়িতেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদ শেষ হইলে বলিতেছেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—এইটিতে লোক বুঝতে পারবে দুইটি ভিন্ন প্রকৃতির লোকের মনের মিল কোন স্থানে। ঠাকুর নিরাকারবাদী হলেও সাকারবাদও নেন। মূর্তিপূজা মানেন। কেশব তা মানেন না। কেশব ইংরেজীপড়া লোক। বিলাতে যান। স্ত্রী পুত্র পরিজন নিয়ে থাকেন। ঠাকুর সন্ন্যাসী। দিবানিশি সমাধিমগ্ন। ঠাকুর পূজারী, আর কেশব বিখ্যাত ধর্মবক্তা।

কেশবের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা হবে এই চিন্তামাত্রই সমাধিমগ্ন। গঙ্গাবক্ষে নৌকোতে ঠাকুর দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ। কি দেবদৃশ্য! জাহাজের কেবিনে চেয়ারে বসে সমাধিস্থ। যারা কেবল লেকচার

দেয়, এ দেখে তাদের চৈতন্য হবে, ধর্ম কি! কত ভালবাসা ঈশ্বরের জন্যে হলে এ-টি হয়! জগৎ ভুল হয়, নিজের দেহ যে অত প্রিয় তাও ভুলে যায়। যা লাখ লেকচারে না হয়, একবার এই চিত্র দেখে তার চাইতে ঢের বেশী প্রভাব হয়।

ব্রাহ্মসমাজের লোক বুঝবে ধর্ম অনুভূতিমূলক। কথা বলা, কথা শোনা নয়—বই পড়া নয়। কিন্তু ঈশ্বরচিন্তা করে ঈশ্বর হয়ে যাওয়া। 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' উপনিষদে পড়ে এ কথা। আজ দেখছে সকলে চক্ষের সামনে ব্রহ্মদর্শন কাকে বলে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদও পাঠ হইল। এবার দ্বিতীয় ভাগের দশম খণ্ড পাঠ হইতেছে। ঠাকুর কেশবকে দেখিতে গিয়াছেন কমলকুটীরে। ইনি সঙ্কটাপন্ন অসুখে ভুগিতেছেন। বৈঠকখানার বারান্দায় তক্তাপোষে বসিয়াছেন। কেশবকে দেখিবার জন্য অধৈর্য। ঐ তক্তাপোষে বসিয়াই সমাধি।

অন্তেবাসী—আগে এ সব (কোচ-কেদারা) দরকার ছিল। এখন আর কি দরকার? এরূপ কেন বললেন?

শ্রীম—শরীর থাকবে না কেশবের, তাই বললেন, কি দরকার এ সবের। আবার বললেন, দেহ আলাদা, আত্মা আলাদা—যেমন সুপারী আর তার ছাল। কেশবের দেহ যাবে, কিন্তু আত্মা অবিনাশী—থাকবে। ঈশ্বরদর্শনের পর এ-টি বোধ হয়।

কি আশ্চর্য! ঘর ভরা লোক। সকলের সামনে বলছেন, এই যে মা এসেছেন, বারাণসী শাড়ি পরে। সংশয়াচ্ছন্ন লোক। তাদের সামনে মাকে এইভাবে প্রকাশ করছেন। বস্তুতঃ মা আর তিনি তো অভেদ। তিনি কি শুধু বলেছেন, ঈশ্বর আছেন? আবার সামনে এনে প্রায় দেখিয়ে দিয়েছেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে। যতটা humanly (মানুষের ভাবে) সম্ভব ততটা দেখিয়ে দিয়েছেন। কলিকাল। বিজ্ঞানের যুগ। লোক প্রায়ই সংশয়বাদী। এরা প্রশ্ন করে কিনা, ঈশ্বর যদি থাকে তবে দেখিয়ে দাও। তাই জগদম্বাকে সকলের সামনে এনে কথা কইছেন। একদিন তো নয়—সর্বদা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ পাঠ হইতেছে। কেশব অন্তঃপুর হইতে বহু কষ্টে দেয়াল ধরিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। শরীর অস্থি-চর্মসার। ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর এখনও ভাবাবস্থায় রহিয়াছেন। ঐ ভাবেই কথা কহিতেছেন।

অন্তেবাসী—এর মানে কি, ঠাকুর বলছেন কেশবকে, তোমার কুঁড়ে ঘরে হাতী ঢুকছে।

শ্রীম—কেশববাবুর ভিতর ঈশ্বরীয় ভাব ঢুকেছে। আজকাল প্রায়ই জগদম্বার সঙ্গে ভাবে কথা কন, কাঁদেন হাসেন। এ সব ভাবাবেগ এই রক্তমাংসের শরীর, এই nervous system (স্নায়ু-মণ্ডলী) সইতে পারছে না। তাই শরীর ভেঙ্গে যাচ্ছে। 'কুঁড়ে ঘর' মানে শরীর। আর 'হাতী' মানে ঈশ্বরীয় ভাব। সংসারী লোকের শরীর সংসার ভোগ করবার জন্য উপযোগী। এ দিয়ে ঈশ্বরলাভ হয় না। ঈশ্বরীয় ভাব ভক্তি এতে প্রবেশ করে এর সমূল পরিবর্তন করে ফেলে। নূতন স্নায়ুমণ্ডলী হয়। নূতন মন বুদ্ধি হয়। ভক্তের সব নূতন জন্ম। পূর্বের শরীরটা দেখতে আগেরই মত। কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়। ঈশ্বরচিন্তা করে যেমন মন চিত্ত শুদ্ধ হয় তেমনি শরীরও শুদ্ধ হয়।

অন্তেবাসী—হাসপাতালে নাম লেখালে আর চলে আসবার যো নাই। এর অভিপ্রায় কি ? 'রোগের বাকী'—এর মানে কি ?

শ্রীম—'হাসপাতাল' মানে ঈশ্বরের শরণাগতি। 'রোগের বাকী' মানে ভবরোগ অর্থাৎ বিষয়বাসনা, কামিনীকাঞ্চন। যতক্ষণ বাসনা ততক্ষণ দেহ থাকবে। একটা দেহ গেলেও আর একটা দেহ নিতে হবে। যতক্ষণ না ঈশ্বরদর্শন হচ্ছে ততক্ষণ রেহাই নাই। কর্মফল ভুগতে হবে। যে জন্মে যে শরীরে ঈশ্বরদর্শন হয় তখন পর্যন্ত কর্মফল ভুগতে হয়।

অথবা হাসপাতাল মানে জীবভাব। এ যতক্ষণ ততক্ষণই দেহের প্রয়োজন। দেহের জন্ম, স্থিতি, বিনাশ—এই তিনটাই কষ্টকর। যতক্ষণ না চিত্ত শুদ্ধ হয়ে তাঁর দর্শন হচ্ছে, ততক্ষণ সংসারের দুঃখ কষ্ট

ভোগ করতে হয়। জীবত্বের বিনাশ শিবত্বের জন্ম। তখন আর দুঃখ নাই। সর্বদা আনন্দ, সদানন্দ—জীবত্ব বিনাশের চেষ্টাই হাসপাতালে ভর্তি হওয়া। সাধনাবস্থা।

শ্রীম—আহা কি ভালবাসা কেশববাবুর জন্য! মায়ের কাছে ডাব চিনি মেনেছিলেন সাধারণ মানুষের মত কেশববাবুর রোগ সারানোর জন্য। সব মানুষের ব্যবহার। নিজেকে কি করে ঢেকে রেখেছেন। কেন এ সব? লীলা হয় কি করে তা না করলে! ভক্ত নিয়ে বিলাস, এই জন্যেই তো এসেছেন ঠাকুর অবতার হয়ে। এবারে শুদ্ধসত্ত্ব সম্পূর্ণ। নয়তো যাঁর ইচ্ছায় জগতের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ হচ্ছে, তিনি ইচ্ছা করলে কেশববাবুর রোগ আরাম করতে পারেন না? তা হবে না। দশজন মানুষের একজন হয়ে সব শোকতাপ, দুশ্চিন্তা, রোগ কষ্ট—এ সবই ভোগ করছেন। কিন্তু এসবের মধ্যেও সদা মা মা, সমাধি। এটা আদর্শ।

২

অন্তেবাসীর অনিচ্ছা। তিনি ভাবিতেছেন নববিধান সমাজের আচার্যগণ প্রাচীন ও বহুদর্শী। তাঁহাদের কাছে আমি কি বলিব? আমি যুবক আর ওঁরা জ্ঞানবৃদ্ধ। তাঁহার মনে উঠিল ঠাকুরের মহাবাক্য, গুরুবাক্যে বিশ্বাস চাই—বালকের ন্যায় বিশ্বাস। অমনি তিনি দেখিলেন, তাঁহার মনের দুর্বলতা চলিয়া গিয়াছে। আর একটি প্রশান্ত নির্ভীক ভাব ঐ স্থান অধিকার করিয়াছে। আনন্দময় আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়া আসিয়াছে। তিনি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে নববিধান সমাজ-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

সমাজ-মন্দিরের বাহিরে ও অভ্যন্তরে উৎসবের সাজ। ভিতরে লোকে পূর্ণ। সকলেই শিক্ষিত, শান্ত ও ভক্ত। মহিলাগণ উপরে চিকের অন্তরালে। বেশ প্রশান্ত গম্ভীর ভাব। বিদ্যুতের আলোকে গৃহাভ্যন্তর উদ্ভাসিত। মন্দিরের মধ্যস্থলে দুইখানা তক্তাপোষের উপর ফরাশের বিছানা। তাহাতে বসা আচার্য প্রমথবাবু, নন্দবাবু প্রভৃতি। ইঁহারা শ্রীকেশবচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র। ভক্তগণ উত্তর দক্ষিণ ও

পশ্চিমদিকে বেঞ্চিতে উপবিষ্ট। অন্তেবাসী অত লোক সমাগমের কথা ভুলিয়া গেলেন। তিনি দেখিতেছেন, একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মনে প্রসন্নবদনে বিরাজিত। তিনি সহজ, সরল ও স্বাভাবিকভাবে আচার্যদিগকে অভিবাদন করিয়া বলিতে লাগিলেন, শ্রীম আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আজের আলোচনা-সভায় আপনাদের সঙ্গে যোগদান করতে,.আর কিছু পাঠ করতে কথামৃত থেকে।

আচার্যগণ পরমাহ্লাদে অন্তেবাসীকে তাঁহাদের সঙ্গে বসিতে অনুরোধ করিলেন। মন্দিরের সকল ভক্তগণ কৌতূহলাক্রান্ত, এই যুবক কি করেন দেখিতে। অন্তেবাসী বেদীর দিকে মুখ করিয়া শ্রীমর উপদেশানুরূপ ধীরে স্পষ্টভাবে মৃদু অথচ উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতার ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত পাঠ করিলেন। তিনি দেখিলেন, সকলেই আনন্দের সহিত ঠাকুরের জীবনকথা শুনিতেছেন।

তারপর পাঠ হইল প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, কথামৃতের প্রথম ভাগের দ্বিতীয় খণ্ড। তৎপর দ্বিতীয় ভাগের দশম খণ্ডের প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ। পাঠের সময় আচার্যগণ কখনো গম্ভীর কখনো আনন্দময় ভাব ধারণ করিতেছিলেন, কখনো শির মৃদু সঞ্চালন করিতেছিলেন, কখনো আনন্দসূচক মৃদু কণ্ঠধ্বনি।

অন্তেবাসী চরিতামৃত পড়িতেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কেশবাদি ব্রাহ্ম ভক্তগণ সর্বদা যাইতেন। তিনিও ব্রাহ্মদের দেখিতে আসিতেন। উপাসনাকালে কেশবের ব্রাহ্মমন্দির বহুবার দর্শন করিয়াছেন। কেশবের কমলকুটীরে সর্বদা যাইতেন ও ব্রাহ্ম ভক্তসঙ্গে আনন্দ করিতেন। কেশবও কখনো একাকী, কখনো ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে যাইতেন।

ব্রাহ্ম ভক্ত ও আচার্যগণ সমস্বরে, আহা আহা, এই আনন্দধ্বনি করিতেছেন।

প্রথম ভাগের পাঠ চলিতেছে। কেশবের দৈবী প্রতিভার কথা। কেশব তাঁহার সাধুচরিত্রে, ঈশ্বরে ভক্তিবিশ্বাস ও অপূর্ব বাগ্মিতায় মাস্টারের ন্যায় বহু বঙ্গযুবকের মনপ্রাণ হরণ করিয়াছেন। বহু

যুবক তাঁহাকে পরমাত্মীয়জ্ঞানে হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রেম দান করিয়াছে।

পুনরায় ব্রাহ্ম ভক্তদের মৃদু হর্ষধ্বনি।

কেশবের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের জাহাজে করিয়া 'গঙ্গাবক্ষে বিহার' পাঠ হইতেছে। ঠাকুরের মুহূর্মুহুঃ সমাধি—নৌকায় ও জাহাজের কেবিনে। সকলে কৌতুহলী হইয়া এই সমাধি দেখিতেছেন। কেশব শশব্যস্ত। ব্রাহ্ম ভক্তগণের কাহারো কাহারো পুর্বস্মৃতি জাগরণে আনন্দে শির সঞ্চালিত হইতেছে।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত আসিয়াছেন দেখিয়া কেশব অপ্রস্তুত। কারণ বিজয় মতান্তরের জন্য কেশববাবুর নববিধান দল ছাড়িয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হইয়াছেন।

ঠাকুর কেবিনের ভিতর চেয়ারে বসিয়া আছেন। এখনো তাঁহার ভাব পূর্ণমাত্রায়। তিনি অস্ফুট স্বরে কহিতেছেন, আমাকে এখানে আনলি কেন মা! আমি কি এদের সংসারের সংকীর্ণতার বেড়াজাল থেকে উঠাতে পারবো।

ব্রাহ্ম ভক্তগণের মুখমণ্ডলে উদাসীনতার ও হৃদয়ানুসন্ধানের ছাপ পড়িয়াছে।

এখন দ্বিতীয় ভাগের দশম খণ্ডের প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ পাঠ হইতেছে। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে নবেম্বর। কেশবের শরীর ত্যাগের কয়েক মাস পূর্বের কথা। কেশবের সঙ্কটাপন্ন অসুখ। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর হইতে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। মাস্টার বেলা দুইটা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের অপেক্ষায় কমলকুটীরের ফুটপাথে পদচারণ করিতেছেন। পাঁচটায় শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়াছেন। কেশবের শিষ্যরা তাঁহাকে দ্বিতলের বৈঠকখানার সামনের বারান্দায় তক্তাপোষের উপর বসাইয়াছেন।

কেশব অন্তঃপুরে। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছেন। বলিতেছেন, তিনিই ভিতরে গিয়া দেখিয়া আসিবেন। কেশবের অন্তরঙ্গ ভক্ত প্রসন্ন তাঁহাকে ভুলাইবার জন্য

বলিতেছেন, ইনিও আজকাল জগদম্বার সঙ্গে কথা ক'ন। মায়ের কথা শুনিয়া কখনো হাসেন, কখনো কাঁদেন। এই কথা শুনিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ। শীতকাল, বারান্দায় ঠাণ্ডা। তাই ঠাকুরকে বৈঠকখানায় লইয়া গেল সমাধি ভঙ্গের পর। কোচে বসিয়াছেন। এখনও ভাবাবিষ্ট। নেশার ঘোরে বলিতেছেন, কৌচ চেয়ারাদি আসবাবের আর কি প্রয়োজন। শরীর থাকিবে না, ইহারই ইঙ্গিত ঠাকুরের এই কথা।

জগদম্বা ঠাকুরের সম্মুখে উপস্থিত। তিনি দেখিতেছেন—মায়ের পরণে বারাণসী শাড়ি। মা অল্পদিন মধ্যে কেশবকে কোলে উঠাইয়া লইবেন—এই সংবাদ দিতে কি আসিয়াছেন? ঠাকুর বলিতেছেন—মা, হ্যাঙ্গাম করো না, বসো।

ঠাকুরের পাশে মাস্টার, রাখাল, লাটু প্রভৃতি। আর চারিদিকে ব্রাহ্ম ভক্তগণ। মহাভাবের নেশায় ঠাকুর বলিতেছেন, দেহ ও আত্মা ভিন্ন। দেহ সৃষ্ট বস্তু, তাই যাবে। কিন্তু আত্মা অমর। দেহ আর আত্মা যেন ছালের ভিতর শুকনো সুপারি। দেহ আলাদা, আত্মা আলাদা। ইহাও বুঝি কেশবের শরীর যাইবার ইঙ্গিত।

৩

কেশব অন্তঃপুর হইতে দেয়াল ধরিয়া আসিতেছেন। শরীর অস্থিচর্মসার। মেঝেতে বসিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কৌচ থেকে নামিয়া কাছে আসিয়াছেন। কেশব শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিতেছেন অনেকক্ষণ ধরিয়া। ঠাকুর এখনও ভাবাবস্থায় জগদম্বার সহিত বিড়বিড় করিয়া কথা কহিতেছেন।

পাঠের সময় এই সব কথা শুনিয়া ব্রাহ্মগণ কখনো হর্ষান্বিত হইতেছেন, কখনো অদূর ভবিষ্যতের বিপদের ছায়া তাঁহাদের মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন কেশবকে, তোমার দেহের অসুখের কারণ বুঝেছি। ঈশ্বরীয় ভাব ঢুকেছে তোমার মনে। এতে সমগ্র স্নায়ু-মণ্ডলী তোলপাড় হয়ে যায়। তা'তেই অসুখ। বললেন, তোমার

কুঁড়ে ঘরে হাতী ঢুকেছে। (সহাস্যে) ভগবানের হাসপাতালে নাম লেখালে, অর্থাৎ তাঁর শরণাগত হলে রোগ না সারা পর্যন্ত অর্থাৎ যতক্ষণ না তাঁর দর্শন হয়, জীব শিব হয়, ততক্ষণ দেহ থাকে। এ দেহ থাকলেই কষ্ট। এই রোগের ফল ভাল হবে নিশ্চয়। যেমন মালী গোলাপের শিকড় পর্যন্ত খুঁড়ে দেয় ফুল ভাল হবে বলে, তেমনি তোমার এই অসুখ। এর পরই ব্রহ্মানন্দ উপভোগ হবে।

ঠাকুর কেশবকে বলিতেছেন, তোমার অসুখের কথা শুনে বড় চিন্তিত হয়েছি। তোমার অসুখের কথা শুনলেই প্রাণটা ব্যাকুল হয়। আগের বারের অসুখে আমি শেষ রাত্রে উঠে কাঁদতুম। মাকে বলতুম, মা কেশবকে ভাল করে দাও। তাঁর কিছু হলে ঈশ্বরীয় কথা কইবো কার সঙ্গে কলকাতায় গেলে? মা সিদ্ধেশ্বরীর কাছে ডাব চিনি মানত করেছিলাম যাতে অসুখটা সেরে যায়। এবার কিন্তু অতটা হয় নি। দু' তিন দিন খানিকটা চিন্তা হয়েছে।

কেশবের জন্য ঠাকুরের কত ভালবাসা—কত চিন্তা, এ সব কথা শুনিয়া ব্রাহ্ম ভক্তগণ অবাক হইয়াছেন বিস্ময়ে।

কেশবের মা, কেশবকে আশীর্বাদ করিতে উমানাথের দ্বারা বলাইলেন। ঠাকুর বলিলেন, আমার আশীর্বাদ করতে নেই। এ-টি করবেন জগদম্বা। লোকে অহংকারে স্ফীত হয়ে বলে, তুমি ভাল হয়ে যাবে। এ সব আমার হয় না। মা করেন সব। তাঁকে বল।

ভগবান দু'বার হাসেন। একবার, যখন দুই ভাইয়ে জমি ভাগ করে। বলে এটা আমার, ওটা তোমার। কিন্তু জমির মালিক ভগবান। আর একবার হাসেন, যখন ডাক্তার বলে, তোমার রোগ সারিয়ে দেব। তিনি হেসে বলেন, আমি শরীর দিয়েছি। শরীর রাখা না রাখা আমার ইচ্ছা। কিন্তু ডাক্তার মাঝখান থেকে এসে মালিক হয়ে দাঁড়ায় আর বলে, আমি ভাল করে দেব। সে জানে না, ঈশ্বর যদি মারেন, তবে রক্ষা করবে কে?

এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্ম ভক্তগণ বিচলিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মন ভয়ে বিষণ্ণ।

এই আলোচনা-সভা দেড় ঘণ্টা ধরিয়া চলিতেছে। ইতিমধ্যে শ্রীমর আদেশে ভক্তগণ—ডাক্তার কার্তিক, বিনয়, ছোট অমূল্য, দুর্গাপদ মিত্র, শুকলাল, মনোরঞ্জন, শান্তি, বলাই, ছোট নলিনী, সুশীল, সুখেন্দু, অমৃত প্রভৃতি আসিয়া এই আলোচনা সভায় কথামৃত পাঠ শুনিতেছেন।

পাঠ শেষ হইল। সমগ্র মন্দির শান্ত, ভিতরে ও বাহিরে। সকলে অতি শান্তভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-কেশবের অকৃত্রিম নিবিড় প্রেমের কথা শুনিয়াছেন।

এখন আলোচনা হইতেছে।

অন্তেবাসী (আচার্য প্রমথনাথের প্রতি)—আপনারা ধন্য! শ্রীরামকৃষ্ণকে কতবার দর্শন করেছেন, ভালবাসা পেয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করি, তাঁর ভালবাসা অকৃত্রিম। কৃপা অমোঘ। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের কৃপাতেই আপনারা শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপালাভ করেছেন।

আচার্য প্রমথনাথ—শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসার কথা আমরা জীবনে ভুলতে পারবো না। কত স্মৃতি, কত কথা আজ স্মরণ হচ্ছে। গেলেই প্রথমে নিজ হাতে সন্দেশ খেতে দিতেন। আমাদের বয়স তখন অল্প। তাই ওঁর সামনে যেতে ভয় হতো। কাঁচের আলমারীর ভেতরের জিনিস যেমন বাইরে থেকে দেখা যায়, তেমনি তিনি লোকের মনের সব ভাব, সব চিন্তা দেখতে পেতেন। আর বালকের ন্যায় বলে দিতেন। আমরা তাই অপরের সামনে তাঁর কাছে ভয়ে ভয়ে যেতাম। ভয়, পাছে উনি অপরের সামনে আমাদের মনের কথা বলে দেন। তাতেই লজ্জা। চেষ্টা করতাম, একা একা তাঁর সামনে যেতে। তিনি কিন্তু বুঝতে পারতেন, এই ভয় ও লজ্জার কথা। তাই বুঝি আমার সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি অপরের সামনে। কিন্তু একা একা যখন যেতাম তখন কত ভালবাসতেন, আমার ভালর জন্য কত কথা বলতেন। একবার বলেছিলেন, নূতন হাঁড়িতে দই পাতলে মিষ্টি লাগে। তোমরা নূতন হাঁড়ি। বিয়ে কর নি, হয়ত বিয়ে করবেও না। তাই নূতন হাঁড়ি। ভগবানকে

ডাকলে তিনি শুনবেন। মাকে নির্জনে গোপনে কেঁদে কেঁদে বলবে, দেখা দাও।

আর একদিন বলেছিলেন, এই উঠন্ত যৌবন। এখনই তাঁকে ডাকবার সময়। তাঁর সেবায় লাগাও এই যৌবন।

আর একদিন বললেন, আমড়া দেখেছো—আমড়া ফল, যাতে চাটনী হয়? কামিনীকাঞ্চন এই রকম। আমড়াতে আছে কি? আঁটি আর চামড়া। খেলে হয় পিত্তশূল।

খুব রসিক পুরুষ ছিলেন। একদিন ব্রহ্মানন্দ দক্ষিণেশ্বর যাবেন। একটু দেরী হয়ে গেছে। পরমহংস মশায় দেখেই বললেন, এই যে বর এসেছে। আমরা সব সেজে গুজে খচ্‌মচ্‌ করছি। মেয়েরা বিয়েতে নূতন শাড়ি পরে, তাতে ঐ রকম শব্দ হয়।

ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে যে তাঁর কি প্রেম ছিল, তা কি আমরা বুঝতে পারি?

তাঁর সব কথা মনের ভেতর থেকে বানের মত বের হচ্ছে—কত বলবো? আহা, অমন ভালবাসা কে আর দিতে পারে।

নন্দবাবু—আমাকে একদিন বললেন, সংসার তো তাঁরই, থাক না তাতে দোষ নাই। যেন কেল্লার ভেতর থেকে যুদ্ধ করা। কিন্তু একটি হাতে তাঁকে ধরবে অপরটি দিয়ে সংসার করবে। সময় হলে দু'হাতেই তাঁকে ধরতে পারবে।

একদিন বললেন, হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙবে। বলেই জিজ্ঞাসা করলেন, কি বললাম বল তো? আমি বললাম হাতে তেল মাখলে কাঁটালের আঠা লাগে না। খুশী হয়ে বললেন, ঠিক এইরূপ, ঈশ্বরের ভক্তি লাভ করে সংসারে থাকলে মোহে আবদ্ধ হয় না।

একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, বল তো বড় লোকের বাড়ীর ঝি কেমন করে থাকে? আমি বললাম, যে ভাল ঝি সে নিজের বাড়ীর মত দেখে, সব কাজ করে। উনি আনন্দে বললেন, 'ইয়া'। ঠিক এইরূপ সংসারে থাকতে হয়। সব কাজ করা, কিন্তু মনটি থাকবে

ঈশ্বরে—যেমন ঝিয়ের মনটি থাকে নিজের বাড়ীতে। সেখানে তার ছেলেরা থাকে।

ব্রাহ্ম ভক্তগণের হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া গেল। আর নির্ঝরের মত শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতি বিগলিত হইতে লাগিল। আরো কেহ কেহ বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু সময় শেষ।

প্রমথবাবু (অন্তেবাসীর প্রতি)—আপনারও ধন্য। এই বয়সেই মন ঈশ্বরের দিকে দিয়েছেন। পরমহংস মশায়কে না দেখেই ভালবেসেছেন। আমরা তো তাঁর হাতে সন্দেশ খেয়েও অত ভালবাসতে পারি নি। আপনারা আমাদের চাইতেও বেশী ধন্য। শ্রীমর ভালবাসা পেয়েছেন, তবেই তো তাঁর জন্য অত টান।

আলোচনা সমাপ্ত হইল। এখন সাতটা বাজিয়া গিয়াছে, প্রায় সাড়ে সাতটা। এইবার উপাসনা আরম্ভ হইবে। শ্রীম সাতটার সময় আসিয়াছেন। পশ্চিমের দরজার কাছে বসিয়া আছেন অপরের অলক্ষ্যে। নিকেলের চশমাটি এক একবার চক্ষুতে সংযুক্ত করিয়া মন্দিরাভ্যন্তর, ব্রাহ্ম ভক্তগণ ও অন্তেবাসীর নাটকীয় কার্যকলাপ দেখিতেছেন। আর অন্তেবাসীর সাফল্যের জন্য নাট্যশালার ম্যানেজারের মত, নয়ন-হাস্যে আনন্দ উপভোগ করিতেছেন।

মর্টন স্কুলের ছাদ। এখন রাত্রি সাড়ে আটটা। ভক্তসঙ্গে শ্রীম নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শ্রীমর আদেশে অন্তেবাসী পুনরায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কেশব মিলন' পাঠ করিলেন। পাঠান্তে শ্রীম বলিলেন, কালে এ সব লীলার নাটকের ন্যায় অভিনয় হবে। আমরা কিন্তু স্বচক্ষে দেখেছি এই দেবলীলা এই মর্ত্যধামে।

শ্রীমর পিঠে ব্যথা। সকালের ন্যায় রাত্রিতেও বেলেডোনা মালিশ করিয়া দিলেন অন্তেবাসী।

কলিকাতা, ১৭ই আগষ্ট, ১৯২৪ খ্রীঃ

১লা ভাদ্র, ১৩৩১ সাল। রবিবার, কৃষ্ণা তৃতীয়া ৪৪ দণ্ড ৫১ পল

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

পূজারীর এককণা কৃপায় নরেন্দ্র জগজ্জয়ী

১

মর্টন স্কুল। সিঁড়ির ঘর। এখন অপরাহ্ণ ছয়টা। শ্রীম চেয়ারে উপবিষ্ট। শ্রীমর সম্মুখে বেঞ্চিতে উপবিষ্ট জগবন্ধু, হরেন্দ্র দত্ত, তাহার সঙ্গী প্রভৃতি।

আজ ১৮ই আগস্ট ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, ২রা ভাদ্র, ১৩৩১ সাল। সোমবার কৃষ্ণাচতুর্থী। কথামৃত বর্ষণ হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আপনারা সব যান নববিধানে। আজও উৎসব। অনেকে বক্তৃতা দেবেন।

ভক্তরা সেখানে গেলেন। একটু পর গেলেন ডাক্তার কার্তিকবাবু, বিনয়, ছোট অমূল্য, ভৌমিক, উপাধ্যায় ও ফকিরবাবু। সাতটার সময় শ্রীম স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন নববিধানে। আজ ব্রাহ্ম যুবকদের প্রতি উপদেশের দিন।

আচার্য প্রমথ সেন বলিলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে চরিত্রবান হও। এই প্রথম যৌবন হতে তোমরা ঈশ্বরের উপাসনা কর। আর সংসারে কাজও কর। দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশই এই। এই যৌবনকালই ভক্তিবিশ্বাস লাভের উপযুক্ত সময়। এই সময় যাঁরা যতটা ভক্তিবিশ্বাস উপার্জন করবেন, তাঁরাই মনের শান্তিতে থাকবেন। অপরকেও ভাল করতে পারবেন। ভাই হীরানন্দ সিন্ধুদেশের লোক। তিনি প্রথম যৌবনেই ব্রহ্মানন্দের (কেশবচন্দ্রের) সঙ্গলাভ করেছিলেন। তারপর হীরানন্দ সঙ্গ পান দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষের। এঁদের প্রভাবে প্রচুর ভক্তিবিশ্বাস লাভ করেছিলেন। তার বলেই সুদৃঢ় চরিত্র লাভ করেন। এই সুচরিত্রের প্রভাবে বর্তমানে সিন্ধুদেশের তিনি একজন জনক।

তোমরা তাঁর এই সুমহৎ আদর্শ গ্রহণ কর। নিজে ধন্য হও, দেশকে ধন্য কর।

ইহার পর বলিলেন অধ্যাপক কামাখ্যাবাবু। যৌবনকালই ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি। এই ভিত্তি যত শক্ত হবে পরবর্তী জীবন তত মধুর হবে। দু'টি জিনিস চাই এর জন্যে। একটি ঈশ্বরে বিশ্বাস, দ্বিতীয়টি ব্রহ্মচর্য। ঈশ্বরে বিশ্বাস যাঁর আছে তিনি সত্যবাদী। সত্য ও ব্রহ্মচর্য—ঈশ্বরে বিশ্বাসলাভের দুটি স্তম্ভ। যাঁর সত্য ব্রহ্মচর্য ও ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা আছে তিনি চরিত্রবান। তাঁর দ্বারাই মহৎ কার্য সাধিত হয়। তিনি নিজেও চিত্তে আনন্দ লাভ করেন। দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবের সঙ্গগুণে সামান্য লোকও বড় হয়েছেন। তাঁর ভালবাসায় তাঁরা ঈশ্বরে ভক্তিবিশ্বাসবান হয়ে কত বড় কাজ করছেন। নিজেরাও শান্তি সুখ আনন্দ লাভ করেছেন।

এবার সুবিখ্যাত দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবী বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল। তিনি বলিলেন, ঈশ্বরবিশ্বাস ছাড়া সুমহৎ কাজ হয় না। চরিত্র তৈরী হয় না। চরিত্রের বলে অসাধ্য সাধন হয়। তোমরা দেশের ভবিষ্যৎ। তোমরা চরিত্র নির্মাণ করে সেবা কর। দেশ তোমাদের দিকে চেয়ে আছে। যুবশক্তি ছাড়া কোন দেশ উঠতে পারে না। তোমরা জাগ, দেশকে উঠাও।

রাত্রি সাড়ে আটটা। শ্রীম ভক্তসঙ্গে মর্টন স্কুলের দোতলার সভাগৃহে বসিয়া আছেন মাদুরে। এইমাত্র নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ হইতে ফিরিয়াছেন। ভক্তগণ সভার কথা আলোচনা করিতেছেন। একজন বলিলেন, সভায় আজ কেউ কেউ ঠাকুরের কথা বলেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এখন তো কত লোক তাঁর নাম করছে। কিন্তু যারা ঐদিনে তাঁকে ভালবাসতো তারা কত বড় লোক। ঐশ্বর্য প্রকাশ হলে তো সকলেই ভালবাসে।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর পড়ে আছেন। সাত টাকা মাইনে। আবার উন্মাদ। তখন যারা তাঁকে চিনেছিল তারা কে গো? তারা সামান্য লোক নয়।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—উদ্ধব, যাও গোপীদের সংবাদ নিয়ে এস শীঘ্র। যখন আমার কোনও ঐশ্বর্য ছিল না, যখন আমি গ্রাম্য লোক, রাখাল ছিলাম, সেই সময় গোপীরা আমাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে। যাও, শীঘ্র সেই গোপীদের সংবাদ নিয়ে এস। এতদিন রাজকার্যে সব ভুলে গিছলাম। তাদের ঋণ আমি কখনো শোধ করতে পারবো না। তারা যদি নিজ গুণে কৃপা করে আমায় ঋণমুক্ত করে তবেই হতে পারে। নইলে এই ঋণ শোধ হয় না।

অবতারকে কি চিনবার যো আছে? মানুষ চিনতে পারে না। তাঁর ইচ্ছাতেই কেবল কয়েকজন চিনেছিল। একেবারে মানুষ হয়ে আসেন, মানুষের সব নিয়ে—শোক তাপ ভাল মন্দ সব। এই আবরণে ঢাকা থাকেন। এরই ভিতর দু' চার জনকে ধাঁধা লাগিয়ে দেন নিজের স্বরূপ দেখিয়ে। এই আবরণের ভেতরই তাঁর সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য দেখে ভক্তগণ অবাক হয়। সংশয়ে পড়ে যায়—এ, দেব কি মানব! তাই তো, মাঝে মাঝে নিজের স্বরূপে নিয়ে আমোদ করতেন ভক্তদের সঙ্গে। বলতেন, কি গো, কি বল, গিরিশ যা বলছে (অবতার)? কখনো বলতেন—অচিন্ গাছ একটা আছে, তাকে চেনা যায় না। কখনও একটা গান গাইতেন,

তোরা কেউ তাঁরে চিনলি না রে।

সে যে দীন হীন কাঙ্গালের বেশে ফিরছে জীবের ঘরে ঘরে॥

অবতারকে যে চিনতে পারে তার আর কিছু করতে হবে না, ব্যস্। তার এতেই সব হয়ে যাবে। বল না, চেনে কেমন করে? একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা, আভিজাত্য, অপর দিকে নিরক্ষর পূজারী —দরিদ্রের দ্বন্দ্ব। কিন্তু শেষে তাঁরই জয়। শিক্ষা, আভিজাত্য কুল শীল মান সব ঐ দরিদ্র ব্রাহ্মণের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। ঐ পূজারী ব্রাহ্মণের এককণা কৃপায় নরেন্দ্র আজ জগৎজয়ী। ঐ দরিদ্র পূজারী আজ জগৎপূজ্য। রাজসিক প্রতীচী তাঁর চরণে মাথা লুটিয়ে দিয়েছে। অবতারের লীলা বুঝবে সাধ্য কার? বিচিত্র তাঁর খেলা!

২

পরদিন মঙ্গলবার। শ্রীম কথকতা শুনিতে পঞ্চানন ঘোষের লেনে গিয়াছিলেন। জগবন্ধু প্রভৃতি ভক্তদের টাউন হলে ধর্ম-বক্তৃতা শুনিতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীম কথকতা হইতে ফিরিয়া নৈশ আহার শেষ করিয়া আসিয়াছেন। ভক্তগণ দোতলার বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাত্রি সাড়ে নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। শ্রীম বেঞ্চিতে বসিয়া দুই চারিটি কথা কহিয়া ভক্তদের বিদায় দিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—বৃন্দাবনলীলার কথা হচ্ছিল। উদ্ধব-সংবাদ। উদ্ধব মথুরা থেকে গোপীদের সংবাদ নিতে এসেছেন। শ্রীকৃষ্ণ পাঠিয়ে দিয়েছেন। উদ্ধব দেখলেন, একটি গোপী গো-দোহন করছে, আর কৃষ্ণ বিরহের গান করছে। অপরের রচিত গান নয়। প্রাণের আবেগে যে সব ভাব হৃদয় থেকে বের হচ্ছে তাই গানের সুরে গাইছে। গো-দোহনে মন নাই। শিশু সন্তান দুধের জন্য কাঁদছে। গোপীর কানে সে ক্রন্দনধ্বনি পৌঁছাচ্ছে না। পতি বার বার ডাকছে, বলছে, শিশু কাঁদছে। বলছে, শীঘ্র এস দুধ নিয়ে—শুনছে না। শেষে ধাক্কা মেরেছে। তখন সুপ্তোত্থিতে মত, বিজড়িত কণ্ঠে বলছে, হাঁ কি? উদ্ধব দেখলেন, গোপীর বাহ্যজ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত। কৃষ্ণচিন্তায় মনটি ডুবে গেছে, গলে গেছে, কৃষ্ণময় হয়ে গেছে, কৃষ্ণ হয়ে গেছে। হাত যন্ত্রের মত কাজ করছিল—দুধ দুইছিল। শেষে তা-ও বন্ধ হয়ে গেল। 'ডুবিল কৃষ্ণরূপ-সাগরে আমার মন'। ভাব সমাধি।

জ্ঞানী ভক্ত উদ্ধবের জ্ঞানে পড়ল নিদারুণ আঘাত। উদ্ধব গোপীদের এসেই বলেছিলেন, তোমাদের প্রিয় কৃষ্ণ, অবতার। মানুষ হয়ে নরলীলা করছেন। তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের অধ্যক্ষ।

এই গোপীর শ্রীকৃষ্ণে ভালবাসা দেখে উদ্ধবের লজ্জা হলো। ভাবলেন, বৃথা আমার জ্ঞানবিচার—ধন্য গোপী।

এই একটি সিন। আর একটি সিন হচ্ছে এই—একজন গোপী

চরকাতে সুতো কাটছে আর গান গাইছে। শিশুপুত্র মা খেতে দাও, খেতে দাও বলছে। হুঁস নাই। ধাক্কা দিচ্ছে, হুঁস নাই। তকলি হাত থেকে পড়ে গেছে। হাত কোলের ওপর পড়ে আছে। ডিমে তা দেওয়া পাখীর মত চক্ষু পলকহীন। বেভোলা। শ্বাস পড়ছে, কি না পড়ছে! ছেলে মায়ের বুকে কেঁদে উঠলো—মা হয়তো মরে গেছে ভেবে। অপর লোক ছেলে কাঁদছে শুনে এসে হাত ধরে টান দিল জোরে। তখন চট্‌কা ভাঙ্গলো।

উদ্ধব অবাক্ হয়ে এ দৃশ্য দর্শন করলেন। তাঁর জ্ঞানবিচারে দ্বিতীয়বার আঘাত পড়ল। শ্রীকৃষ্ণবিরহে গোপী মৃতপ্রায়। 'মজিল কৃষ্ণ প্রেমসাগরে গোপীর মন।'

আর একটি দৃশ্য যমুনাতীরে। গোপীর মাথার ওপর তিনটি বলডুই (কলসী, পিতলের)। গান গাইতে গাইতে চলছে। স্নান করা ও জল ভরতে আজ দেরী হয়ে গেছে। আর সকলে চলে গেছে অনেক আগেই। সে একাকিনী। জলের ধারে কলসী রেখে বসে, বাহুদুটি জল দিয়ে রগড়াচ্ছে। মুখে কৃষ্ণের ভালবাসার গান। কার্তিকের পূর্ণ চন্দ্রালোকে বনভূমি, যমুনাতীর—সকল জগৎ ডুবে গিছলো। সেইদিনের কৃষ্ণপ্রেমের গান, রাসের প্রেমানন্দের গান। উদ্ধব যমুনাতীরে দাঁড়িয়ে দেখছে এই লীলা। গান গাইতে গাইতে রাসলীলার রাত্রির মত গোপী জগৎ ভুলল। কৃষ্ণ-রসসাগরে গোপীর জীবাত্মা বিলীন। উদ্ধব দেখছেন, গানের স্বর বন্ধ হয়েছে। আরো কাছে এসে দেখলেন, গোপীর মুখমণ্ডল মধুর জ্যোতির্ময়। প্রাণ যেন দেহে নাই। পরিধেয় বস্ত্রাদি শিথিল, স্থানচ্যুত। লজ্জার ধার ধারে না। দীর্ঘকাল পরে বাড়ীর লোক তাকে খুঁজতে এলো। জলের অভাবে সকলে তৃষ্ণার্ত। গাভী বৎসগণ পিপাসার্ত। তাকে টেনে উঠালো। ভাবের নেশায় তখনও। ঐ নেশায় চীৎকার করে বলল—'প্রাণ হে কৃষ্ণ মম জীবন'।

তৃতীয়বার কঠিন মুদগরের আঘাতে চূর্ণ হলো উদ্ধবের কৃষ্ণপ্রীতির অভিমান। উদ্ধব বুঝলেন, একখণ্ড প্রস্তরের সঙ্গে একটি খণ্ড

মাখনের যে সম্পর্ক, উদ্ধবের কৃষ্ণপ্রীতির সঙ্গে গোপীদের মন প্রাণ দেহজ্ঞান বিগলিত কৃষ্ণপ্রেমের সেই সম্পর্ক।

আহা কি শক্তি এই কথকদের। এমন বিবরণ, যেন চোখের সামনে হচ্ছে এই লীলা। লোক যেন মদের নেশার মত অবশ হয়ে বসে রইল। Emotionটাকে (মনের কোমল ভাবটাকে) sublimate করে (ভগবৎ প্রেমে ডুবিয়ে) দেয়।

তারপর একটি গান গাইল। দুটি পদ মনে করে এনেছি। তাই আপনাদের উপহার দিচ্ছি। এইটি গাইতে গাইতে আপনারা ঘরে যান। গানটি উদ্ধবের মুখের।

ধন্য গোপী ধন্য গোপী ধন্য বৃন্দাবন।
হেথা করলো কৃষ্ণপ্রেম মুরতি ধারণ॥

পরদিন বুধবার ২০শে আগস্ট, ১৯২৪ খ্রীঃ, ৪ঠা ভাদ্র ১৩৩১ সাল। নববিধান ব্রাহ্মসমাজে এখনও উৎসব চলিতেছে। পূর্বের বিষয় ছিল জেনারেল বুথের জীবনালোচনা। জগবন্ধু, ডাক্তার, বিনয়, ছোট অমূল্য, রজনী, উপাধ্যায় নববিধান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা।

শ্রীম মর্টন স্কুলের দ্বিতলে বারান্দায় বেঞ্চিতে বসিয়া আছেন। ইতিমধ্যে বড় জিতেনও আসিলেন। কথাবার্তা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—জেনারেল বুথই 'স্যলভেশান আর্মির' (Salvation Army) প্রতিষ্ঠাতা। Worldএ (জগতে) খুব বড় organisation (প্রতিষ্ঠান)। Fallen Womenদের (পতিতাদের) তারা উদ্ধার করছে। এদের সকলকে দেখলে ক্রাইস্টের কথা মনে পড়ে—তাঁর উদ্দীপন হয়। প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে তিনি এসেছিলেন। তিনি অনেক কাজ করেছিলেন। তার মধ্যে একটি কাজ ছিল পতিতার উদ্ধার। সেটিকে বীজরূপে গ্রহণ করে আজও আবার লোক অনেক কাজ করছে। অবতারের প্রত্যেকটি কাজ এক একটি জীবন্ত ভাব। এক একটি শক্তিকেন্দ্র। যেমন ডায়নামো, হাজার হাজার বছর ধরে এটি কাজ করে।

মেরীকে উদ্ধার করেছিলেন ক্রাইস্ট। মনে হয় মূলে ঐ কার্যটি ; তারা ঐটিকে আদর্শ করে কাজ করছে।

ক্রাইস্ট বলেছিলেন, যারা সুস্থ তাদের ডাক্তারের দরকার নাই। অসুস্থদের প্রয়োজন। তেমনি আমি এসেছি পাপীতাপীদের জন্য। কেবল ধার্মিকের জন্যই নয়। 'I came not to call the righteous, but the sinners to repentence.'

মেরী ছিলেন বড়লোকের মেয়ে। বাপ মা মরে যায়। ম্যাকডেলা প্রাসাদে বাস করেন। অসাধারণ রূপবতী। বাপমায়ের মৃত্যুর পর চরিত্র খারাপ হয়ে যায়। বিলাসিনী হয়ে পড়েন। শোনা যায়, তাঁর পোশাক ও অলংকারাদি গ্রীস ও রোম থেকে আসতো। পরে আপনি অনুশোচনা হয়। একদিন ক্রাইস্ট তাঁর প্রাসাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন দেখতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ বুঝলেন, তাঁর সমস্ত পাপ চলে গেছে। আর ক্রাইস্টের পবিত্রতা ওঁর মধ্যে ঢুকে গেছে। সেই থেকে কঠোর তপস্যা করছেন। মাথার চুল ছোট করলেন। চট পরতেন আর কাঁদতেন। একদিন ক্রাইস্ট ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে পিটারের কুটীরে আছেন। মেরী ছুটে এসে পায়ে পড়ে। কি কান্না! পা ভিজে গেছে! আর তিনি মাথার চুল দিয়ে পুঁছে দিচ্ছেন। তাঁর কৃপা হলো। বললেন, তুমি পাপমুক্ত হয়ে গেলে দেবী—'Woman, thy sins are forgiven.' মৃত্যুর পর মেরীকেই প্রথম দেখা দেন। কবরের কাছে বসে কাঁদতেন। আহা কত প্রেম!

তাঁর আর একটি বাণী—যে অনাথ শিশুদের আশ্রয় দেয় তার ওপর ভগবানের দয়া হবে। এইটি নিয়ে হয়েছে যত অনাথ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা।

অবতারের এক একটি বাণী মূর্তিপরিগ্রহ করে কালে।

ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ হয়তো মনে ঐ সব কাজ পছন্দ করেন না। শ্রীম তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই উত্তর দিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুর একঘেয়ে হতে ভালবাসতেন না। তাঁর কাছে তাই নানারকমের ভক্ত আসতো। হিন্দু, মুসলমান,

খ্রীস্টান। আবার হিন্দুদের নানাপথের ভক্ত আসতো—কর্তাভজা, ঘোষপাড়া—নবরসিক পর্যন্ত ছাড়েন নি। একদিকে বেদান্তে শুদ্ধ-সাধক, অন্যদিকে তন্ত্রের বীরাচারী—যেন অচলানন্দ। কাউকেও ছাড়েন নি। তিনি খেতেন ফুল—কাঁটার ভেতর থেকে। ভক্তিটি নিতেন। তাই কেশব সেনকে বলেছিলেন, রাসলীলা নাইবা নিলে, কিন্তু কৃষ্ণের জন্য গোপীদের টানটুকু নেও।

খালি কি গিরিশবাবুকেই কোলে তুলে নিয়েছেন? থিয়েটারের অনেক লোককে উদ্ধার করেছেন—স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই। কি বলে, ঠগ বাছতে গাঁও উজাড়।

শুদ্ধ ভক্ত হয় বহু তপস্যা থাকলে। ভক্ত ছাড়া ঠাকুর থাকতে পারতেন না। শুদ্ধ ভক্তদের জন্য কাঁদতেন। বাইশ বছর কেঁদেছিলেন। তবে তাঁরা আসেন। এর পূর্বে অনেক রকমের ভক্ত যেতো তাঁর কাছে। তাদের সঙ্গেই যতটুকু সম্ভব ঈশ্বরীয় কথা কইতেন, তার আনন্দ উপভোগ করতেন। ঠিক ঠিক ভক্তসঙ্গ বহু তপস্যার ফল।

৩

কাল জন্মাষ্টমী। শ্রীম মর্টন স্কুলের চারতলার ছাদে বসিয়া আছেন চেয়ারে উত্তরাস্য। শ্রীমর সম্মুখে তিন দিকে ভক্তগণ বেঞ্চিতে বসা—ডাক্তার কার্তিক বক্সী, বিনয়, ছোট অমূল্য, বড় জিতেন, বড় অমূল্য, বলাই, গদাধর, শান্তি, মোটা সুধীর, উপাধ্যায়, সিলেটের রজনী, ছোট নলিনী, ভাটপাড়ার বড় ললিত, জগবন্ধু প্রভৃতি। এখন রাত্রি আটটা। একজন নূতন ভক্ত আসিয়াছে।

আজ বিকালে শ্রীম রজনীকে নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচারাশ্রমে পাঠাইয়াছিলেন। মির্জাপুর স্ট্রীটের কাছে রমানাথ মজুমদার লেনে এই আশ্রম অবস্থিত। রজনী ইহা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই। এই বিষয় লইয়া ভক্তসভায় নানারূপ সমালোচনা চলিতেছে। শ্রীমও বিস্মিত হইয়াছেন, রাস্তাটি পর্যন্ত বাহির করিতে পারেন নাই শুনিয়া।

রজনী সরল গ্রাম্য লোক। বৈষয়িক বুদ্ধি প্রখর নয়। কেহ তাহার সঙ্গে গিয়া রাস্তাটি দেখাইয়া দেয়—শ্রীমর এই ইচ্ছা।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি সহাস্যে)—ইনি রাস্তা খুঁজে পান নি। (শান্তির প্রতি) দেখে আসবে একবার ? না, তুমি আবার ক্যাম্বেল (মেডিকেল স্কুল) থেকে এসেছ, বড্ড tired (পরিশ্রান্ত)।

(সকলের প্রতি)—কোন্ বীর মাত্র দশ হাজার সৈন্য নিয়ে কতলুখাঁকে সুবর্ণরেখা (নদী) পার করে দিতে পারে ?

জগৎ সিংহ দাঁড়ালো। বললো, পাঁচ হাজারেই কাজ হয়ে যাবে। কেবল জগৎ সিংহই পারে। এ তারই কাজ।

শান্তি উঠিয়া দাঁড়াইল, মুখে হাসি।

শ্রীম (শান্তির প্রতি)—যাচ্ছ ? বা! দেখবো কেমন—।

পার্বতী মিত্র ছিলেন ঘোড়ার বেপারী ধর্মতলার হার্ট (Hart) কোম্পানীর ম্যানেজার—নাগ মহাশয়ের ভক্ত। তাঁহার গৃহে নাগ মহাশয়ের উৎসব হইবে। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্গাকে শ্রীমর নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছেন। দুর্গা করজোড়ে শ্রীমকে নিমন্ত্রণ করিলেন। শ্রীম বলিলেন, আমাদের যাওয়ার সম্ভাবনা কম—old man (বৃদ্ধ) কিনা। ভক্তরা যাবেন কেউ কেউ। দুর্গা প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

অনেক দিন বলার পর উপাধ্যায় আজ বেলুড় মঠ দর্শন করিয়া আসিয়াছে। শ্রীম তাহার মুখে মঠের বিবরণ শুনিতেছেন। এই প্রসঙ্গে রকমারী সাধুর কথা উত্থাপন করিলেন। এই সূত্রে রজোগুণী তমোগুণী সাধুর কথা উঠিল। কেহ গাঁজা খায়, কেহ ক্রোধী, এইসব কথা হইতেছে। এই মুখরোচক পরনিন্দার কথা শুনিয়া এই নিম্নগামী স্রোতের প্রবাহ উল্টাইয়া উর্ধ্বগামী করিয়া দিলেন শ্রীম।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুরের তখন শরীর আছে—এইটিন এইটিটু (১৮৮২)। আমরা বড়বাজারে সাধু দেখতে গিছলাম। একজন নিয়ে গিয়ে আমাদের introduced (পরিচয়) করিয়ে দিলেন বড় শিখ-সঙ্গতে। একজন বৃদ্ধ সাধু আমাদের উপদেশ দিয়েছিলেন, ঐ কথা—সাধুসঙ্গ কর।

ঐ কথাটি বলে সাধু একটি গল্প বললেন। গল্পটি এই—মানস সরোবরে একজন পক্ষীযজ্ঞ করতো। তার অভিপ্রায় এই ছিল, পক্ষীযজ্ঞ করলে সেখানে নানা পক্ষী আসবে। তার সঙ্গে হংসও আসবে। হংসের সঙ্গে পরমহংস আসবে নিশ্চয়। পরমহংস মানে বিষ্ণু।

এর মানে হলো এই—সাধু যে রকমই হোন তাঁকে সম্মান করা উচিত। সম্মান করতে করতে, পূজা করতে করতে যদি কপাল ভাল থাকে, তা হলে এই আয়োজনেই ঈশ্বরের কৃপা হতে পারে। শেষে তাঁর দর্শন হয়ে যেতে পারে।

কেন তুমি সাধুদের সম্মান করছো? ঈশ্বরের জন্য কিনা। তাই এতে ঈশ্বরের কৃপা হতে পারে।

শ্রীম (উপাধ্যায়ের প্রতি)—ঠাকুরও একটি গল্প বলেছিলেন আমাদের কাছে। একজন সাধু স্নান করছিলেন। কৌপীন খুলে জলে দাঁড়িয়ে উহা পরিষ্কার করছিলেন। হঠাৎ ওটা হাত থেকে পড়ে গিয়ে জলে ভেসে গেল। সেই সময় দ্রৌপদীও স্নান করছিলেন। তিনি তখন আপনার কাপড়ের অর্ধেকখানা ছিঁড়ে সাধুকে দিলেন। সাধু তা পরে তবে ওপরে আসেন।

কৌরবসভায় যখন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ হচ্ছিল তখন তিনি লজ্জা-নিবারণ নারায়ণকে প্রাণভরে ডাকছেন। ভগবান দেখা দিয়ে বললেন, তুমি কি কখনও সাধুকে বস্ত্র দান করেছ? দ্রৌপদী স্মরণ করে বললেন, এই গল্পটি। তখন ভগবান বললেন, তা হলে আর তোমার ভয় নাই।' দুঃশাসন যত টানছে দ্রৌপদীর বস্ত্র ততই বেড়ে যাচ্ছে।

এর মানে হলো এই। সাধু ভগবানের রূপ। তাঁর পূজা করলে, তাঁকে পূজা করলে, ভগবানকেই পূজা করা হয়।

গল্পটি বলেই ঠাকুর আবার বলিয়ে নিলেন যাকে বলেছিলেন তার মুখ দিয়ে (শ্রীমর মুখ দিয়ে)। কেন? যাতে মনে ছাপ পড়ে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—মুখে বললেই হলো—সাধু কিছু নয়—all men are equal (সব মানুষ সমান) ?

সাধু ঈশ্বরকে ধরে থাকেন। তাই যারা সাধুকে ধরে থাকে, অর্থাৎ ভক্তরা, তারা ঈশ্বরকেই ধরে।

ঈশ্বরকে প্রেমময় বলে। লোকে কি বোঝে এই কথায় ? মানুষের ভিতর দিয়ে যখন দেখতে পায় এই প্রেম, তখনই এ কথার অর্থ বোধ হয়।

মানুষের ভেতর পশু, মানুষ ও দেবতা—এই তিনই রয়েছে। বাইরের রূপটা তো সকল মানুষেরই এক। কিন্তু, ভেতরের গুণের প্রভেদেই ঐরূপ ভেতরের রূপ ভেদ হয়।

যদি কোন মানুষে দেখা যায় যে তিনি অপরকে নিজের সর্বস্ব দিয়ে যাচ্ছেন, সকল দুঃখ বরণ করছেন মৃত্যু পর্যন্ত—ঈশ্বরলাভের জন্য—অত প্রেম তাঁর ঈশ্বরে, তখনই লোক বিচার করে, যিনি এর ভেতর এই অসাধারণ প্রেম প্রদান করেছেন, তিনি নিশ্চয় প্রেমময়। এই কথাটি দিয়ে, অর্থাৎ সর্বত্যাগীর দৃষ্টান্ত দিয়ে, ঈশ্বরের প্রেমময়ত্বের কতকটা ধারণা হয়।

তাই সাধুকে মান দিতে হয়, পূজা করতে হয়। সাধুর পূজা আর ঈশ্বরের পূজা এক।

বড় জিতেন—এ কথা আজকাল লোক মানতে চায় না। তারা বলে, সাধু বসে বসে খায়। যারা খেটে খায় অথচ দরিদ্র, তাদের দাও।

শ্রীম—আমরা পলিটিশিয়ানদের কথা বলছি না। আমরা বলছি, বেদ, উপনিষদ, অবতার মহাপুরুষদের কথা। যারা ঐ কথা বলে, তাদের এই কথার মূলে ঐ—মানুষ সব সমান, All men are equal.

তুমি যদি কাপড় কিনতে বাজারে যাও, তখন কি তুমি চালের দোকানে কাপড় কিনতে যাও, কি কাপড়ের দোকানে যাও ? তেমনি যদি তুমি ঈশ্বরকে চাও, তা হলে যে ঈশ্বরকে নিয়ে ব্যাপার

করে তার কাছেই যাবে। অবতার ঋষি মহাপুরুষদের কাছে যেতে হবে। সর্বত্যাগী সাধু ঈশ্বরের ব্যাপারী।

হাঁ, তবে যদি নারায়ণবুদ্ধিতে, ঈশ্বরবুদ্ধিতে দরিদ্রকে দাও, সেটা হয় পূজা। তাতে তোমার চিত্তশুদ্ধি হবে। তখন সেই শুদ্ধ চিত্তে ভগবান দর্শন হবে। এটা নিষ্কাম কর্মের পথ। দরিদ্রকে নারায়ণরূপে দেখার জন্যও তোমাকে সাধুর কাছে যেতে হবে।

কেবল দরিদ্রবুদ্ধিতে যদি দাও, তবে বোঝা যাবে তোমার দয়া আছে। দয়ার ফল পাবে। সুনাম হবে। কিন্তু এরও ওপরে সেবা। ঈশ্বরই এই রূপে রয়েছেন। তাই ঈশ্বরের সেবা দরিদ্র-নারায়ণে। রাম ও জনক প্রজাপালন করেছিলেন ব্রহ্মবুদ্ধিতে, জীব শিব—এই বুদ্ধিতে।

বিদ্যাসাগর মশায়কে এই কথাই বলতে গিছলেন ঠাকুর। বলেছিলেন, এ দয়ার কর্ম, পরোপকার যদি নিষ্কামভাবে করা যায় তা হলে ঈশ্বরলাভ হয়। বলেছিলেন, তোমার ভেতর মানিক আছে। অল্প একটু আবরণ আছে এর ওপর। ওখানে যেও, ওটা সরিয়ে দেব। তখন মানিক বের হয়ে পড়বে। অর্থাৎ ঈশ্বর দর্শন হবে।

কেবল রোজগার কর আর খাও, এর চাইতে বড় সকাম দান। তার চাইতে বড় পরোপকার, দয়ার দান। তার চাইতে বড় সেবার দান। সেবার দান নিষ্কাম; তাই তাতে ঈশ্বরলাভ হয়, তাই সেটা সকলের বড়।

কেন ঈশ্বরলাভ বড়? এতে যে সর্বদুঃখ বিনাশ হয়। সর্বাবস্থায় মনে সুখ-শান্তি-আনন্দ থাকে। দয়ার কার্যে যে আনন্দ, তা সর্বাবস্থায় থাকে না। যাতে আনন্দ সর্বাবস্থায় উপভোগ হয় তার জন্যই সেবা—ঈশ্বরবুদ্ধিতে সেবা।

যাদের উদ্দেশ্য অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি, অর্থাৎ ঈশ্বরদর্শন, আত্ম-দর্শন, তাদের (সাধুদের) সেবা করতেই হবে। তাদের কাছেই সাধুসেবা, সাধুর পূজা, আর ঈশ্বরের পূজা এক।

একজন ভক্ত—সাধু যদি খারাপ কাজ করে তবে তাকে খারাপ বলবে না লোকে?—যদি চুরি করে?

শ্রীম—হাঁ, যদি caught red-handed হয় (হাতেনাতে ধরা পড়ে), তা হলে এক কথা। ঘটি চুরি করবার সময় যদি ধরা পড়ে তবে অবশ্য ভাববার কথা। তা হলেও ঘটিটা নিয়েই ছেড়ে দিতে হয়।

বড় জিতেন—সিলেটের ভক্তটি একটু এলোমেলো। সেদিন দেখি ছাতাটা উলটিয়ে মাথায় হাত দিয়ে চলেছে।

শ্রীম (উত্তেজিত ভাবে)—তা কেন করবে না? যে বিয়ে করে নি, তার অযুত হস্তীর বল। সে কেন conventionalism (সামাজিক নিয়মানুগত্য) মানবে? কারো তো তোয়াক্কা রাখে না সে। অন্য লোক কি করে? টাকাকড়ি, মেয়েমানুষ, লোক-মান্যের দাস হয়ে আছে। আর সাধু এ সব ছেড়েছে কাকবিষ্ঠাবৎ। সাধু কার ধার ধারে?

সাধুর সমালোচনা সামান্য হইলেও শ্রীমর নিকট অসহ্য।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি)—হাঁ, আজ আবার জন্মাষ্টমী। কথামৃত একটু পাঠ হোক—আমাদের বাৎসরিক লীলামহোৎসব।

কিছুদিন ধরিয়া শ্রীম, যে তারিখ যে দিনে কথামৃত পাঠ হয়, ঠাকুরের সময়কার সেই দিনের সেই তারিখের ঠাকুরের মহাবাণী ও লীলাবিবরণ পাঠ শুনিতেছেন। ইহাকে তিনি বাৎসরিক লীলা-মহোৎসব নামে অভিহিত করেন। তাই আজ ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বরের বিবরণ পাঠ হইতেছে। বড় অমূল্য পড়িতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আছেন। তাঁহার গলার অসুখের সূত্রপাত হইয়াছে। তবুও দিবানিশি ভক্তদের কিসে কল্যাণ হয় তাহা লইয়া ব্যস্ত। তিনি বলেন, কিছুদিন নির্জনে তপস্যা ও সাধুসঙ্গ করিয়া ভক্তিলাভ করিয়া ভক্তগণ সংসারে থাকিলে সুখ-দুঃখে মন অত উদ্বেলিত হইবে না।

কামিনীকাঞ্চনে মন থাকিলে যত অশান্তি দুঃখ। মনকে কষ্ট

করিয়া কুড়াইয়া আনিয়া ভগবানের পাদপদ্মে দেওয়া উচিত। তবেই শান্তি সুখ আনন্দ। ইহাকেই ভক্তি বলে। এই জন্য মানুষজন্ম। জীবের পুনর্জন্ম হয় কিনা, কাটোয়ার বৈষ্ণবের এই প্রশ্নের উত্তর গীতার কথা দিয়া বলিলেন, পুনর্জন্ম হয়। যে যা চিন্তা করে প্রাণত্যাগ করে সে তাই হয়। তবুও কুতর্ক করায় বলিলেন, তোমার এ সব কথা হীনবুদ্ধির কথা। মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ ঈশ্বরে ভক্তিলাভ করা। তাঁকে দর্শন করা। সংসারে আসাই আম খাবার জন্য (ব্রহ্মানন্দ উপভোগের জন্য)। তাহাকে আরো বলিলেন, আম খেতে এসেছ আম খাও। গাছপালার অত খবরে কাজ কি? তবুও বৈষ্ণব তর্ক করিতেছে দেখিয়া তাহাকে তিরস্কার করিলেন। পুনরায় বলিলেন, যেসব কথা বইয়ে পড়েছো সেগুলি ধারণা কর নির্জনে গোপনে তপস্যা করে। কেবল বইয়ের কথা আওড়ালে কিছু হয় না। সিদ্ধি সিদ্ধি বলে চীৎকার করলে নেশা হয় না, পেটে পড়া চাই।

পাঠ চলিতেছে। গিরিশ ঘোষ ঠাকুরকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্তব করিতেছেন। এক বৎসরের জন্য সেবাধিকার প্রার্থনা করিতেছেন।

একজন ভক্ত—গিরিশবাবু যে পূর্ণব্রহ্ম বললেন, এটা কি নিজের ধারণা বিশ্বাস, না মদের নেশার প্রলাপোক্তি?

শ্রীম—বিশ্বাস বলেই তো মনে হয়। ঠাকুর নিজেই বললেন, 'তোমার যে বিশ্বাসভক্তি'।

ঢং করে বললে ধোপে টেকে না। গিরিশবাবুর এই বিশ্বাস বাকী জীবন ছিল। এদিকে সিংহরাশি পুরুষ। কিন্তু ঠাকুরের কাছে, ভক্তদের কাছে যেন শিশু। তিনিই তো প্রথম অবতার বলে প্রচার করেন। ঠাকুর তাঁর এ কথা, অর্থাৎ 'ঠাকুর অবতার' গ্রহণ করেছেন, নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, গিরিশ যে অবতার বলে, তোর কি মনে হয়? আবার বলেছিলেন, গিরিশের পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস।

পাঠ শেষ হইল।

একজন ভক্ত—গুরুতে ইষ্টবুদ্ধি, ভগবানবুদ্ধি হয় কি করে?

শ্রীম—যার হয়েছে এ বুদ্ধি, তার সঙ্গ করা, সেবা করা। সাধুসঙ্গ করা। আর কেঁদে কেঁদে বলা ভগবানকে, এটা বুঝিয়ে দাও। ঈশ্বরের দিকে যত এগুবে ততই বুঝতে পারবে—ঈশ্বরই গুরুর ভেতর দিয়ে শিষ্যের কাছে উপস্থিত। শক্তি একটাই, শরীর দুটো। সেই একই শক্তি কখনও গুরু, কখনও ইষ্ট।

গুরু অর্থ ঈশ্বর। তিনিই অবতার হয়ে আসেন। তিনি জগৎগুরু। তাঁর এই শক্তি শিষ্যের ভেতর দিয়ে জগতে প্রকাশিত হয়। তাই ঠাকুর বলেছিলেন গুরুতে ইষ্টবুদ্ধি করতে হয়। মানুষ-বুদ্ধি করলে ছাই হবে। আর বলেছিলেন, ঈশ্বরদর্শনের উপায় গুরুবাক্যে বিশ্বাস—অবতারের বাক্যে। অবতার গুরু, ঠাকুর গুরু।

কলিকাতা, ২১শে আগস্ট, ১৯২৪ খ্রীঃ
৫ই ভাদ্র ১৩৩১ সাল, বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণাসপ্তমী, ৫২।৯ পল

চতুর্বিংশ অধ্যায়

গুরুদ্বারায় শ্রীম

মর্টন স্কুলের চারতলা। শ্রীম আপন কক্ষে বিছানায় বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। মাথায় কম্ফোর্টার, গায়ে লাল-ইমলীর সাদা সুয়েটার। তার উপর ছাই রংএর ওয়ার ফ্লানেলের ঢিলা-হাতা পাঞ্জাবী। শীতকাল, এখন ভোর চারটা। স্থির হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন। বাহ্য চেতনা নাই।

আজ ১লা জানুয়ারী। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এই দিনে কল্পতরু সাজিয়া অনেকগুলি ভক্তকে ইষ্টদর্শন করাইয়াছিলেন ১৮৮৬খ্রীস্টাব্দে। শ্রীমর মন ঐ ব্রহ্ম-দর্শনের অনুধ্যানে নিমগ্ন।

সাতটার সময় ঐ আসনে বসিয়াই গুন্‌গুন্ করিয়া তিনি গান গাহিতেছেন।

শ্রীম—যার হয়েছে এ বুদ্ধি, তার সঙ্গ করা, সেবা করা। সাধুসঙ্গ করা। আর কেঁদে কেঁদে বলা ভগবানকে, এটা বুঝিয়ে দাও। ঈশ্বরের দিকে যত এগুবে ততই বুঝতে পারবে—ঈশ্বরই গুরুর ভেতর দিয়ে শিষ্যের কাছে উপস্থিত। শক্তি একটাই, শরীর দুটো। সেই একই শক্তি কখনও গুরু, কখনও ইষ্ট।

গুরু অর্থ ঈশ্বর। তিনিই অবতার হয়ে আসেন। তিনি জগৎগুরু। তাঁর এই শক্তি শিষ্যের ভেতর দিয়ে জগতে প্রকাশিত হয়। তাই ঠাকুর বলেছিলেন গুরুতে ইষ্টবুদ্ধি করতে হয়। মানুষ-বুদ্ধি করলে ছাই হবে। আর বলেছিলেন, ঈশ্বরদর্শনের উপায় গুরুবাক্যে বিশ্বাস—অবতারের বাক্যে। অবতার গুরু, ঠাকুর গুরু।

কলিকাতা, ২১শে আগস্ট, ১৯২৪ খ্রী:
৫ই ভাদ্র ১৩৩১ সাল, বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণাসপ্তমী, ৫২।৯ পল

চতুর্বিংশ অধ্যায়

গুরুদ্বারায় শ্রীম

মর্টন স্কুলের চারতলা। শ্রীম আপন কক্ষে বিছানায় বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। মাথায় কম্ফোর্টার, গায়ে লাল-ইমলীর সাদা সুয়েটার। তার উপর ছাই রংএর ওয়ার ফ্লানেলের ঢিলা-হাতা পাঞ্জাবী। শীতকাল, এখন ভোর চারটা। স্থির হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন। বাহ্য চেতনা নাই।

আজ ১লা জানুয়ারী। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এই দিনে কল্পতরু সাজিয়া অনেকগুলি ভক্তকে ইষ্টদর্শন করাইয়াছিলেন ১৮৮৬খ্রীস্টাব্দে। শ্রীমর মন ঐ ব্রহ্ম-দর্শনের অনুধ্যানে নিমগ্ন।

সাতটার সময় ঐ আসনে বসিয়াই গুন্‌গুন্‌ করিয়া তিনি গান গাহিতেছেন।

গান। গুরু কাণ্ডারী যেমন আর কি তেমন আছে নেয়ে।
পার করেন দীন জনে অভয়চরণ-তরী দিয়ে॥ ইত্যাদি।

গান। দয়াল গুরু বলে দাও রে সাঁতার।

গান। চল গুরু দু'জন যাই পারে।

এখন সকাল আটটা। এটর্নি বীরেন বসু মোটর লইয়া আসিয়াছেন। শ্রীম বিনয় ও বীরেনকে সঙ্গে লইয়া ৺দক্ষিণেশ্বর রওনা হইলেন। ফিরিলেন ঠাকুরবাড়ীতে। এখন বেলা সাড়ে এগারটা।

আজ গড়ের মাঠে সৈন্যদের বাৎসরিক কুচকাওয়াজ। ঐ আনন্দ হীন হইলেও শ্রীম ত্যাগ করেন নাই। তাই দুইজন ভক্তকে অতি প্রত্যুষে উহা দেখিতে পাঠাইলেন—(ছোট নলিনী ও অপর একজনকে)। রাত্রিতে সব সংবাদ লইবেন।

শ্রীম মধ্যাহ্নভোজন করিয়া ঠাকুরবাড়ীতেই বিশ্রাম করিলেন। পরিবারবর্গ ঐ স্থানে। অপরাহ্ণ চারটায় মর্টন স্কুলে ফিরিয়াছেন।

আজ কল্পতরু দিবস আর ১লা জানুয়ারী বলিয়া অফিস বন্ধ। তাই অনেক ভক্তসমাগম হইয়াছে। ভাটপাড়ার ললিত, ভোলানাথ প্রভৃতি আসিয়াছেন। শুকলাল, মনোরঞ্জন, বড় জিতেন, ছোট জিতেন, দুর্গাপদ, ডাক্তার বক্সী, বিনয়, অমৃত, বড় ও ছোট অমূল্য, ললিত উকীল, জগবন্ধু, বলাই, গদাধর, বুদ্ধিরাম প্রভৃতি বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছে।

প্রথমে বাহিরে ছাদে বসিলেন। পরে শীত বলিয়া, আলো আসিতেই চারতলার সিঁড়ির ঘরে বসিয়াছেন। সকলের সহিত শ্রীম ধ্যান করিতেছেন।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পূর্বের শ্রী নাই, কষ্ট হয় দেখিলে—এই সব কথা ধ্যানান্তে হইতেছে। তবুও সেখানকার প্রতিটি ধূলিকণা পবিত্র। ঐ স্থান মহাতীর্থ। ভগবান সশরীরে ত্রিশ বৎসর ছিলেন ওখানে। এই সব কথা হইতেছে।

স্বামী মাধবানন্দ ও অন্য এক সঙ্গী সাধু প্রবেশ করিলেন। শ্রীম অতি স্নেহে তাঁহাকে নিজের পাশে বেঞ্চিতে বসাইলেন। ইনি

মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ। কুশল প্রশ্নাদির পর নানা কথা হইতেছে।

শ্রীম (স্বামী মাধবানন্দের প্রতি)—আপনারা মস্ত একটা কাজ করেছেন, ঠাকুরের lifeটা (জীবনীটা) বের করে। বছর তিনেকের চেষ্টায় এটা হয়েছে। এটার খুবই দরকার ছিল। তবে এখন নন-কোওপারেশানে সকলে ব্যস্ত। পলিটিশিয়ানরা too busy (অত্যন্ত ব্যস্ত)। দেখবার সময় নেই।

স্বামী মাধবানন্দ—তারা এ সব বিশ্বাস করে না।

শ্রীম—তা বটে। অনেকেই পছন্দ করে না। গান্ধী মহারাজ ফোরওয়ার্ডে কত বড় কথা লিখেছেন—'His life enables us to see God face to face. …Ramakrishna was a living embodiment of godliness.' মানে, তাঁর জীবনচরিত শুনলে মনে হয় যেন ঈশ্বর হাতে এসে গেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরীয় ভাবের জীবন্ত বিগ্রহ। কি কথা! গান্ধী মহারাজের মত কয়জনের এই insight (অন্তর্দৃষ্টি) আছে? অপর লোক এসব সম্বন্ধে হয়তো patronisingly (মুরুব্বিয়ানা করে) বলে।

আমরা যখন ব্রাহ্ম সমাজে ঈশ্বরের কথা শুনতাম তখন মনে হতো তিনি কত দূরে! ও মা, ঠাকুরের কাছে কথা শুনে মনে হতো যেন ঈশ্বর পাশে বসে আছেন, হাতের কাছে! গান্ধী মহারাজ তাঁকে দর্শন করেন নি, কিন্তু উচ্চ অনুভূতি আছে। কেমন ধরেছেন তিনি, দেখুন।

তা হবে না। ঠাকুর তো শুধু ঈশ্বরদর্শন করেন নি। নিজে যে ঈশ্বর—অবতার! তাই তো যারা শুদ্ধচিত্ত তারা ধরতে পারে, বুঝতে পারে। আবার কতজনকে ঈশ্বরদর্শন করিয়েছেন।

স্বামী মাধবানন্দ—গান্ধীজী সব ছেড়ে স্বরাজলাভের চেষ্টা করছেন, খুব sincere!

শ্রীম—তিনি যে ঠিক ঠিক কর্মযোগী। সব ভোগ ছেড়ে যে কর্ম করতে চেষ্টা করে তাকেই বলে কর্মযোগী। কত বড় যোগী পুরুষ! যোগী না হলে ঠিক ঠিক কাজ হয় না। সব করবো, কিন্তু benefit

(ভোগ) নেবো না, এইটি যোগীপুরুষের ভাব। গান্ধীজীর কাজ ঠিক কাজ। দেশ কত উঠেছে !

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুরের Self-Government (স্বরাজ) হলো আত্মসংযম। এঁরা বলেন Independence (স্বাধীনতা)। ঠাকুরের ভাবও আলাদা, ভাষাও আলাদা।

ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ সাহস করিয়া রাজনীতির কথা তুলিয়াছেন। দেশে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন চলিতেছে। সর্বত্র এইসব আলোচনা, বড় বড় নেতারা জেলে যাইতেছেন। ঘরের কুলবধূও বাহির হইয়া ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। দুই একজন ভক্ত কোমর বাঁধিয়া এই সব কথায় মত্ত। শ্রীম কৌশল করিয়া এই কথার স্রোত ঈশ্বরের দিকে ফিরাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, এই সব কথা যেন কোচড়ের দাদ। একবার চুলকাতে আরম্ভ করলে আর রক্ষে নাই। শেষে নির্লজ্জ হয়ে দু' হাতে বেহুঁশ হয়ে চুলকাতে থাকে।

শ্রীম (স্বামী মাধবানন্দের প্রতি)—কিন্তু ঠাকুরের politics (রাজনীতি) ছিল ঐটুকু—(সহাস্যে) 'কুঁয়ার সিং বলে, ইংরেজ রাজা, সেলাম করতে হয়।' স্বামীজী নিবেদিতাকে বলেছিলেন, I have nothing to do with politics (রাজনীতির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নাই)।

একজন ভক্ত—আচ্ছা, পলিটিক্সের (রাজনীতির) মধ্যে কত ত্যাগ দেখা যাচ্ছে। কত দুঃখ বরণ করছেন এঁরা।

শ্রীম—হাঁ, পলিটিক্সের (রাজনীতি) মধ্যে ত্যাগ আছে নিশ্চয়। এই যেমন আয়ার্ল্যাণ্ডে ম্যাকস্যুইনি। একানব্বই দিন, না কত দিন, খেলই না। শরীর ত্যাগ করে দিল। এ ত্যাগও সকাম। এ কেমন ? যেমন, ছেলেরা ইস্কুলে না খেয়ে চলে এলো। কেন ? না, একে দিয়েছে দুটো সন্দেশ, আর ওকে চারটে। এই জন্য রেগে না খেয়েই চলে গেল (সকলের হাস্য)।

এ হলো ভোগের জন্য ত্যাগ। কম ভোগ হচ্ছে, বেশী ভোগ পাবার জন্য। আর ঈশ্বরের জন্য ত্যাগ, সে অন্য কথা! গান্ধীজীর কাজ ঈশ্বরের জন্য। তাই 'রাম রাম' করেন। এর ভেতরও ভাল লোক আছে। সংখ্যায় খুব কম। বেশীর ভাগই ঐ সকাম।

মাদ্রাজের সুবিখ্যাত জজ সুব্রামণ্য আয়ারের কথা হইতেছে। ইনি অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করিয়া নাইট উপাধি পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও প্রতিবাদে নাইট উপাধি ছাড়িয়াছেন। সম্প্রতি একজন একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার কথা মাধবানন্দজী বলিতেছেন। স্বামীজীর কথাও আছে।

শ্রীম—খুব interesting article (মজার মজার প্রবন্ধ) তো! আমরা নতুন কথা একটা জানলুম। মাথার পাগড়ী ফেলে দিলেন। আর বললেন, আমায় arrest (গ্রেপ্তার) কর। স্বামীজী সম্বন্ধে এটি নতুন কথা শুনলাম। নরেন সেনও সেইরূপ করেছিলেন ডাফরিনের সঙ্গে।

আজকাল গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে যা করছে দেশের লোক, তা শুনতে সকলের একটু ইচ্ছা হয় বই কি। খুব স্বাভাবিক। শেষ অবধি পেরে উঠবে না গভর্ণমেণ্ট। দেশের লোকেরই জয় হবে।

তিন মাস পূর্বে ঋষিকেশে জলপ্লাবনে প্রায় আড়াইশ' সাধু প্রাণত্যাগ করেন। ঝাড়িতে (বনে) থাকতেন কুটীর বেঁধে। কয়েক বছর ধরে বদরীনারায়ণের পথে একটা পাহাড়ের চূড়া ভেঙ্গে গিয়ে নদীর জল আটকে রাখে। গত অক্টোবরে হঠাৎ সেই জল পাহাড় ভাসিয়ে বেগে বার হয়ে যায়। তাতেই ঋষিকেশের ঐ দুর্ঘটনা হয়। অবশ্য সরকার পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। সাধুরা সে কথা গ্রাহ্য করেন নি। কেউ কেউ শহরে চলে গিছলেন। বেলুড় মঠের একজন সন্ন্যাসী, নাম সর্বেশ্বরানন্দজী, আর একজন ব্রহ্মচারী ভবানী চৈতন্য ওতে দেহত্যাগ করেন। ভবানী চৈতন্য এম-এ পাশ ছিলেন। আর সন্ন্যাসীও বেশ পণ্ডিত ছিলেন। আর একজন ব্রহ্মচারী ধীরেনও ছিলেন। তিনিও অতি সুপণ্ডিত, কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঈশান স্কলার'। তিনি সন্ধ্যায় বাড়ি ছেড়ে কৈলাস আশ্রমের দিকে আশ্রয় নেন তাই বেঁচে গেছেন। পরে শোনা যায়, মঠের সাধু দুইজন ঈশ্বর-ইচ্ছার উপর নির্ভর করে কুটীরে আসনে বসেই ভেসে যান স্বেচ্ছায়।

এই সব কথা হইতেছে।

শ্রীম—বড় বড় পাথর সব জলে ভাসিয়ে এনেছে। তাতে ধাক্কা খেয়েই নাকি মরেছে বেশীর ভাগ।

মাধবানন্দ—তিনি মারলে রাখে কে?

শ্রীম—হাঁ। ঠাকুর কোলা ব্যাঙের গল্প বলেছিলেন। রামের তীরের খোঁচায় কোলা ব্যাঙ মুমূর্ষু—চেঁচায় নি। রাম জিজ্ঞাসা করলে বলল, রাম, নিজে মারছেন এখন কার দোহাই দেব, তাই চেঁচাই না। সাপে ধরলে, 'রাম রক্ষা কর' বলে চীৎকার করি।

শ্রীম—আমরা যখন স্বর্গাশ্রমে ছিলাম সে সময়ও একবার জল বেড়েছিল। লোকক্ষয়ের কথা শুনি নি। আমরা পূর্বে খবর পেয়ে অনেক দূর চলে যাই। চার পাঁচ ক্রোশ। ফিরে যখন এলুম তখন দেখতে পাচ্ছি যেখানে ড্যাঙ্গা ছিল সেখানে দু' মানুষ জল। কে আর সাধুদের খবর নেয়! ঈশ্বর-ইচ্ছার উপর নির্ভর করে তাঁরা পড়ে আছেন।

স্বামী মাধবানন্দ—মিশনের তরফ থেকে কিছু কিছু কুটীর বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। (দুঃখিত হয়ে) আমাদের দেশের লোক এই ভাবেই সব যাবে। কে দেখছে? রাজার সেদিকে নজর নেই। এই রকম অবহেলার জন্যে ম্যালেরিয়া দুর্ভিক্ষ মহামারীতেই আমরা সব সাবাড় হবো।

শ্রীম—গান্ধী মহারাজের সঙ্গে দেশের লোক যোগদান করেছেও এই ভেবেই। এমনিও মরছে। না হয় লড়েই মরবো, এই ভেবে। সহ্যেরও সীমা আছে। স্বামীজী তাই কত দুঃখে বলেছিলেন, সরকারের অবহেলায় দেশের লোক driven to the neighbourhood of brutes (পশুপ্রায় হয়েছে)। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, শিক্ষা

নাই, ঘর বাড়ী নাই। মানুষ বলে ধারণাই যেন তাদের লোপ পেতে বসেছে! আবার দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী এ সব লেগেই আছে! কি দুর্দশা!

শ্রীম চুপ করিয়া আছেন। কি ভাবিতেছেন। এইবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—ঠাকুরের কি দৃষ্টি! কি বুঝবো আমরা? তাঁর ঘরের শিকেতে সন্দেশ পচে যাচ্ছে হাঁড়ির ভেতর। তবুও যাকে তাকে দেবেন না। ভক্তরা গেলে বের করে নিজহাতে দেবেন। অপর লোক হয়তো বলবে, কি কৃপণ! কেন দেন নি তিনিই জানেন। আমরা যতটা দেখেছি, মনে হয় তাতে, দুষ্ট লোককে খাওয়ালে তার দুষ্কর্মের ফল পেতে হয়, এই জন্যে হয়তো। বলেছিলেন, কসাইয়ের গো-হত্যার পাপ যার বাড়ীতে সে খেয়েছিল তাকে স্পর্শ করবে। এক শ্রাদ্ধ বাড়ীতে অপরের সঙ্গে বসে কসাই খেয়েছিলো। তারপর গিয়ে গো-হত্যা করে।

কালীবাড়ীতে কিছু বিশেষ পর্ব হলেই প্রসাদী থালা আসতো ঠাকুরের ঘরে। রোজই কিছু কিছু আসতো। ঐ দিনবিশেষে একবার থালা আনতে দেরী হওয়ায় চটর চটর করে খাজাঞ্চীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত। বললেন, ও ঘরের বরাদ্দ থালাটা যায় নি কেন? এত বেলা হলো? যোগেন স্বামী তখন ছেলেমানুষ। এই কথা শুনে ভাবলে 'আকরে টানছে।' মানে পূজারী বামুন। চালকলা বাঁধার অভ্যাস। এটা যায় নাই। কিন্তু তিনি তো অন্তর্যামী, বুঝতে পেরে বললেন, দেখ, এখানে ভক্তরা সব আসে। তারা খেলে রাসমণির ধনের সার্থকতা হবে। তাই গিয়ে নিয়ে এলাম।

তাঁর দৈবী দৃষ্টি। আমরা কি বুঝবো তার?

এই কর্ম সব, ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে না করলে তার জন্য ভুগতে হবে নিশ্চয়। তাঁ'তে ফল দিয়ে, নিজে benefit (লাভ) না নিয়ে করলে হয়। তাতেও যদি ভুল ত্রুটি হয়, তিনি এতে ধরেন না দোষ। তাইতো বলেছেন, 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো

ভয়াৎ।' ভক্ত এক পা এগুলে তিনি দশ পা এগিয়ে এসে তুলে নেন।

সাধুরা মিষ্টিমুখ করিয়া বিদায় লইলেন। শ্রীম অক্ষয়ের সহিত বীরেন বসুর মোটরে ১৭২ নং হ্যারিসন রোডের শিখ-সঙ্গতে গেলেন শ্রীগুরু গোবিন্দ সিং-এর জন্মোৎসব দেখিতে। রাত্রি প্রায় নয়টা।

২

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। সন্ধ্যা হইতে এখনও কিছু বাকী আছে। শ্রীম আপন কক্ষে অর্গলবদ্ধ হইয়া ধ্যান করিতেছিলেন। বাহিরে আসিয়া ছাদে বসা দেখিলেন, বেঞ্চিতে কয়েকজন ভক্ত। ডাক্তার, বিনয়, ছোট জিতেন, বিজয়, মনোরঞ্জন, গদাধর, বুদ্ধিরাম, শান্তি, জগবন্ধু প্রভৃতি একত্রিত হইয়াছেন। আর একজন সাধুও বসা। ইনি যশোহর হইতে আসিয়াছেন। তাঁহার নাম স্বামী তারানন্দ। শ্রীম যুক্ত করে সাধুকে নমস্কার করিয়া দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া হাতমুখ ধুইতে তিনতলায় নামিয়া গেলেন। নিচে যাইবার পূর্বে পুনরায় অন্তেবাসীর কুটীরে প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলামৃতখানা লইয়া আসিয়া শান্তির হাতে দিলেন। বলিলেন, তুমি ততক্ষণ এঁকে (সাধুকে) পড়ে শোনাও এইখানটা। শান্তি চৈতন্যের সন্ন্যাস পড়িতেছেন।

আজ ২রা জানুয়ারী, ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, ১৮ই পৌষ শুক্রবার। শুক্লা অষ্টমী ৩৮।২৯ পল।

সাড়ে পাঁচটার সময় শ্রীম উপরে আসিলেন। সাধুর সহিত দুই চারিটি কথা কহিয়া ডাক্তারের গাড়ীতে বিনয় ও ডাক্তারকে লইয়া শিখ-সঙ্গতে রওনা হইলেন মেছুয়াবাজার। ভক্তদেরও পরে আসিতে বলিলেন।

চিৎপুর রোডের কাছাকাছি। জগবন্ধু, ছোট জিতেন, গদাধর, বুদ্ধিরাম, মনোরঞ্জন, বিজয় প্রভৃতি হাঁটিয়া গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীম 'দরবারে'র সামনে দ্বিতলে বসিয়া আছেন বীরাসনে যুক্ত করে। ফুলের কি অপূর্ব সাজ! ঘরের ভিতর ফুলের ঘর। আর আলোর

বন্যা। বিদ্যুতের আলোতে ঘর ঝলসিয়া গিয়াছে। ঘরের ভিতর ঘৃতেরও একটি প্রদীপ আছে। দেয়ালে রামসীতা, চৈতন্যসংকীর্তন প্রভৃতি ছবি রহিয়াছে। কিছুকাল পর শ্রীম উঠিয়া গিয়া উত্তরের ঘরখানাতে প্রবেশ করিলেন। এখানে রহিয়াছেন রাধাকৃষ্ণ, শিব, শালগ্রাম প্রভৃতি। শ্রীম ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। একজন সাধু বসিয়া আছেন—পূজারী। তিনি উঠিয়া সভক্ত শ্রীমকে তুলসী ও কিসমিস প্রসাদ দিলেন।

শ্রীম নিচে নামিয়া আসিয়া সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার পশ্চাতেই অন্তেবাসী। তাঁহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া বলিতেছেন—আহা, ঠাকুর এমনি impetus (প্রেরণা) দিয়ে গিয়েছেন যে এমন সব জায়গায়ও তিনি আনছেন।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, কি impetus (প্রেরণা) ? অন্তেবাসী ও শ্রীম একসঙ্গে উত্তর করিলেন, সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়, এই শিক্ষা।

মোটরের নিকটে শ্রীম আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ড্রাইভারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এরা গিয়ে দর্শন করে আসুক। ড্রাইভার দর্শন করিতে গেল, আর ভক্তরাও বিদায় লইলেন। তাঁহারা পদব্রজে কটন স্ট্রীটের গুরুদ্বারায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীম পরে আসিলেন। সাদা পাগড়ী মাথায় একজন শিখ সাধু আরতি করিতেছেন গ্রন্থ সাহেবের—কর্পূরের আরতি। আরতি শেষ হইল। এইবার 'আরদাশ' (স্তুতি) করিতেছেন আর একজন সাধু। তাঁহার মাথায় কাল পাগড়ী, কাঁধে ঝুলান 'কৃপাণ'।

প্রথম ভগৌতী সিমরকে গুরু নানকলই ধ্যায় ফির,
অঙ্গদ্‌তে গুরু অমর দাস রামদাসে হোই সহায়ে ;
অর্জুন হরিগোবিন্দকো সিমরো শ্রীহরিরায়ে
শ্রীহরিকৃষ্ণ ধ্যায়ে জিস দিঠে সভ দুঃখ জায়ে,
গুরু তেগবাহাদুর সিমরীয়ে ধর নৌ নিধি অধিধায়ে
শ্রীগুরুগোবিন্দসিংজী মহারাজ ধর্মবীর সভ—থাঁই হোই সহায়ে।

শ্রীমকে একটি বৃদ্ধ শিখ ভক্ত সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, মহারাজকা দৌলতখানা কাঁহা? (কোথায় থাকেন।) দুইজনে কিছু কথা হইল। শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে সাধুদের ভিক্ষার ব্যবস্থা আছে কি? সাধু উত্তর করিলেন, হাঁ জী, মহারাজ সন্তোকা লিয়ে পরসাদকা এ্যারেঞ্জাম্ হ্যায়। লংগর খোলা হ্যায়।

শ্রীম দরবার সাহেবের (গুরুগ্রন্থসাহেবের) পশ্চাতে দেয়ালে বিলম্বিত অমৃতসরের 'হরমন্দিরের' (স্বর্ণমন্দির বা দরবার সাহেবের) ছবি দেখিতেছেন। বৃদ্ধ সন্তজীও উঠিয়া গেলেন। তিনি ঐ মন্দিরের ইতিহাস বলিতে লাগিলেন। গুরু রামদাস করিয়াছেন, ইনি চতুর্থ গুরু। মহারাজা রণজিৎ সিং স্বর্ণ দ্বারা শ্বেত পাথরের মন্দির মুড়িয়া দিয়াছেন। শিখদের 'অকালতকৎ' (পরব্রহ্মের গদী) ঐ স্থানে। ঐ স্থান হইতে যে হুকুম হইবে তাহা সকল শিখদের মানিতে হয়। সেখানে চব্বিশ ঘণ্টা পূজাপাঠ ও ভজন চলে।

শ্রীমর মাথার চাদরটা পড়িয়া গেল। বৃদ্ধ সাধু পুনরায় মাথায় তুলিয়া দিলেন। শিখদের গুরুদ্বারায় প্রবেশ করিলে মাথা ঢাকিয়া যাওয়া বিধি। মসজিদেও এইরূপ নিয়ম। সাধু শ্রীমকে বলিলেন, নয়া সাল, ইসলিয়ে মকান পোতাই হো রহাহৈ।

আর একজন শিখ ভক্ত আসিয়া শ্রীমকে অন্য একটি বড় ছবির নিকট লইয়া গেলেন। জাহাঙ্গীর ভারতীয় অনেক রাজাদের বন্দী করিয়াছে। ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ সিং তাঁহাদিগকে মুক্ত করিলেন।

এইবার 'কড়া (হালুয়া) পরসাদ' আর কয়েক টুকরা পেয়ারা সকলের হাতে দিলেন। শ্রীম ও ভক্তগণ নিচের তলায় নামিয়া গেলেন। দোরগোড়ায় শ্রীম বলিলেন, চব্বিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগে একবার এসেছিলাম এইখানে। অনেক বদলে গেছে। শ্রীম এই মন্দিরে আজ তিন স্থানে তিনবার ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন।

ভক্তগণ পদব্রজে আসিয়া পৌছিলেন রাজা রাম সিংএর বাড়ী ১৭২ নং হ্যারিসন রোড। এখানেও গুরুদ্বারায় উৎসব। আসিবার সময় শ্রীমকে ভক্তরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, উনিও ঐস্থানে যাইবেন

কিনা ? তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, হাঁ। কিন্তু ভক্তগণ রওনা হইলে মতের বদল হইল। শ্রীম ক্রস স্ট্রীট ৭৯ নম্বরে, বড় সঙ্গতে গেলেন।

রাজা রামসিং-এর বাড়ীর গুরুদ্বারায় ভক্তগণ নিচে বসিয়া গুরু-গ্রন্থ পাঠ শুনিতেছেন। গ্রন্থী সিংহাসনের উপর দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী বসিয়া পড়িতেছেন। গুরুমুখী ভাষা। ব্রহ্মজ্ঞানী ও সৎসঙ্গের মহিমা পাঠ চলিতেছে—মহল্লা পাঁচ। অর্থাৎ পঞ্চম গুরু অর্জুনদেবের 'সুখমনী' পাঠ হইতেছে। কি মধুর সুর। যেমনি ভাব তেমনি ভাষা। ইহাই শিখদের 'গীতা'—ভক্তগণ নিত্য পাঠ করেন।

পাঠ হইতেছে : সগল পুরখু মহি পুরখু প্রধানু।
সাধ সংগি জাকা মিঠে অভিমানু॥
* *
সাধকী মহিমা বরনৈ কউনু প্রাণী
নানক সাধ কী শোভা প্রভ মাহি সমানী॥
* *
সাধ কী মহিমা বেদ ন জানহি।…
নানক সাধ প্রভ ভেহুন ভাই॥

পাঠক হিন্দী তরজমা করিয়া বলিতেছেন : তিনিই পুরুষ-শ্রেষ্ঠ যাঁহার অভিমান সাধুসঙ্গ দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে।…সাধুর মহিমা বর্ণনার শক্তি কাহার আছে ? হে জীব, সাধু শোভাতে শ্রীভগবানের সমান। সাধুর মহিমা বেদও জানে না।… হে ভাই, সাধু ও ভগবানে কোন ভেদ নাই।

শ্রীম একটু পর আসিয়া গুরুমন্দিরের বরাবর দক্ষিণ দিকের স্তম্ভের পাশে বসিয়াছেন। নিবিষ্ট হইয়া শুনিতেছেন। শ্রীমর দক্ষিণ হস্তে ডাক্তার। পশ্চাতে ছোট নলিনী, বুদ্ধিরাম ও মনোরঞ্জন। বামদিকে গদাধর, বিনয়, ছোট জিতেন, বিজয় ও জগবন্ধু।

রাত্রি প্রায় আটটা। শ্রীম বিদায় লইতেছেন। প্রণাম করিয়া উঠিলে কর্মকর্তা একটি বৃদ্ধ শিখ ভক্ত আসিয়া করজোড়ে বলিতেছেন, "বিনতি হৈ, এতোয়ারকো দস্ ইগ্‌গার বাজে জরুর দর্শন দেনা।"

অখণ্ড পাঠ শীঘ্রই শেষ হইবে। বৃদ্ধ যুক্ত করে অভিবাদন করিলেন, 'সৎশ্রী অকাল।'

মর্টন স্কুল, কলিকাতা ১লা জানুয়ারী, ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ
১৭ই পৌষ, ১৩৩০ সাল, বৃহস্পতিবার, শুক্লা সপ্তমী ৩১।১০ পল

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

গুরু নানক ও অর্জুনদেব

মর্টন স্কুল। চারতলার কক্ষ। শ্রীম মাথায় কম্ফোর্টার, গায়ে সুয়েটার পরিয়া আলোয়ানে শরীর ঢাকিয়া বিছানার উপর বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য। ধ্যান করিতেছেন। একটু পর আটটা বাজিল। দশটায় স্কুল বসিবে। বড়দিনের ছুটির পর গতকল্য স্কুল খুলিয়াছে। একটি ভক্ত শিক্ষক গৃহে প্রবেশ করিলেন। কথা হইতেছে।

শ্রীম (শিক্ষকের প্রতি)—আচ্ছা, আপনি বক্তৃতা দেন না কেন, সৎপ্রসঙ্গ সভায়? ভাবছি, গোপেন বাবু আর আপনাকে এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী করা হবে; এ্যালাউন্স পাওয়া যাবে। গীতাও আপনারা পড়বেন।

শিক্ষক (বিনীতভাবে)—বক্তৃতা দিতে আমার লজ্জা হয়। নিজে পালন করছি না। আবার অপরকে বলা।

শ্রীম—কেন, সে তো এই বললেই হয়—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন। নিজের নাম নাই বা বলা হলো। আর, আমাদের এই করা উচিত, তাঁরা সব বলেছেন। তা হলে নিজেকেও বলা হলো, উপদেশ হলো না। এটা একটা art of teaching (শিক্ষা-দানের কৌশল)।

গৃহে গোপেনের প্রবেশ।

শ্রীম (গোপেনের প্রতি)—হাঁ গোপেনবাবু, তোমাদের দু'জনকে সৎপ্রসঙ্গ সভায় বক্তৃতা দিতে হবে। (শিক্ষককে দেখাইয়া) এঁকে বললাম—প্রস্তুত হও। গীতা ভাগবত পাঠ—এ সবও তোমরা করবে। ভক্ত লোক পড়লে ভগবানের আবির্ভাব হয়।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—দু'ভাবে বলা যায় ঈশ্বরীয় কথা—গুরুভাবে আর সেবকভাবে। যাঁরা প্রত্যাদিষ্ট হয়ে কাজ করেন তাঁরা গুরুভাবে উপদেশ দিতে পারেন। অপরদের সেবকভাবে করা উচিত। স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের সেবা। এ সব কথা কারণ-শরীরের আহার। আমাদের মঠের এই তিন রকমের সেবাই রয়েছে। হাসপাতাল ডিসপেনসারী রিলিফ, এ সব স্থূল-শরীরের সেবা। স্কুল কলেজ, এ সব সূক্ষ্ম-শরীরের সেবা। আবার কারণ-শরীরের সেবা, প্রচার। তাঁর নাম, তাঁর ভাব অপরকে বলা সেবকভাবে, গুরু-ভাবে নয়। ভগবান এইসব রূপে রয়েছেন। তাঁরই বাণী তাঁকে শোনাচ্ছি, আমি যন্ত্র মাত্র—এ ভাব আরোপ করলে দোষ হয় না। নিজেকেও include (অন্তর্ভুক্ত) করা হয়ে গেল। তখন তাঁর নাম-গুণ কীর্তন হয়ে গেল। দীন ভাব তখন আসে।

গোপেন শ্রীমর দৌহিত্র। গৃহে ছোট জিতেন, গদাধর, বুদ্ধিরাম ও ছোট নলিনী রহিয়াছেন। সৎপ্রসঙ্গ সভা, মর্টন ইনস্টিটিউশানের ধর্মসভা, প্রতি রবিবার হয় সকালে। শিক্ষক ও ছাত্রগণ উপস্থিত থাকেন। গীতা ও ভাগবত পাঠ হয়। আর কোন নির্ধারিত বিষয়ে বক্তৃতা হয় ছেলেদের ও শিক্ষকদের। এই সভা হইতে বহু ছাত্র ও শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণের কথা জানিতে পারিয়াছেন। অনেকে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন। গোঁড়ামী নাই, শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়বাণীর উপর উহার ভিত্তি। ক্রাইস্ট, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষ-গণের জীবন ও শিক্ষার আলোচনা হয় অসাম্প্রদায়িক ভাবে।

অপরাহ্ণ দুইটা বাজিয়াছে। স্কুলের ছুটি হইয়া গিয়াছে। দোতলার সিঁড়ির পাশে বসিবার ঘর। শ্রীম সকল শিক্ষকগণের

সহিত একত্রিত হইয়াছেন। Method of Teaching (শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে) আলোচনা হইতেছে। শ্রীম রেকটার এবং আজের Teachers' Conferenceএর শিক্ষক-সভার চেয়ারম্যান। ইনি পশ্চিমের দেওয়ালে পিছন দিয়া চেয়ারে বসা। ওয়ার ফ্লানেলের পাঞ্জাবী গায়ে। কাঁধের উপর ভাঁজ করা সাদা পশমী চাদর। শিক্ষকগণ সকলে বেঞ্চিতে বসা। শ্রীমর সামনে পূর্ব সারিতে শচীন্দ্র, দেবেন্দ্র, কাঙ্গালী, হরেন, মণি, জগত্তারণ ও ছোট হরিপদ বসিয়াছেন। উত্তরমুখী তিন সারি বেঞ্চ শ্রীমর ডান হাতে। তাহার প্রথম সারিতে বসিয়াছেন বড় হরিপদ, কেশব ও জগবন্ধু। তাঁহার পিছনের সারিতে বিমল ও গোপেন। সকলের পিছনে জ্ঞান, গৌরী ও পূর্ণ।

শ্রীম তাঁহার স্কুলে কিছুদিন হইতে বাংলায় সব বিষয় পড়াইবার প্রথার প্রবর্তন করিয়াছেন। সুচিন্তিত ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ কতকগুলি শিক্ষার উচ্চ ভাব সারকুলার বইয়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাই হেড মাস্টার বড় হরিপদ পড়িয়া শুনাইতেছেন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য দুইটি। প্রথম—চরিত্র সংগঠন, আর দ্বিতীয়—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ। ইংরাজী পড়াইবার আগে বাংলায় গল্প বা কবিতার ভাবটা বলিয়া দিতে হয়। আর মাঝে মাঝে দুই একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়। ইতিহাস পড়াইবার সময় ম্যাপ দেখাইতে হয়, ভূগোলে তো দেখাইতেই হইবে। সাহিত্যেও তাহাই দেখাইতে হয়। ইহাতে ছেলের মনে থাকিবে বেশী, অথচ চাপ পড়িবে না। 'History is Philosophy taught by example' (শ্রেষ্ঠ পুরুষের জীবনীর মাধ্যমে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষার নামই ইতিহাস।) হিস্ট্রির moral (উপদেশ) বলিয়া দিতে হয়। Poetry (কবিতা) মুখস্থ করাইতে হয়। টনি সাহেব আশ্চর্যান্বিত হইয়া যাইতেন, আর বলিতেন, এ কি রকম poetry (কবিতা) পড়া হচ্ছে ?—কিন্তু মুখস্থ করা হয় না। ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত সব poetry (কবিতা) মুখস্থ করানো চাই।

দুইটি আছে—একটি শব্দার্থ, আর একটি মর্মার্থ—language

and thought—আমরা thought (মর্মার্থ) দিতে চেষ্টা করিতেছি। ইহার জন্য যতটা languageএর (ভাষার) দরকার তাহা শিখান।

জাপানে সব vernacularএ (মাতৃভাষায়) শিখান হয়। ইহাতে thought clear (ভাবধারা বিশুদ্ধ) হয়। এমন কি সায়েন্স এবং ফিলজফি পর্যন্ত জাপানে মাতৃভাষায় পড়ান হয়। ইংরেজী ওখানে optional (স্বেচ্ছামূলক)।

তুইটা বাজিয়া চল্লিশ মিনিটে সভাভঙ্গ হইল।

এখন বেলা তিনটা। ছাদে ভক্তগণ সমবেত হইয়াছেন। জগবন্ধু দক্ষিণ দিকের বেঞ্চির উপর লম্বমান হইয়া বিশ্রাম করিতেছেন। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে গদাধর বসিয়া কিছু পড়িতেছেন। বুদ্ধিরাম পাশের টিনের ঘরে বসিয়া জপ করিতেছেন। আর বিনয় একটা গদী বাঁধিতেছেন। শ্রীম স্বীয় কক্ষে বিশ্রাম করিতেছেন। সুখেন্দু এইমাত্র আসিলেন।

চারিটার সময় শ্রীম ছাদে আসিলেন, হাতে বিদ্যাপীঠের rules and regulations-এর (নিয়মাবলীর) খসড়া। বিদ্যাপীঠের প্রারম্ভ হইতে শ্রীমর স্নেহদৃষ্টি উহার উপর রহিয়াছে। আরম্ভের সময় তিনি মিহিজামে গিয়া সাত আট মাস বাস করেন। উহার যাবতীয় কার্য শ্রীমর সহিত পরামর্শ করিয়া হয়। নিয়মাবলীর খসড়া শ্রীম দেখিয়া কথঞ্চিৎ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া দিয়াছেন। শ্রীমর হাতে এই খসড়া।

শ্রীম (গদাধরের প্রতি)—জগবন্ধু ঘুম থেকে উঠলে বলবে, এইটে বিদ্যাপীঠে পাঠাতে হবে। আগে উঠলে পরে বলবে। .কি বললাম বল দিকিন?

গদাধর—ঘুম থেকে যখন উঠবেন তখন বলবো এইটে বিদ্যাপীঠে পাঠাতে—দেওঘর।

শ্রীম—হাঁ, এটা পাঠাতে বলবার জন্য ঘুম থেকে ওঠাবে না, বুঝলে? (জনান্তিকে সহাস্যে) আর যদি উনি শুনে থাকেন—(শ্রীম ও ভক্তগণের উচ্চহাস্য)। জগবন্ধুও সেই হাস্যরোলে যোগদান করিলেন।

জগবন্ধু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। তিনি সব শুনিতেছিলেন, উঠিয়া ঠিকানা লিখিয়া দিলেন। সুখেন্দু ডাকে ফেলিতে গেলেন।

এখন অপরাহ্ণ পাঁচটা। ভাটপাড়ার ললিত, ভোলানাথ, বসন্ত প্রভৃতি শনিবারের ভক্তগণ আসিয়াছেন। ছাদে দক্ষিণ-পূর্ব ধারে আর্চের পাশে বসিয়া আছেন। শ্রীম ঘর হইতে আসিয়া চেয়ারে বসিলেন। পরস্পর নমস্কারাদি হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে বিজয়, ছোট নলিনী, ছোট জিতেন প্রভৃতি আসিয়া জুটিলেন। জগবন্ধু, সুখেন্দু, বিনয়, গদাধর, বুদ্ধিরাম পূর্ব হইতেই বসিয়া আছেন। জিজ্ঞাসায় ছোট জিতেনের বাড়ীর অসুখ বিসুখের সংবাদ জানিয়া তাঁহাকে রানাঘাটের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। ইনি কলিকাতায় থাকেন ও ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের কেশিয়ার্। এইবার শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ললিত প্রভৃতির প্রতি)—আমরা কাল শিখদের ওখানে গিছলাম। চার জায়গায়—মেছুয়াবাজার, কটন স্ট্রীট, ক্রস স্ট্রীট আর হ্যারিসন রোডে। গুরুগোবিন্দ সিংএর জন্মোৎসব। আহা, কি সুন্দর করে সব সাজিয়েছে! ফুলের সাজ একখানে। কত ভক্তি শ্রদ্ধা! গুরুদ্বারই বটে! গুরু মানে ভগবান। গুরুর উপর ভক্তি এলে বুঝতে হবে ভগবানের উপর ভক্তি এলো। গুরু আর ইষ্ট অভেদ। শিখদের গুরুগণের উপর অতিশয় শ্রদ্ধা। হিন্দুমাত্রেরই শ্রদ্ধা আছে। গুরুগণ এ সময় না এলে, পাঞ্জাবে হিন্দুধর্মের নামগন্ধ থাকতো না। সব মুসলমান হয়ে যেতো। জোর করে সব convert (মুসলমানধর্মে দীক্ষিত) করতো কি না। প্রতিবাদ করায় গুরু অর্জুনদেবকে জাহাঙ্গীর মেরেই ফেললেন। জাহাঙ্গীর বলেছিলেন, হয় তাকে মুসলমান পীর করতে হবে নচেৎ শেষ করতে হবে। তাঁর সাংসারিক বুদ্ধি, নিষ্কাম কর্ম, গভীর ত্যাগ, ঈশ্বরে অটুট বিশ্বাস, মহান হৃদয়, দেশপ্রীতি ও ধর্মবিশ্বাস, আর উজ্জ্বল জ্ঞান ও যোগশক্তি দেখে হিন্দুগণ তাঁর আশ্রয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছিলেন। রাজরাজড়া

পর্যন্ত তাঁর সহায়তা ও পরামর্শ নিতেন। ইনিই প্রথম সঙ্ঘবদ্ধের চেষ্টা করেন শিখদের। গুরুগ্রন্থসাহেব তাঁহার রচনা ও অমর কীর্তি। আহা, কি সব কথা শোনা গেল কাল! প্রাণ শীতল হয়ে যায়। যেমন গাম্ভীর্য তেমনি প্রেম। গুরুমুখী ভাষার অক্ষর ছিল না। ইনি তার আবিষ্কার করলেন। বড়ই নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে রাজ-আজ্ঞায় হত্যা করা হয় লাহোরে। একটা ডেকচির ভিতর বসিয়ে নিচে আগুন জ্বেলে দেয়। আর মাথার উপর তপ্ত বালি ঢেলে দেয়। অত অত্যাচারেও জ্ঞান ও ভগবানে বিশ্বাস অটুট ছিল। অমৃতসর, তরণ-তারণে তাঁর অমর কীর্তিগাথার ঘরে ঘরে কীর্তন হয়।

'সুখমনী' পাঠ কাল শুনলাম। কি মধুর ভাষা ও ভাব। গুরু অর্জুনদেবের রচিত। গীতার মত এর পাঠও সুর করে কীর্তন রোজ ঘরে ঘরে হয়। উনি গানেরও একজন বড় authority (অধিকারী) ছিলেন মনে হয়। কারণ গুরুগ্রন্থসাহেবের বাণী সব গাওয়া হয় উচ্চ classical (উত্তম পৌরাণিক) রাগে। সাধুসঙ্গের কি মহিমাই কীর্তন করেছেন সুখমনীতে। আর নাম-মাহাত্ম্য। মানে, রূপের মাহাত্ম্য। সমস্ত গুরুগ্রন্থসাহেবই সাধুসঙ্গ ও সেবার কথায় পরিপূর্ণ। তাই পাঞ্জাবে অত সাধুভক্তি ও সাধুসেবা।

গুরু নানক অবশ্য এর প্রধান প্রবর্তক। গুরু নানককে ঈশ্বরের অবতার বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন। ইনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। বছর ষোল বড় ছিলেন। (সহাস্যে) ঠাকুর কখনো বলতেন—শিখরা বলে, তুমি গুরু নানক। ওরা সব আসতো কিনা, দমদমার শিখ-সৈন্য ভক্তগণ। তাঁদের জন্য মার কাছে ঠাকুর কেঁদে প্রার্থনা করেছিলেন, 'মা এদের কল্যাণ করো।' দু'চার ঘণ্টার ছুটি পেলেই ছুটে আসতো। তাই মাকে বলেছেন, 'মা এদের কল্যাণ করতেই হবে। দেখ, এরা তোমার কাছে ছুটে ছুটে চলে আসে। এতো ব্যাকুল!'

ঈশ্বরের শক্তি যেখানে ঠিক ঠিক প্রকাশ, সেখানেই ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা। ধর্মের বাহ্য আচরণ চিরকাল আছে ও থাকবে। কিন্তু

অবতার এলে ব্যাকুলতা বাড়ে। এটি নূতন জিনিস। আবার ধীরে ধীরে চলে যায়।

আমি একবার শিখদের পাড়ায় গিয়ে পড়েছিলাম কুরুক্ষেত্রে। এক বাড়ীতে অতিথি হলাম। আহারাদি সব হল। ওরা বড়ই অতিথি-সেবাপরায়ণ। এটিও গুরুদের অন্যতম শিক্ষা। কুরুক্ষেত্র পাঞ্জাবে কি না।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন—পুনরায় ক্ষীণস্বরে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভোলানাথের প্রতি)—আপনার তীর্থে ঘোরার ইচ্ছা হয়? ঠাকুর বেশী বলতেন না তীর্থের কথা। বলেছিলেন, কাশী আর বৃন্দাবন, এ হলেই যথেষ্ট। একটি জ্ঞানের, অপরটি ভক্তির স্থান। যাদের খুব তীর্থপ্রীতি ছিল তাদের বলেছিলেন এ কথা। বলেছিলেন, বল দিকিন, এটা আমার কেমন হলো? ভক্তরা তীর্থে যেতে চাইলে আমি মত দিই না। তারা ইচ্ছা করে তাদের মতে মত দি। ভক্তরা কি করে বুঝবে তাঁকে। তিনি নিজেকে নিজেই জানতেন। জানতেন, 'কি করবে তীর্থে গিয়ে আমাকে ছেড়ে।' বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাই বলেছিলেন প্রশ্ন করায়, কোথাও দেখলাম এক আনা, কোথাও দুই আনা। এখানে (ঠাকুরের কাছে) ষোল আনা (ঈশ্বরীয় প্রকাশ)।'

তীর্থেও তাঁরই প্রকাশ।

তিনিই যখন কোন স্থানকে অবলম্বন করে প্রকট হন তাকেই তীর্থ বলে। আর মানুষ-শরীর ধারণ করলে বলে অবতার। তীর্থও বরাবর আছে। যদি অবতারকে পায়, তবে কেন যায় ঘুরে মরতে তীর্থে? তাঁকে পাওয়া তাঁকে চেনা, বড় কষ্ট। কাছে থাকলেও বোঝা যাবার যো নাই। তাঁর মায়ার আবরণে তিনি ঢাকা। যদি কৃপা করে একটু আধটু বুঝিয়ে দেন. তবেই ধরতে পারে। ধরা না দিলে ধরা যায় না।

(দৃষ্টি অতীতে নিবদ্ধ করিয়া) কই, তিনি থাকতে কে তেমন তীর্থে গেছে?

ললিত—স্বামীজী বুদ্ধগয়ায় গিছলেন।

শ্রীম—হাঁ, সে পাঁচ ছয়দিনের জন্য।

ললিত—রাখাল মহারাজ মাঝে মাঝে বৃন্দাবনে—

শ্রীম—হাঁ, একবার। যখন দেখলেন থাকবে না, তখন পাঠিয়ে দিলেন। মাকে বলেছিলেন, 'ডুবাস্ নে যেন মা।' হাঁ, সুরেশবাবু কুম্ভে গিছলেন প্রয়াগে, সঙ্গে ছিল আর. মিত্র। বলরামবাবু বৃন্দাবনে গিছলেন।

শীতকাল। বাহিরে হিম পড়িতেছে সন্ধ্যা হইয়াছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—চলুন, ঘরে গিয়ে বসি।

ভক্তগণ উঠিয়া সিঁড়ির ঘরে গেলেন। সকলে ধ্যান করিতেছেন। একজন ভক্ত পাশের টিনের ঘরে বসিয়া ভাবিতেছেন ৺কাশীর বিশ্বনাথের সন্ধ্যারতির কথা। পুনরায় কথা হইতেছে। বড় জিতেন, ডাক্তার প্রভৃতি আসিয়াছেন। ললিত প্রভৃতি বিদায় লইলেন।

শ্রীম বসিয়াছেন জোড়া বেঞ্চে সতরঞ্চির উপর, দক্ষিণাস্য। তাঁহার পাশে পূর্বদিকের বেঞ্চিতে বসা বড় জিতেন, রমণী ও গদাধর। সামনা-সামনি অন্য সারিতে বসিয়াছেন উত্তরাস্য—সুখেন্দু, 'ক্রকবণ্ড' (যতীন) বলাই, মনোরঞ্জন, ডাক্তার, বিনয়, বুদ্ধিরাম, জগবন্ধু প্রভৃতি। ডাক্তার শ্রীমর হাতে একখানা 'সুখমনী সাহেব' আনিয়া দিলেন—গুরুমুখীর বাংলা তরজমাসহ। শ্রীম পুস্তকখানি হাতে করিয়া মাথায় ঠেকাইলেন। এইবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুর আমাদের নানান খানে নিয়ে যাচ্ছেন কেন? দেখাতে, তিনিই সব হয়ে আছেন। শিখদের যে উৎসব তা-ও তিনিই। উৎসবানন্দও তিনি, যাঁর জন্য হচ্ছে (গুরু গোবিন্দ সিং) তিনিও তিনি। আর যাঁরা করছেন তাঁরাও তিনি। ঠাকুর বলেছিলেন কিনা, 'আমি দেখছি মা-ই সব হয়ে রয়েছেন।' আবার কখনও বলতেন, 'এ খোলটার ভিতর মা এসে গেছেন।' অর্থাৎ ঠাকুর ব্রহ্মশক্তির অবতার।

আমাদের চোখে এই চশমাটি পরিয়ে দিয়েছেন। তাই সব লাল দেখা যাচ্ছে, সব আপনার বলে মনে হচ্ছে। কাল গুরুদ্বারায় গিয়ে

মনে হলো যেন অমৃতসরে গিয়েছি। অমৃতসরে দরবার সাহেবে দিনে রাতে উৎসবানন্দ। কি জ্ঞান ও ভক্তি দিয়ে সব মাতিয়ে রেখেছেন। দিনরাত পূজা পাঠ, আরতি ভজন, আবার প্রসাদ বিতরণ, কড়া প্রসাদ। পঞ্চভূতে জীব আবদ্ধ হয়। আবার তা দিয়েই মুক্তও হয়। তাঁর দিকে মোড় ফিরিয়ে দিলেই হলো। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ—এ সবগুলি দিয়ে তাঁর পূজা। কি রকম সব ফুলের সাজ দেখা গেল গুরুদ্বারায়। মানুষ যা ভালবাসে তাই তাঁকে দেওয়া। তাঁকে দিয়ে ভোগ করলে প্রসাদরূপে ক্রমে মুক্তি হবে। নিজে ভোগ করলে বন্ধন বাড়বেই খালি।

শ্রীম 'সুখমনী' খুলিয়া মাঝে মাঝে পড়িতেছেন। এইবার অষ্টম সর্গ। ব্রহ্মজ্ঞানীর লক্ষণ।

শ্রীম— ব্রহম গিআনী সদা নিরলেপ ॥
জৈসে জল মহি কমল অলেপ ॥
ব্রহম গিআনী সদা নিরদেখি ॥
জৈসে সুরু সরব কউ সোখ ॥
ব্রহম গিআনী কৈ দৃসটি সমানি ॥
জৈসে রাজ রংক কউ লাগৈ তুলি পবান ॥
ব্রহম গিআনী কৈ ধীরজু এক ॥
জিউ বসুধা কোউ খোদৈ কোউ চন্দন লেপ ॥
ব্রহম গিআনী কাইহৈ গুনাউ ॥
নানক জিউ পাবক কা সহজ সুভাউ ॥

বাংলা পড়িলেন—ব্রহ্মজ্ঞানী সদা নির্লেপ, যেমন পদ্মপত্রস্থ জল। সূর্য যেমন ভালমন্দ সকলকেই উত্তাপ দেয় কিন্তু নিজে সদা পবিত্র—ব্রহ্মজ্ঞানী তেমনি নির্দোষ। পবন যেরূপে রাজা ও ক্রীতদাস উভয়কে সমানভাবে স্পর্শ করে, ব্রহ্মজ্ঞানীর দৃষ্টি তেমনি সকলের উপর সমান। ধরিত্রীকে খুদ কিম্বা চন্দন দিয়ে পূজা কর—তার ধৈর্যের সীমা কখনো লঙ্ঘন করতে পারে না, তেমনি ধীর ব্রহ্মজ্ঞানী। অগ্নির ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানী সর্বপাবক।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—এই যা পড়া হলো সব ঠাকুরে দেখেছি। অন্তরঙ্গদের উপর যে দৃষ্টি, 'রস্‌কে' (রসিক) মেথরের উপরও সেই দৃষ্টি। রতির মা বেশ্যাকেও মায়ের রূপে দেখে প্রণাম করতেন। রাজমিস্ত্রির কাজে যোগান দিত একটি কাল পশ্চিমা মেয়ে। তাকে মায়ের রূপে দেখে নমস্কার করলেন। গিরিশবাবুর সব পাপ নিয়ে শুদ্ধ করে দিলেন।

তাঁর কাছে এলে গেলেই হয়ে যেতো। জলে নাইলে যেমন শরীরের ময়লা যায়—তেমনি, ইঙ্গিতে বলতেন, এখানে এলে-গেলেই মনের ময়লা দূর হবে। জপ তপ করতে বলতেন, কিন্তু তত জোর দিতেন না। কিন্তু আনাগোনা করতে খুব জোরে বলতেন।

(সহাস্যে) পূর্ব-দক্ষিণ বারান্দায় একদিন হাজরা মালা জপ করছিল। ঠাকুর ভাবাবস্থায় হাত থেকে মালা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। বললেন, 'এখানে এসেও মালা জপা?' মানে এখানে একেবারে উদ্দীপন হয়ে যাবে। সাক্ষাৎ দর্শন হচ্ছে তাঁর। ঈশ্বরদর্শনের জন্য জপ টপ সব। নিজে তিনি উপস্থিত সশরীরে। তবে এ সবের দরকার কি এখন, এই ভাব।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—বেদে আছে, ব্রহ্মকে অনুভূতি করা যায়। ঠাকুর বলতেন, শুধু অনুভূতি নয়। সাক্ষাতে রূপ ধরে আসেন, কথা কন। আবার সেই কথা সকলকে বলছেন ঠাকুর। এক ঘর লোক বসা, সবই প্রায় sceptic (নাস্তিক)। বিজয় গোস্বামীও আছেন। ঠাকুর বলছেন মাইরি বলছি,—'মা এসেছেন।' আবার মাকে বললেন, 'মা, তুমি যে লাল পেড়ে শাড়ী পরে এসেছো, আবার চাবি কাঁধের উপর ঝুলিয়েছ।'

দর্শন, স্পর্শন, কথন। শুধু দর্শন নয়।

ব্রাহ্ম সমাজের এরা বলতো, এ সব মনের ভ্রম—hallucination. তা শুনে ঠাকুর বললেন, 'তা কেমন করে হয়? মা যা বলেন তা যে সব মিলে যাচ্ছে।' ভক্তদের যা সব ঠাকুর বলতেন, তাই হতো। তা'তেই বললেন এই কথা। মনের ভ্রম হলে তা আবার সত্য হয়

কি করে? একদিন তো নয় বরাবর যা বলেছেন সবই মিলে গেছে। একটিও অমিল হয় নাই আজ পর্যন্ত। তা হবে কি করে? বলতেন যে, আমার মুখ দিয়ে মা কথা কন। তা হলে কি করে ভুল হবে? ভগবানের কথা কি ভুল হতে পারে?

শ্রীম (একটি বালক ভক্তের প্রতি)—দেখলে, তিনি কত জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন। ব্রহ্মজ্ঞানী, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ আবার নানকপন্থী সকলের কাছে পাঠাচ্ছেন। আর হিন্দুদের নানান থানে তো পাঠাচ্ছেনই। এই সব দেখে শেষে এক জায়গায় বসে তাঁর নাম করা। খালি কি উপরের ফল খেলে হয়? নিচের ফলও খেতে হয়। সর্বদা চোখ বুঁজে থাকলে কি হবে। সবই দেখতে হয়।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—একটি পাখী অন্যমনস্ক হয়ে একটা জাহাজের মাস্তুলের উপর বসে ছিল। জাহাজ সাগরে চলে গেছে। তখন তার চৈতন্য হলো। আর পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কোথাও ড্যাঙ্গা পেল না—যেখানে ফলফুল হয়। শেষে ক্লান্ত হয়ে ঐ মাস্তুলেই বসে রইল। তেমনি সব দেখা। দেখতে দেখতে ডানা ব্যথা হলে তখন এক জায়গায় বসে তাঁর নাম করা।

দাঁড়াচ্ছে এই, সবই আদ্যাশক্তি থেকে হয়েছে। আদ্যাশক্তিই এই সব দেখাচ্ছেন। অর্থাৎ জগৎ মনে। আদ্যাশক্তি অন্তরে, আবার বাহিরে। তিনিই বুদ্ধিকে চালনা করেন অন্তরে থেকে। তবেই মানুষ করতে পারে। যে এটা জেনে করে তাকেই জ্ঞানী বলে।

এক মত আছে, এই সবই মনে ছিল। বৌদ্ধদের বিজ্ঞানবাদও এইরূপ। নাগার্জুন শূন্যবাদ প্রচার করেছিলেন ফার্স্ট সেনচুরিতে। ওটার ভিত্তি ছিল বুদ্ধদেবের একটি বাণী—'সর্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং শূন্যং শূন্যং'; এটা বেদান্তের 'জগৎ মিথ্যা'র অনুরূপ। এরূপ প্রচারের কারণও ছিল। বুদ্ধদেবের প্রায় পাঁচশ' বছর পর বৌদ্ধ ধর্মে বেশ মলিনতা ঢুকেছিল। এটার কারণ হয়তো অশোকের Aggressive Buddhism (উৎকট গোঁড়ামিপূর্ণ ধর্মপ্রচার)। তখন

একটা reaction (প্রতিক্রিয়া) এসেছিল। তখন এলেন নাগার্জুন। তিনি এটাকে ঝেড়ে ঝুড়ে উঠিয়ে দিলেন ওপরে। জগৎ 'শূন্যং শূন্যং' প্রচার করলেন। দু'শো বছর ঐ মতটা জোরে চললো। কিন্তু অত উঁচুতে মন রাখতে পারলে না ভক্তরা। তাই থার্ড সেন্চুরিতে এলেন, অসঙ্গ আর বসুবন্ধু। এঁরা এসে বললেন, জগৎ মনে। মনেরই সৃষ্টি এটা। অনেকদিন এই মত চলেছিল। হিউয়েন সাং এই মতের লোক। খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন। যেমনি পণ্ডিত তেমনি উঁচু সাধু ছিলেন তিনি। মহাপুরুষ লোক।

ইদানিং কালের 'বারক্লে'র আইডিয়ালিজমও (Berkeley's Idealism) বিজ্ঞানবাদের সমর্থক।

কিন্তু ঠাকুরের ব্যাপার আলাদা। তিনি যখন এইসব জগৎ-লীলা দেখতেন, তখন 'মা, মা' বলে একেবারে সমাধিস্থ হয়ে যেতেন। দেখতেন কি না, মা-ই সব হয়ে রয়েছেন। মা-ই সব চালাচ্ছেন জীবের বুদ্ধিটাকে ধরে। সমাধি মানে কি? না, এই সবই তাঁর থেকেই হয়েছে, এইটে দেখা।

শ্রীম ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—গুরু নানক একজন shop-boy (দোকানের কর্মচারী) ছিলেন। তাঁর ভগ্নীপতির দোকানে কাজ করতেন। খুব অল্প বয়স। মুদীর দোকান। একদিন কয়েক জন সাধু যাচ্ছেন। তাঁদের ডেকে এনে আটা অমনি দিয়ে দিলেন। ভগ্নীপতি জানতে পেরে তাড়না করলেন। বললেন, অমনি করলে দোকান চলবে কি করে? তিনি উত্তর করলেন, কেন এতেই তো লাভ বেশী। লাভের জন্যই তো দোকান। সাধুদের দেওয়া মানে, ভগবানকে দেওয়া। কারণ ভগবানেরই রূপ সাধু। ভগবানকে দিলে তার লাভ অনন্তকাল ভোগ হয়, অমৃতত্ব লাভ। বাপ মা, আত্মীয়গণ অত চেষ্টা করেও সংসারে মন নামাতে পারলো না। তখন সকলে বলতে লাগলো, নানক পাগল হয়েছে। চৈতন্য যেই হলো অমনি নানক প্রব্রজ্যায় বের হয়ে গেলেন। অনেক দেশ ঘুরেছিলেন

—মক্কা পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তারপর ঐ, কাল আমরা যা দেখে এলাম। মালা জপ করছেন, দুই দিকে দু'জন অন্তরঙ্গ বসা। এক জনের নাম মর্দানা। তিনি ছিলেন মুসলমান। আর একজন বালা। মালা জপা কেন? লোকশিক্ষার জন্য। মহাপুরুষদের কাজ বোঝা যায় না। লোকে মনে করে একরকম, কিন্তু তার অর্থ ভিন্ন।

(একটু চিন্তার পর) ঠাকুরকে দেখেছিলাম, মালা হাতে নিয়েছেন। দুই একটি ঘোরাতেই অমনি বেহুঁশ, সমাধিস্থ। তখনকার জপ কে করে! হাতের মালা পড়ে গেল। ত্যাগের চরম অবস্থা এইটি। জগৎ একেবারে গলে গেছে। ব্রহ্মে মন লীন।

শ্রীম মত্ত হইয়া গান গাহিতেছেন।

গান। আমরা অতি শিশু মতি—ইত্যাদি।

গান। তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে।
আর কেহ নাহি যে, বিপদ ভয় বারে,
এ আঁধারে যে তারে॥
এক তুমি অভয় পদ জগৎ সংসারে,
কেমনে বল দীনজন ছাড়ে তোমারে।
করিয়ে দুঃখ অন্ত সুবসন্ত হৃদে জাগে,
যখন মন-আঁখি তব জ্যোতিঃ নেহারে॥
জীবন সখা তুমি, বাঁচি না তোমা বিনা,
তৃষিত মনপ্রাণ মম ডাকে তোমারে॥

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—'মন-আঁখি তব জ্যোতি নেহারে'—এইটি সমাধি। তখন আর বাহ্য জ্ঞান থাকে না। জগৎ ছেড়ে অনন্তে মন লীন। এইটি একমাত্র কাম্য—'Summum Bonum' (পরম মঙ্গল)। অহরহ ঠাকুরের এ অবস্থা হতো।

উঃ, মানুষের কি শক্তি দিয়েছেন দেখুন! অত দুর্বল মানুষ। কিন্তু এই যে অনন্তের veil (আবরণ) তাও penetrate (ভেদ) করতে পারে। অত শোক দুঃখ অভাব কষ্ট—তার ভেতর থেকেও

ঐ mystery penetrate (রহস্য ভেদ) করতে পারে। তাই শাস্ত্রে বলে, দেবতারাও মানুষ হয়ে আসেন এইটে বুঝবার জন্য।

কাম ক্রোধ দমন করা, শোক তাপে অবিচলিত হওয়া, তিনি কৃপা করলে হয়। তা নইলে হয় না। 'ঘরে জ্বালিয়ে জ্ঞানের দীপ ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখ না।'

অবতারগণ আসেন এইটে দেখাতে, অভয় দিতে। মহাপুরুষগণ কিছুর বশ নন। বাইরে দেখান যেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু ভিতর ফাঁকা, সেখানে ব্রহ্মময়ী। যোগানন্দ পুরুষ—যোগের এভারেস্টে উঠেছেন। তখন কামিনীকাঞ্চন, দেহসুখ, সব কাকবিষ্ঠার মত হয়ে যায়। তাঁরাই মায়ার veil (আবরণ) penetrate (ছিন্ন, ভেদ) করেন। পুরুষ পায়রার মত তাঁরা লৌকিক ব্যাপারে ঠোঁট টেনে নেন। মাদি পায়রারা মুখে ঠোঁট দিলে নেতিয়ে পড়ে। কিন্তু পুরুষ পায়রারা মুখে যেই ঠোঁট লেগেছে অমনি সরে যায়। বিষয়ানন্দ আলুনি হয়ে গেছে, ব্রহ্মানন্দে মগ্ন।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা ৩রা জানুয়ারী ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ
১৯শে পৌষ ১৩৩০ সাল। শনিবার শুক্লা নবমী ৩৯ দণ্ড।৬ পল

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

অন্তরের আবরণ ছিন্ন করতে পারে মানুষ

মর্টন স্কুল। চারতলার সিঁড়ির ঘর। শীতকাল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। শ্রীম ভক্তসঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন।

গত কয়েকদিন ধরিয়া তিনি শিখদের গুরুদ্বারায় যাতায়াত করিতেছিলেন। গ্রন্থ সাহেবের পাঠ শুনিয়াছেন। 'সুখমনী' সাহেবের গান শুনিয়াছেন। এখন ঐ সকল দেববাণীর অনুস্মরণ চলিতেছে—গুরু নানক, অর্জুনদেব প্রভৃতির। আবার ঠাকুরের

কল্পতরু দিবসের ব্রহ্মদর্শনের অনুধ্যান করিতেছেন। এখন ক্রাইস্টের কথার উদ্দীপন হইয়াছে। আবিষ্ট হইয়া তাঁহারই কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ইহুদীদের হীন দশা অসংযম ও ছলনায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি বলছেন, 'Ye vile and adulterous generation, ye look for a sign.' (হাস্য)। হে নীচ ব্যভিচারী জনগণ, আমি যে ঈশ-পুত্র তার প্রমাণ চাইছ। তাই কি বলছ—তোমার কেরামত দেখাও, কেরামত!

(জনৈক ভক্তের প্রতি) কি বল? (সকলের প্রতি) কেরামত দেখতে চায় ভোগী মানুষ। তা তিনি কেন দেখাবেন? যারা শোক দুঃখে অত কাতর তাদের কেন কেরামত দেখাবেন? (ক্রাইস্ট) বললেন, যা আসল কেরামত তাই দেখাচ্ছি। কি সে কেরামত? না, 'উজান পথে করে আনাগোনা'—সর্বদা ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ।

শ্রীম গাহিতে লাগিলেন:

গান। মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা।
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না॥
মনের মানুষ হয় যে জনা
ও তার নয়নে যে যায় গো চেনা
সে দুই একজনা।
সে ভাবে হাসে রসে ভাসে
উজান পথে করে আনাগোনা।

ভক্তরা উজান পথে আনাগোনা করেন। স্রোতের অনুকূলে যায় সকলে। ভক্তগণ মহাপুরুষগণ যান প্রতিকূলে। সকলে যেদিকে চলে অর্থাৎ সংসারে ভোগে, তাঁরা সেদিকে যান না। তাঁরা যান উজান পথে। পুরুষ পায়রার ঠোঁট ধরলে কি করে? (হাত দিয়ে টেনে নেওয়ার ভাব দেখাইয়া) এমনি করে ছিনিয়ে নেয়। আর অন্য পায়রাকে ধরলে কি করে? না, ভোগের দিকে মন gravitate (আকর্ষণ) করে।

'I will none of it'—ভোগ চাই না। খাপ খোলা তরোয়াল। No compromise (আপোষ নাই)।

'মানুষ সোহি হ্যায় যো রাম রস্ চাখে'। আর অন্যরা অন্য নিয়ে আছে—ভোগের জিনিস।

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনি ঈশ্বরে ভবতাং ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥"

দেখুন, চৈতন্যদেবের কি কথা। কিছুই চাইছেন না—ধন, জন এই সব কিছুই না। শুধু অহৈতুকী ভক্তি। মানে অকারণ ঈশ্বরে ভালবাসা।

আহা, নানকদেব বেশ বলেছেন, আমার মন যেন ভক্তদের পাদপদ্মে থাকে। কি কথা। তাঁর উপদেশে আছে 'জপজী'তে, 'সন্তত্তকা মহিমা বেদনা পাওয়ে।' কি অনুভূতি!

ভক্ত কত বড় বস্তু তাঁরাই চিনতেন। ঠাকুরও বলেছেন, ভক্ত ও ভগবান এক। বলেছেন, ভক্ত যেন হাতি—মরলেও লাখ টাকা দাম। অর্থাৎ তার সব অমূল্য।

(একজনের প্রতি) এই যেমন আপনারা ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল। এরই নাম ভক্ত।

ঋষিরা সেই ভক্তের জন্য হোম করছেন। আহুতি দিয়ে বলছেন, ভক্তগণ আসুন। হে ভগবান, তাঁদের পাঠিয়ে দাও।

আমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। বিমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। প্রমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। সমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা।

ব্রহ্মচারিগণের জন্য আহুতি। তা নইলে প্রাণ শীতল হবে কি করে? যারা দিবানিশি ভগবানের জন্য পাগল সেই ঋষিগণ এই প্রার্থনা করছেন। তাইতো নানকদেবও বলছেন, ভক্তদের পাদপদ্মে যেন মন থাকে। অন্য গুরুগণেরও এই ভাব।

শ্রীম (ছোট রমেশের প্রতি)—তোমরা তো যাও নাই। কাল যেও দু'জায়গায়ই। বেশ উদ্দীপন হবে। হ্যারিসন রোডের উপরই; লেখা আছে 'শ্রীগুরুগোবিন্দ সিংএর জন্মমহোৎসব।'

শ্রীম (সকলের প্রতি)—নানক মহারাজের কি উদার ভাব! পুরীর একটি ঘটনায় তা বেশ বোঝা যায়। তিনি ৺জগন্নাথ-দর্শন করতে গেছেন। পাণ্ডারা মনে করলো মুসলমান। তাই মন্দিরে ঢুকতে দিল না। তখন আরতির সময়। ইনি আর কি করেন, বাইরে বসে গাইতে লাগলেন বিরাটের গান। তখনই রচনা করে তখনই গাইলেন, এই গানটি।

গান।

গগনময় থলে রবিচন্দ্রদীপক বনে, তারকামণ্ডল চমকে মোতিরে।
ধূপ মলয়ানিল, পবন চৌরি করে, সকল বন রাই ফুটন্ত জ্যোতিরে॥
কৈসে আরতি হোঙ্গ, ভব-খণ্ডন তেরী আরতি, অনাহত শবদ
বাজন্ত ভেরীরে।
হরিচরণ-কমল-মকরন্দ লোভিত মন, অনুদিন মোহেয়া পিয়াসা;
কৃপাজল দেও নানকসারঙ্গকো, হো যায় তেরে নাম বাসা॥

শ্রীম (যুবকের প্রতি)—শোনা যায়, যেই তিনি এই গানটি গাইতে লাগলেন, সব লোক মন্দির ছেড়ে গিয়ে তাঁর গান শুনতে লাগলো—মন্দির লোকশূন্য। দেখুন, ভক্তের মান বাড়াবার জন্য কত প্ল্যান ভগবানের! মন্দিরে ঢুকতে দিলে আর এই অমর গীতিটির রচনা হতো না। এটি একটি classical song (উত্তম পৌরাণিক গীতি) হয়ে রয়েছে। সব গুরুদ্বারায় এই গান হয়। Original (প্রথম, মূল) গানটি গুরুমুখীতে। রবিবাবু বুঝি বাংলায় adapt (রূপান্তরিত) করেছেন। কি উচ্চভাব, যেন চোখে দেখছেন সমগ্র বিশ্ব শ্রীভগবানের আরতি করছে।

যুবক—এমারসনেও এই ভাব দেখা যায়।

শ্রীম—হ্যাঁ। সে অন্যরকম। অত উঁচু ভাব নয়। ইনি দেখেছিলেন, nature (বিশ্ব প্রকৃতি) যেন যুক্ত করে ভগবানের প্রার্থনায় মগ্ন। একটি কল্পনা, আর একটি প্রত্যক্ষ দর্শন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—নানকদেবের আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। মর্দানা ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ। সর্বদা সঙ্গে

থাকতেন। তিনি ছিলেন মুসলমান। নানক সর্বদা উপদেশ দিতেন, সব ঈশ্বরেচ্ছায় হয়। আর, সব পূর্ব থেকেই ঠিক হয়ে আছে। মর্দানার অত বিশ্বাস ছিল না এ কথায়। নানক মক্কায় রওনা হবার সময়ের ঘটনা। একদিন একটি মকাইয়ের দানা দেখিয়ে মর্দানা বললেন, 'গুরুজী, এ দানাটি কে খাবে?' তিনি উত্তর করলেন, 'একটা মুরগীতে খাবে, কাবুলে।' মর্দানা হাতে নিয়ে ঐ দানাটি ঝট্ করে নিজের মুখের ভিতর ফেলে দিলেন। গিলতে গিয়ে দানাটা পেটে না গিয়ে নাকের নালীতে ঢুকে পড়লো। অনেক চেষ্টায়ও ওটা বের হলো না। তারপরই দু'জনে মক্কার পথে কাবুলে গিয়ে উপস্থিত। একটা 'সরাই'-এ উঠেছেন। সরাইয়ের অঙ্গনে একটা মুরগী চরে বেড়াচ্ছিল। মর্দানার তখন খুব হাঁচি এলো। তার সঙ্গে মকাইয়ের দানাটি বের হয়ে এলো। তীরবেগে মুরগীটা গিয়ে ওটা খেয়ে ফেললো। গুরু নানক তখন হেসে বললেন, 'বিশ্বাস করতে হয়। সব ঈশ্বর ঠিক করে রেখেছেন আগে থেকেই।' অত দেখে শুনেও বিশ্বাস হচ্ছে না। খাওয়াপরা সব ঠিক হয়ে আছে। এই ঘটনাটিকে অবলম্বন করে তাঁর একটি অমর বাণী তৈরী হয়েছে।

বাণী। নাথ, খসমকী হাত ক্রীৎ ক্রীৎ ধাক্কা দে।
যাহা দানা তাহা খানা নানকা সাচ্‌হে॥ ৫

নাথ, মানে নাক; খসম্ মানে মালিক, অর্থাৎ জীবের নাকে রশি বাঁধা আছে। সেই রশি ভগবানের হাতে লগ্ন। যেমন উটের নাকে বেঁধে মালিক হাতে রাখে রজ্জু। 'ক্রীৎ ক্রীৎ ধাক্কা দে' মানে নানা অবস্থার ভিতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে এই সত্যটিকেও বোঝান। খাওয়া-পরার জন্য মন যোগভ্রষ্ট হয়ে যায়। তাই বলেন, যার দানাপানি যেখানে, তাকে তা নিতেই হবে। এইটে একটা মহাসত্য। 'নানকা' মানে মানুষ নানকে বা জীবকে, ভক্ত নানক, গুরু নানক বলছেন।

পিটারকেও ক্রাইস্ট এই কথাই বলেছিলেন। পিটারকে রোজ বলেন, 'Follow me, and I will make you fishers of men'. 'আমার সঙ্গে চলে এস। আমি তোমাদের দিয়ে মানুষ মাছ ধরাব।'

পিটার তখন জেলে—মাছ মারছেন। রোজ রোজ শুনে একদিন বললেন, প্রভো আপনি তো চলে আসতে বলছেন। এখন দক্ষিণ-হস্তের ব্যাপার, অর্থাৎ আহার বস্ত্রাদি কোথা থেকে আসবে? খাঁটি কথা বলে ফেলছেন। জগতের দিক দিয়ে এটা বড় সত্য। ক্রাইস্ট তখন বললেন, 'O, ye of little faith'—এর মানে অবিশ্বাসী, বিশ্বাস কর, তিনি তোমার সব অভাবের কথা জানেন, সব পূরণ করবেন।

আর এবারে কি হলো নরেন্দ্রের? অভাবে পড়ে দিশেহারা। জগন্মাতাকে বলবার জন্য ঠাকুরকে অনুরোধ করলেন। ঠাকুর বললেন, মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা মা পূর্বে থেকেই করে রেখেছেন। তার জন্যে ভেবো না।

এঁরা সব type of man (আদর্শ মানুষ)। তাই সকলের মনের মূল কথাটি এঁদের ভিতর দিয়ে বের হয়। যার ভগবানে বিশ্বাস হয়েছে সে নিশ্চিন্ত। অন্যরা তো অন্নবস্ত্রের ভাবনা করবেই। কতজন আর বিশ্বাসী মেলে? সবই অন্য রকম। তাই তাদের কথাটাই ব্যক্ত হয়েছে এঁদের ভিতর দিয়ে।

৫

উপাধ্যায় প্রবেশ করিলেন।

শ্রীম (রহস্য করিয়া, উপাধ্যায়ের প্রতি)—আসুন, আসুন, এদিকে (শ্রীমর ডান হাতে) বসুন।

উপাধ্যায়—আপনার সঙ্গে এক আসনে বসা!

শ্রীম (উপাধ্যায়ের গায়ের আলোয়ান টানিয়া)—না, না বসুন, আপনি বসবার যোগ্য। কোথায় আছেন, এখানেই আছেন—মেছুয়াবাজারে?

উপাধ্যায়—আজ্ঞে না, বৈঠকখানায়। আপনার কৃপায় এমনি ভাল হয়ে গেছি। আপনার কথায় স্নান করে করেই ভাল হয়ে গেছি। ওষুধ খেতে হয় নি।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—একবার আমরা কয়েকজন বন্ধু lunatic asylum (পাগলাগারদ) দেখতে গিছলাম। একজন লোক বেশ কথা

কইছে—সোসিওলজি, সাইন্স, ফিলজফি—এই সব বিষয়। তারপর বললেন, 'মশায়, আমার তিনচারজন ছেলেপুলে রয়েছে ঘরে। অপর লোকের কথায় আমাকে ধরে এনে এখানে আটকে রেখে দিয়েছে।' আমার সঙ্গীরা এই কথা শুনতে শুনতে অপর একটা পাগলের নৃত্য দেখছেন। সে খুব নাচছে। এ পাগলটি বললো, 'আপনারা কি দেখছেন, নাচ?' এই বলেই নাচতে লাগলো। উঃ সে কি ভীষণ নৃত্য।

বড় জিতেন—কাপড় ছেড়ে (সকলের হাস্য)।

শ্রীম—হাঁ। মানুষ ভাবে, খালি বুঝি ওরাই নাচছে, নিজেরাও পাগল—নির্লজ্জের নাচ নাচছে কামিনীকাঞ্চন নিয়ে, ঠাকুর বলতেন।

এতো সব আয়োজন রয়েছে। এখন বলছে, 'আমি আমি'।

খালি কি externalগুলি (বাইরের আয়োজন), internalও (ভিতরের আয়োজন)। দেখ না কত কাণ্ড! দাঁত, গলার নালী, লাংস্ (lungs)—কত কি? এইগুলি বাইরের, ভিতরে বাসনার স্তূপ। সারি সারি বাসনা রয়েছে। ইন্দ্রিয়গুলির কাজ, মনের কাজ, বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের কাজ, তারপর অহংকার। একস্ × ওয়াই × জেড্ ($x \times y \times z$)—বাইরের এই একটা series (সারি); আবার ভেতরে এ × বি × সি ($a \times b \times c$) এই আর একটা series (সারি)। এই দু'য়ের combinationএ (সংযোগে) এই strange consciousnessএর (এই অদ্ভুত চৈতন্য 'আমি'র) সৃষ্টি হয়েছে। এই দুটো seriesএর (সারির) aggregate effect (সম্মিলিত ফল) হলো এই strange consciousness (অদ্ভুত চৈতন্য 'আমি').।

আবার তাই কি। এইগুলির property (গুণ) খুঁজতে খুঁজতে যাও, দেখবে infinite series (অসংখ্য সারি) রয়েছে।

ঋষিরা এইসব প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই অবাক হয়ে বলেছেন, ঈশ্বর 'অনোরনীয়ান্ মহতো মহীয়ান্'। তিনি ছোটর ছোট, আবার বড়র বড়। তাই বলে, আমাদের ভেতর Infinite (অনন্ত) রয়েছেন। Finiteএর (সসীমের) ভেতর Infinite (অসীম, অনন্ত)। আবার Infiniteএর (অনন্তের) ভেতর Finite (সান্ত, সসীম)।

এতো কাণ্ড করে আমাদের এই consciousness (চৈতন্য, 'আমি')। এই দুটো seriesএ (সারির) মিল না হলেই তখন বলে death (মৃত্যু)।

দেখ না, কি সুন্দর করেছেন। External (বাইরে) থেকে আসবে রূপ-রসাদির আকর্ষণ, তাই এদিকে receive (গ্রহণ) করবার জন্য চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, স্পর্শ—এই সব রয়েছে।

শিশুর প্রথমে কোন জ্ঞান নাই। কোন্‌টা কি, কিছুই জানে না। একটা শব্দ শুনে wrong directionএ (বিপরীত দিকে) কান নিচ্ছে। আগুনের জ্ঞান নাই, লাল দেখে ধরতে যায়। সুন্দর জিনিস দেখলেই আকৃষ্ট হয়। আগুনে যেই হাত দিয়েছে অমনি তাত লাগায় টেনে নিলে। গোলাপের ডালে যেই হাত দিলে অমনি কাঁটার ঘা খেয়ে 'উঃ' করে সরিয়ে নিলে। এইরকম করে super-imposition (মনের ওপর রেখাপাত) হচ্ছে। এইরূপ করে করে strange consciousnessএর (অদ্ভুত জ্ঞানের, 'আমির', অহংকারের, ব্যক্তিত্বের) সৃষ্টি হয়েছে। এরই সমষ্টি 'আমি'।

এখন তোমার এই limited consciousness (সীমাবদ্ধ জ্ঞানের) দ্বারা unlimited consciousness (অসীম চৈতন্যকে, জ্ঞানকে) কেমন করে পাবে? যখন এই consciousness (সসীম জ্ঞান, জীবত্ব) ঐ consciousnessএর (অসীমের) সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাবে তখন। তাই ঠাকুর বলেছেন, প্যাঁজ খুলে খুলে শেষে দেখে ফাঁকা। অথবা, নুনের পুতুল সমুদ্রে মিশে গেল।

এইগুলি সব super-imposition (বাহ্যজ্ঞান)। তুমি সর্বদা রয়েছ in terms of the Finite (সসীমের সহিত সংযুক্ত)। কেমন করে বুঝবে Infiniteকে (অসীমকে)?

ঠাকুর এই limited consciousnessটাকে, জীবচৈতন্যকে, unlimited consciousness ব্রহ্মচৈতন্যের সঙ্গে যোগ করে দিতে বলতেন। বলতেন, একটা সম্পর্ক পাতিয়ে থাক—দাস, পুত্র, সখা ইত্যাদি দিয়ে। অথবা জ্ঞানযোগে 'সোঽহম্‌' দিয়ে সম্বন্ধ করে।

সে-ই আমি। ছোট আমিটা, বড় আমির সঙ্গে যোগ করা। 'কাঁচা আমি'টাকে 'পাকা আমি'র সঙ্গে graft (জোড় কলম) করে দেওয়া—যেমন গাছের কলম করে, তেমনি। এই একটি মাত্র উপায় এই strange consciousnessটাকে সকল দুঃখের কারণ এই অহংকারকে বশ করবার।

ঈশ্বর কত বড় তা মানুষের বুদ্ধিতে কতটা বুঝতে পারে? আর তাই তাঁর মহিমা মানুষ কতটাই বা বলতে পারে? গানে আছে, শিব পঞ্চমুখে বলেও সেই মহিমার শেষ করতে পারে না। (ভক্তদের প্রতি) 'শিব পঞ্চমুখে গায়, শিব পঞ্চমুখে গায়।' তারপর কি?

শ্রীম—দেখুন, শিব পঞ্চমুখে তাঁর গুণগান করেও শেষ করতে পারেন না। আবার আছে, শেষ নাগ, সহস্র মুখে তাঁর কথা শেষ করতে পারে না।

(গানের সুরে) 'সুন্দর যোগীজন চিত্তবিমোহন।' আবার এমনি আকর্ষণ ও মোহিনীশক্তি! তাঁর রূপ দেখলে আর 'অন্যরূপ লাগে না ভাল।'

শ্রীম (উপধ্যায়ের প্রতি)—'ঋষিরা বলেছেন 'দুর্গম', তাই 'যোগিভিরগম্যং'। যদি তাই হয়, তবে তুমি শোকদুঃখে কাতর জীব কি করে জানবে তাঁকে তোমার এই limited consciousness (ক্ষুদ্র জ্ঞান) দিয়ে?

বিবেকানন্দ সোসাইটির ভক্ত—এই একটু আগে বললেন, মানুষ অন্তরের veil penetrate (মায়াবরণ ছিন্ন) করতে পারে। আবার বললেন, 'যোগিভিরগম্যং'।

শ্রীম (সুদৃঢ় স্বরে)—হ্যাঁ দুই-ই সত্য। 'ভক্ত জন জন্যে, মাগো তুমি যে সাকার। পঞ্চে পঞ্চ লয় হয়ে তুমি নিরাকার।' তিনি দুই-ই। 'যোগিভিরগম্যং' অর্থাৎ এই হিসেবী বুদ্ধিতে তাঁকে পাওয়া যায় না। কেউ যদি জানতে চায়, তপস্যা করুক—তখন তাঁর কৃপায় তাঁকে জানতে পারবে। তপস্যা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হলে, তিনি কৃপা করে দর্শন দেন।

তিনি সাকার, আবার নিরাকার। ছাদে উঠলে বোঝা যায় তিনি দুই-ই। ঠাকুর কখনো বলতেন, কোনো কিছুই নেই। আবার কখনো বলতেন, একটু একটু experience (দর্শন) হচ্ছে।

চৈতন্যদেবের কথায় বলেছিলেন, পুরীতে যখন ছিলেন তখন সব নিরাকার-ভাব হয়ে গিছলো। তাঁকে নিরাকার রূপে দেখতেন তখন। অন্য সময় সাকার দেখতেন—রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ।

বড় জিতেন—ঠাকুর কখনো বলতেন, ছবিটবি ভাল লাগছে না। সেটা কি অবস্থা ?

শ্রীম—হাঁ। আরও বলতেন ধূপটুপ ভাল লাগছে না—ফুলটুল। এই sense knowledge (বিষয়বুদ্ধি) দিয়ে এ সব বোঝা যায় না। ঠাকুর চিন্ময় দেখতেন সব। নিরাকারই হোক আর সাকারই হোক, সব সচ্চিদানন্দ তাঁর কাছে। তাঁর মনটি ছিল 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্'।

আহা, সেই পরমহংস অবস্থা আর দেখবো না! যোগানন্দ-সাগরে অবগাহনের পর একেবারে নূতন। কারো সঙ্গে মেলে না। আবার সকলের সঙ্গে মেলে।

তখন সমাধিতে experiences (জগতের জ্ঞান) সব শেষ। সম্পূর্ণ নূতন অবস্থা ঠাকুরের। তখন কোন super-imposition (ভ্রান্তিজ্ঞান) নেই। এ যেন 'বন থেকে বেরুল টিয়ে সোনার টোপর মাথায় দিয়ে!'

ব্রহ্মবস্তু ভিতরে ঢুকে—ব্রহ্ম মানে বৃহৎ কি না—একেবারে সব তোলপাড় করে দিচ্ছে। যেমন কুঁড়েঘরে হাতি ঢুকলে সব তোলপাড় হয়ে যায়।

শ্রীম (যুবকের প্রতি)—A tree is known by its fruits. ফল দেখলে গাছ চেনা যায়। তেমনি ঠাকুর কি ছিলেন এটা বোঝা যায় ফল দেখে। কি সে ফল ? দেখ না, ক'দিনের ভেতর তাঁকে নিয়ে কত কাণ্ড হচ্ছে world (জগৎ) জুড়ে। এদিকে নিরক্ষর পূজারী ব্রাহ্মণ। আর তাঁর কথা জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা মাথায়

তুলে নিচ্ছে। ম্যাকস্‌মূলার তাইতো জীবনী লিখলেন। এতেই বোঝা যায় তিনি কে। অর্থাৎ অবতার।

বিবেকানন্দ সোসাইটির একজন ব্রহ্মচারী আসিলেন। অমনি কথার স্রোত উল্টাইয়া গেল।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—আজকাল মঠে অনেক মহৎ লোক আসছে। বি-এ এম-এ পাশ সব। আমরা দেখে এলাম কিনা (বিদ্যাপীঠে মিহিজামে)। হিমালয়ে কতকগুলি আবার তপস্যা করছে। এদের সঙ্গে এই সব বাইরের বি-এ এম-এ-র তুলনা? ও যদি হিমালয় পর্বত হয়, এ সর্ষপ। আর, ও যদি মহাসাগর হয়, এ যেন গোষ্পদে জল। এত তফাৎ।

কারো বার বছর, কারো ষোল বছর ব্রহ্মচর্য। অন্য সব লোকদের ভেতর টাকা কড়ি, মান সম্ভ্রমের বাসনা গজগজ করছে। দিনরাত কামিনী-কাঞ্চনের চিন্তা চলছে। আর, মঠের ওদের কি? কিসে ঈশ্বরদর্শন হয় তার জন্য ব্যাকুল। ব্রহ্মজ্ঞানী মায়ের মত দরকার হলে কালীঘাটে গিয়ে হত্যা দিচ্ছে। যাতে তাঁকে লাভ হয় তার জন্য সব করতে প্রস্তুত। এমন যে অমূল্য জীবন তাও উৎসর্গ করছে।

পুলি সব দেখতে এক রকম। কিন্তু কারো ভিতর ক্ষীরের পোর, কারো ভিতর কলাই ডাল। তেমনি মানুষ। দেখতে এক রকম হলেই কি সব সমান?

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—একদিন রাত ন'টা। কোথাও কিছু নেই। হঠাৎ ঠাকুর বলছেন, ভক্তরা কেউ মনে না করে আমি না হলে হবে না। অর্থাৎ লোকশিক্ষা। এই বলেই আবার বলছেন, যেমন একটা জলের কল। তার একটা পাইপ নষ্ট হলে ইন্‌জিনিয়ার এসে বদলিয়ে আর একটা লাগিয়ে দেয়। তেমনি Divine Engineer (ঈশ্বর) এসে ফস্‌ করে আর একটা নূতন পাইপ বসিয়ে দিয়ে যাবে। তাঁর কাজ কিছুতেই আটকাবে না।

ভক্তরা যেন এক একটি প্রণালী। নানা প্রণালী দিয়ে একই

জল বের হচ্ছে। সবই তাঁর ভাবের প্রচার করছে এক একটা দিক। অনন্ত ভাবময় ঠাকুর।

বড় জিতেন—অবতার না এলে যে সব অন্য রকম হয়ে যায়।

শ্রীম—যেমন waveএর (তরঙ্গের) hollow and crest (পতন ও উত্থান)। Hollow (পতন) হয় কেন? না, আবার উঠবে বলে। সে তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে। ধর্মের পতন ও উত্থান।

ভক্তরা কি মনে করছেন, অবতারের সাঙ্গপাঙ্গ না থাকলে তাঁর কাজ লোপ পেয়ে যাবে, কাজ চলবে না?

শ্রীম কিছুকাল নীরব রহিলেন। তারপর গুনগুন করিয়া 'শম্ভু শম্ভু' বলিতেছেন।

পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আমার এখন কাশীর কথা মনে পড়ছে। সেই সিন্‌টি দেখছি। জলটল মাথায় নিয়ে আসছে সব। আর সব লোক সারি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখছে কাঁধে কলসী। স্বয়ম্ভু যিনি, আমি তাঁর দাস। এই মানে, এই বলার। তার মধ্যে একজন সাধু নৃত্য করছে। ঐ 'শম্ভু' অনাহত শব্দে মিলে যাচ্ছে।

তাঁর নামে আনন্দ হলে কাম ক্রোধ দূরে চলে যায়।

শ্রীম একা একা কিছুক্ষণ ধরিয়া 'শম্ভু শম্ভু' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিতে লাগিলেন। ভক্তরাও কেহ কেহ ঐ নামকীর্তনে যোগদান করিলেন। আবার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। আবার আর একটি গান গাহিতেছেন।

গান। কবে আমার সুদিন হবে
যেদিন কুদিন গিয়ে সুদিন হবে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আহা, এই গানটি শুনে ঠাকুর নৃত্য করতেন। সমাধি হয়ে যেতো। অর্থাৎ, আমরা যে 'আমি'টার কথা বললাম—সেটা জবাব দিয়ে দিল। রণে ভঙ্গ দিল। Surrender (আত্মসমর্পণ) করলো। Higher (সত্যিকার) 'আমি'তে লীন হয়ে গেল। অর্থাৎ super-impositions (উপাধিগুলি) খুলে

গেল। এখন লাটাই শূন্য। সেই অবস্থা যোগীরা আস্বাদ করতে পারেন যোগে।

এখন রাত্রি নয়টা।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা। জানুয়ারী ৩, ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ
পৌষ ১৯, ১৩৩০ সাল। শনিবার, শুক্লা নবমী ৩৬ দণ্ড।৬ পল

সপ্তবিংশ অধ্যায়

অবতার সূর্য, সাঙ্গোপাঙ্গ রশ্মি

'ঠাকুরবাড়ী'। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা। সকাল সাড়ে নয়টা। শ্রীম দ্বিতলের নিজ কক্ষে বসিয়া আছেন, খাটের উপর দক্ষিণাস্য। হাতে কথামৃতের পঞ্চম ভাগের ছাপা ফর্মা।

অন্তেবাসী আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, আমার সঙ্গে সুকুমার মহারাজ এসেছেন মঠ হতে আপনাকে দর্শন করতে। নামে চিনিতে পারিলেন না। তাই অন্তেবাসী আবার বলিলেন, 'ওঁর' আরো দু'টি নাম আছে—শম্ভু মহারাজ ও স্বামী সৎস্বরূপানন্দ। বিদ্যাপীঠের হেড মাস্টার ছিলেন। এখন তপস্যায় যাচ্ছেন—উত্তরাখণ্ডে।

শ্রীম—কই তিনি—আসুন না। (গৃহে প্রবেশ করিলে) ও, এঁকে যে আমি চিনি (হাস্য)।

স্বামী সৎস্বরূপানন্দ—জিতেন বিশ্বাসদের (স্বামী বিশ্বানন্দ) সঙ্গে আগে এখানে আসতাম।

আজ সকাল বেলায় তিনজন সাধু—স্বামী অবিনাশানন্দ, স্বামী সৎস্বরূপানন্দ ও স্বামী নিত্যাত্মানন্দ—বেলুড় মঠ হইতে বাসে হাওড়া স্টেশনে আসেন। সেখান হইতে স্বামী অবিনাশানন্দ যান

ওয়েলিংটন লেনের অদ্বৈতাশ্রমে। আর ইঁহারা দুইজন আসিলেন শ্রীম-দর্শনে।

শ্রীম আহ্লাদে আহ্বান করিয়া স্বামী সৎস্বরূপানন্দকে নিজের খাটের উপর দক্ষিণ দিকে বসাইলেন। আর একজন বসিলেন শ্রীমর সম্মুখে চেয়ারে।

শ্রীমর কক্ষটি খুব ক্ষুদ্র, ৮ × ৬ ফুট। ঐ ঘরের উত্তর-পূর্ব দিকে দেয়াল ঘেষিয়া একটি তক্তাপোষ। তাহার উত্তরে একটি টেবিল। তাহাতে আছে পুস্তক, 'কথামৃতে'র ডায়েরী, পঞ্চম ভাগের ছাপান ফর্মা, এই গৃহের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটি ছোট আলমারী। উহা এনসাইক্লোপেডিয়া প্রভৃতি গ্রন্থে পরিপূর্ণ। খাটের পূর্বদিকে মধ্যস্থলে একটি দরজা পূর্বমুখী। উহা দ্বারা পাশের পূর্বের ঘরে যাতায়াত হয়। দক্ষিণ দেয়ালের মধ্যস্থলে একটি জানালা। তাহার পশ্চিমে দরজা। এই দরজা দিয়া শ্রীম বারান্দায় যাতায়াত করেন। উত্তরের দেয়ালের জানালাটিতে সরু জাল দিয়া ঢাকা। পশ্চিম দিকে নিরেট দেয়াল। এই দেয়ালে ও অপর দেয়ালে নানা দেবদেবী ও নরদেবগণের ছবি টাঙ্গান। ঠাকুর, স্বামীজী, মা, চৈতন্য-সংকীর্তন, গৌর নিতাই, ডিমে তা-দেওয়া পাখী, প্রভৃতির ছবিও রহিয়াছে। তক্তাপোষের উপর দুইখানা তোষক, চাদর ও বালিশ। বিছানা কিঞ্চিৎ ময়লা।

শ্রীম তক্তাপোষে উপবিষ্ট। গায়ে ফতুয়া। তাহার উপর সাদা ধবধবে লাল পেড়ে আধখানা ধুতি চাদরের মত করিয়া তাঁহার গায়ে জড়ান।

শ্রীমর চক্ষু স্থির ও উজ্জ্বল, মুখমণ্ডল আনন্দময়, উন্নত ললাট, আবক্ষ শ্বেত শ্মশ্রু। শীর্ষদেশ বিরল-কেশ। তিনি প্রসন্ন ভাবে উদ্দীপনাময়ী কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (স্বামী সৎস্বরূপানন্দের প্রতি)—God-speed! The sooner the better. It's a sight for the Gods to see. Simply, struggle is enough, not to speak of realisation—শুভস্য শীঘ্রম্। যত শীঘ্র হয় ততই ভাল।

দেবগণেরও বাঞ্ছনীয় এ দৃশ্য। কেবল মাত্র তপস্যাই যথেষ্ট। আত্মদর্শনের আর কথা কি!

একটি সাধু (স্বগত)—এত শারীরিক যন্ত্রণাতেও কি প্রশান্তোজ্জ্বল চক্ষু দু'টি, কি প্রেমানন্দময় মুখমণ্ডল! মন যেন আনন্দ-সাগরে ডুবে আছে। ভগবানে কত ভালবাসায় এরূপ হয়!

স্বামী রাঘবানন্দ প্রবেশ করিলেন। অন্তেবাসী তাঁহাকে চেয়ার ছাড়িয়া দিলেন। তিনি শ্রীমর আদেশে বিছানার উত্তর দিকে গিয়া বসিলেন।

শ্রীম (স্বামী সৎস্বরূপানন্দের প্রতি চাহিয়া)—আপনারা আড্ডা করেছেন কোথায়?

স্বামী সৎস্বরূপানন্দ—মুসুরী পাহাড়ের নিচে, রাজপুরের অম্বিকা-মন্দিরে। দেরাদুন থেকে আট মাইল ওপরে। কিষণপুর আশ্রম তিন মাইল নিচে।

শ্রীম—আর কেউ আছেন ওখানে?

স্বামী সৎস্বরূপানন্দ—আজ্ঞে হাঁ। পাটনার স্বামী অব্যক্তানন্দ, আর কাশীর স্বামী জ্ঞানানন্দ ও স্বামী জগদানন্দ মহারাজ।

শ্রীম—কে জ্ঞানানন্দ?

অন্তেবাসী (সহাস্যে)—যিনি কুমীরকে ভয় করেন না। বলেছিলেন, কুমীরকে কেটে ঝোল করে খাব।

শ্রীম (উচ্চহাস্যে)—হাঁ, হাঁ, চিনেছি। খুব সাহসী। (সকলের হাস্যতরঙ্গ)।

স্বামী রাঘবানন্দ—রাজপুর বেশ জায়গা—বেশ association (পবিত্র সম্বন্ধ) আছে। হরি মহারাজের সঙ্গে স্বামীজীর মিলন হয় ওখানে। ওখানেই স্বামীজীর অনুরোধে আমেরিকা যেতে রাজী হন তিনি।

শ্রীম (তিনতলার ঠাকুরঘরের ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া অন্তেবাসীর প্রতি)—যান না আপনি, এঁকে আমাদের ঠাকুরঘর দেখিয়ে আসুন।

সাধুরা সকলে উপরে ঠাকুরঘরে গেলেন। ঠাকুরের পাদুকা দর্শন করিলেন। তারপর বাল্যভোগের প্রসাদী ফল মিষ্টি 'নাটমন্দিরে' বসিয়া সেবা করিলেন। আবার সকলে নিচে শ্রীমর নিকটে ফিরিয়া আসিলেন।

স্বামী রাঘবানন্দ—প্রুফ এসেছে। (শ্রীমর অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়া পুনরায়)—প্রুফ এসেছে।

শ্রীম—হাঁ। (স্বামী সৎস্বরূপানন্দের প্রতি)—এই আমাদের ফিফথ্ পার্ট হচ্ছে। 'পরিশিষ্টে'র স্বামীজীর কথা এখন ছাপা চলছে। এ সব ঘটনা হাফ-এ-সেঞ্চুরী (অর্ধ শতাব্দী) হয়েছে। এখনো মনে হচ্ছে, কাল হয়েছে।

শ্রীম—(স্মিত হাস্যানন্দে, অন্তেবাসীর প্রতি)—বল দিকিন্ কেন চিরনূতন?

সকলে ভাবিতেছেন।

শ্রীম—ঠাকুর true ideal (শাশ্বত আদর্শ) দিয়েছেন কিনা। সব লোক ঐ দিকে যাচ্ছে। যে যে stageএ (স্তরে) আছে সে। সেই স্থান থেকে light (আলো) পাচ্ছে। তাই চিরনূতন। Different stageএ (বিভিন্ন স্তরে) আছে কিনা লোক। সকলে কিছু এক stageএ (স্তরে) নাই।

স্বামী রাঘবানন্দ—আচ্ছা, ঠাকুর যে 'ঘর' বলে দিতেন, ওটা কি—যেমন 'অখণ্ডের ঘর'?

শ্রীম—ওটা lead (অগ্রগামী) করার জন্য। একটা ভাল জিনিস সামনে ধরা থাকলে ভালর দিকে এগুবে—তারই জন্য। Stage to stage lead, এক স্তর থেকে অপর স্তরে—উন্নততর অবস্থাতে পরিচালনা করবার জন্য।

স্বামী রাঘবানন্দ—আচ্ছা, stage (স্তর) কোন্‌টা বড়, কোন্‌টা ছোট কি করে জানবে? কে বলে দেবেন? পাঁচ জনে করছে একটা, আমি করছি আর একটা। এখন কোন্‌টা বড়, কোন্‌টা ছোট কে বলবে?

শ্রীম—যিনি মীমাংসা করবেন তিনি সবই দেখছেন, হয়তো হাসছেন।

ঠাকুর বলেছিলেন, আর একটা পথ আছে—'সোঽহং'। সে দিক দিয়ে নয়। এ ব্যাপারটি আলাদা—(সহাস্যে) এ সে দিক দিয়ে নয়।

অন্তেবাসী—কি, অবতার ?

শ্রীম—হাঁ, অবতার।

শ্রীম (স্বামী রাঘবানন্দের প্রতি)—বিভিন্ন স্তর তিনিই করেছেন। কিন্তু এগুলি মারামারি করে মরছে। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া তো গাছের পাতাটিও নড়ে না।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥

অতীত যে কালে জানেন ভবিষ্যৎও জানেন। কিন্তু 'তুমি' জান না। তুমি আমাকে ধর। তাতেই তোমার মঙ্গল হবে। 'মা শুচ'। দুঃখ করো না। আমাকে ধর। কোনও ভয় নাই।

এই যে স্পষ্ট message (প্রতিজ্ঞা), এ শুনছে কে ?

শ্রীমর দৃষ্টি ঊর্ধ্বে নিবদ্ধ। নয়নদ্বয় জ্বলজ্বল করিতেছে।

শ্রীম (স্বগত)—'অর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।'

শ্রীম (সকলের প্রতি)—তাঁকে চিনবে কে ? তিনিই সব দিচ্ছেন। তিনিই সব করছেন। তিনিই সব হয়েছেন।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি)—স্বামীজী আমেরিকা থেকে ঘুরে এসে বলরামবাবুর বাড়ীর ছাদে বেড়াতে বেড়াতে বলেছিলেন, 'তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়—তাঁর (ঠাকুরের) এ কথাটা আমি এখনো বুঝতে পারলাম না।'

কিন্তু পরে তাঁর কৃপায় বুঝেছিলেন—later perception ! তাই তো এইসব 'আরতি' 'স্তব' হলো—'খণ্ডন ভব-বন্ধন', 'ওঁ হ্রীং ঋতং'।

হলোই বা পরে। বড় ফুল দেরীতে ফোটে। যেমন পদ্মফুল। ছোট ফুল তাড়াতাড়ি ফোটে আবার ঝরেও যায় শীগ্গির।

স্বামীজীর হাত দিয়ে ঠাকুর এই সব স্তবস্তুতি, বন্দনা বের করেছেন। তবে তো world (জগৎ) শুনবে।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—বলতো মুখস্থ ?

অন্তেবাসী (ধীরে ধীরে)—

খণ্ডন ভব-বন্ধন, জগবন্দন, বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন নররূপধর, নির্গুণ গুণময় ॥ ইত্যাদি।

শ্রীম—দেখ, কি বলছেন স্বামীজী—যিনি নিরাকার নির্গুণ পরমব্রহ্ম, তিনিই ইদানীং সাকার সগুণ 'নররূপধর' শ্রীরামকৃষ্ণ। বলছেন, যে তাঁর শ্রীচরণে আশ্রয় নেবে সে অনায়াসে এই ভবসমুদ্র পার হয়ে যাবে। ঈশ্বর ছাড়া এ শক্তি আর কার আছে ? আবার বলছেন, 'দৃঢ়-নিশ্চয় মানসবান', অর্থাৎ সমাধিস্থ হয়েও তিনি 'নিষ্কারণ ভকতশরণ'।

সব contradictions (বিরুদ্ধভাব) meet করে (মিলিত হয়) একমাত্র ঈশ্বরে। তাই এই আরতির স্তবে বলছেন স্বামীজী—ঠাকুর সকল বিরুদ্ধ ধর্মের আশ্রয়। আবার তারও উপরে। (অন্তেবাসীর প্রতি)—'নমো নমো'—কি তার পর ?

অন্তেবাসী—'নমো নমো প্রভু বাক্যমনাতীত মনোবচনৈকাধার।'

শ্রীম—দেখ, ঠাকুর 'নররূপধর', 'নরবর', আবার 'বাক্যমনাতীত'। এর মানে যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, বাক্যমনের অতীত, তিনিই এখন অবতার হয়ে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-দেহে। তিনিই আবার তাঁর শক্তিসহায়ে জগৎলীলা করছেন—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়।

এই দু'টি স্তব পড়ে ধ্যান করলে তবে ধ্যান ঠিক হয়। নির্জনে যারা থাকবে এই স্তব পাঠ করলে ঠাকুরকে বুঝতে পারবে।

অন্তেবাসী—মহাপুরুষ মহারাজও সুন্দরকে এই কথাই বলেছিলেন। স্বামীজী ঠাকুরের সম্বন্ধে যা বলবার সব কথা এই সব স্তবে বলেছেন।

শ্রীম—তা আর বলবেন না! সেই Divine Personalityর (দৈবীপুরুষের) নিজের মুখের কথাই ঐ সব, সেই 'নরবরের'ই কথা,

সেই Grand Manএর, মহামানবের কথা। Behold the Man !' (এই মহামানবকে চক্ষুর সম্মুখে দর্শন কর)। ক্রাইস্ট নিজের কথাই নিজে বলেছিলেন। স্বামীজী সংকলন করেছেন—সেই মহামানবের নিজের মুখের কথাগুলি এই স্তব-পুষ্পাঞ্জলিতে।

কাশীপুরে যিনি শেষ অবধি বললেন, নিজে যদি (ঠাকুর) বলেন অবতার, তবে বিশ্বাস করি। সেই লোকই পরে এই সব স্তব রচনা করলেন।

শুধু মুখস্থ করে, চিন্তা করে কই লোক ? এ দু'টি চিন্তা করলেই সব হবে—তাঁকে ঠিক ঠিক বোঝা যাবে।

এইগুলি রচনা করেছেন বলেই তো আজ কত লোকের কল্যাণ হচ্ছে। কত মঠ, আশ্রমে এইসব স্তবগান হচ্ছে সারা জগৎ জুড়ে।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—'উগ্রং কৃণোমি'—চণ্ডীতে আছে (ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে)—উঁচুতে তুলি, আবার প্রয়োজন হলে নিচে ফেলে দি। (অন্তেবাসীর প্রতি) মুখস্থ আছে তোমার—বল না ?

অন্তেবাসী ও স্বামী রাঘবানন্দ একসঙ্গে আবৃত্তি করিতেছেন—

ওঁ অহং রুদ্রেভির্ব্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।

অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥ ইত্যাদি

শ্রীম—এই মন্ত্রে বলছেন, 'যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্।' আমি যাকে যাকে ইচ্ছা করি তাকে তাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ করি ; কারুকে ব্রহ্মা করি, কারুকে ঋষি করি এবং কারুকেও বা অতি প্রজ্ঞাশালী করি।

এই যা বলছেন, তার দৃষ্টান্ত একবার দেখ—স্বামীজীকে জগৎগুরু করলেন। আর দু একজনকে নিচে নামিয়ে দিলেন। একজনের পরমহংস অবস্থা, বলতেন। আবার পড়ে গেল। অনেক দিন আসে নি দেখে ঠাকুর বললেন—জান, কেন আসে না ? যা বারণ করেছি তাই করবে—মেয়েদের সঙ্গে পড়েছে। আর একজনকে বলতেন, ঈশ্বরকোটি। শেষের দিকে বললেন, কে তো কে। মানে ছেড়ে দিলেন। নিচে পড়ে গেল।

অন্যের কা কথা। পরমহংস অবস্থা থেকে একজন, ঈশ্বরকোটি অবস্থা থেকে আর একজন বিচ্যুত হলো। এ দেখেও কি লোকের চৈতন্য হয়!

শ্রীম—কাঁচা মন তো, যেন ধোপা-ঘরের কাপড়! যে রং-এ ছোপাবে সেই রং হবে, কিন্তু তাঁকে দর্শন করলে আর এরূপ হয় না। তখন environment (পরিবেশ) কিছু করতে পারে না। তখন 'জিতসঙ্গদোষা'—সঙ্গদোষ কিছু করতে পারে না।

একজন সাধু (স্বগত)—স্বামী শুদ্ধানন্দ ভবনাথের কথা একদিন জিজ্ঞাসা করায় শ্রীম এই উত্তরই দিয়েছিলেন—যিনি ওঠাতে পারেন, তিনি নাবাতেও পারেন। তাই বুঝি আচার্যগণ বলেন, ঈশ্বর অবতার—'কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুম্ সমর্থঃ'।

স্বামী রাঘবানন্দ—আচ্ছা, যদি সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়, তা হলে তপস্যার কোনো অর্থ থাকে না।

শ্রীম—তপস্যাও তাঁর ইচ্ছাতেই হয়। কত তো শুনছে লোক, কিন্তু করছে কোথায়? তিনি ইচ্ছা দিলে শত বাধা থাকলেও তপস্যা করে। তাঁর ইচ্ছা না হলে শত সুযোগ থাকলেও করবে না। মানুষের কর্ত্তব্য চেষ্টা করা। যতক্ষণ আর পাঁচটা বিষয়ে পুরুষকার দেখান হচ্ছে ততক্ষণ তপস্যার চেষ্টা করা। তপস্যা করলে এই বোঝা যায়, তপস্যা দ্বারা তাঁকে লাভ হয় না। তাঁর কৃপাতেই তাঁকে লাভ হয়। তবুও আর করবে কি? ঐতে লগ্ন থাকার চেষ্টা। যখন নিন্দনীয় কার্যে মন যায় তখনো চেষ্টা করা উহা ছাড়বার। তা করলেও জোর করে নিচে নামিয়ে দেয়' মনকে। তখন আর কি করবে মানুষ! তখন ভুগতেই হবে।

শেষ কথা এই, তাঁর ইচ্ছাতেই সব হয়—'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।' (একজন সাধুর প্রতি) কি মন্ত্রটা?

একজন সাধু—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুণা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈব আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

শ্রীম—আবার আছে—'ন তপসা ন চেজ্যয়া ন বহুণা শ্রুতেন।'

'কথামৃত' পঞ্চম ভাগ ছাপা চলিতেছে। শ্রীমর শরীর অসুস্থ থাকায় প্রুফ সব একা দেখিতে পারেন না। তাই স্বামী রাঘবানন্দ সাহায্য করেন। ইনি শ্রীমর সঙ্গেই আজকাল আছেন।

স্বামী রাঘবানন্দ পঞ্চম ভাগের নূতন কথা পড়িয়া সাধুদের শুনাইতে চাহেন। সাধুরা চাহেন শ্রীমর নিজ মুখের কথা শুনিতে। বারবার বলায় স্বামী রাঘবানন্দের আগ্রহ দেখিয়া সাধুরা উহা শুনিতে চাহিলেন। ঠাকুরের দেশের শ্যামবাজারের কথা আছে। তারপর জোড়াসাঁকোর হরিসভার কথা। ঠাকুর বলিতেছেন, হরিসভার অবস্থা, ভাবে এমনি হলো যে, শরীর যায় যায়।

শ্রীম—ঠাকুরের সামনে যখন গয়ার কথা পড়া হচ্ছিল তখনো আমরা দেখেছিলাম তাঁকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে। (স্মৃতি অতীতে নিবদ্ধ করিয়া) পূর্বের কথা স্মরণ হয়েছে কিনা। তিনিই তো নিজেকে নিজে জানতেন—'স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।'

অন্তেবাসী—চৈতন্যদেবের গয়াতে যা হয়েছিল সেই কথা ?

শ্রীম—হাঁ। চৈতন্যদেব যখন পিতার শ্রাদ্ধ করতে গয়া গিছলেন, সেখানে তাঁর গভীর ভাব হয়েছিল—ঈশ্বরদর্শন হয়েছিল।

স্বামী সৎস্বরূপানন্দ—ও-ও, সেই কথা !

শ্রীম—ঠাকুর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন, পাঠ শুনে।

অন্তেবাসী—কোথায়, দক্ষিণেশ্বরে ?

শ্রীম—হাঁ, দক্ষিণেশ্বরে।

অন্তেবাসী—'কথামৃতে'র পাঠকেরা মনে করেন, গয়া যেতেন না ঠাকুর, ওখান থেকে অবতার হয়ে জন্ম নিয়েছেন বলে। চৈতন্যাবতারের কথা স্মরণ হলে ভাবে শরীর চলে যাবে, এ কথা মনে কারো প্রায় ওঠে না।

শ্রীম—তাইতো পুরীতেও যেতেন না। চৈতন্যদেব ওখানে বিশ বছর ছিলেন। শেষের বারো বছর মহাভাবে থাকতেন। চৈতন্য-লীলার ঐ সব কথা স্মরণ হলে মহাভাবে শরীর চলে যাবে তাই

যেতেন না। চৈতন্যদেবই ইদানীং শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি নিজে বলেছেন, 'ক্রাইস্ট চৈতন্য আর আমি এক।'

শ্রীম (সকলের প্রতি)—স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছিলেন প্রথম দিনে—নদের গৌরের নাম শুনেছিস্, আমি সেই। উনি উত্তর করলেন, হ্যাঁ শুনেছি, লোক 'গৌরগৌর' করে।

আমাদের এই বাড়ী তখন পার্টিশান হয় নাই। ঐ সামনের ঘরে বসে স্বামীজী আমায় এই কথা বললেন। আর বললেন, মশায়, লোকটা কি পাগল হয়েছে নাকি ? বলে কিনা, আমি নদের সেই গৌর (সকলের হাস্য)।

অন্তেবাসী—আচ্ছা, স্বামীজী এ কথাটা কিভাবে নিলেন ?

শ্রীম (সহাস্যে)—কি আর ভাব !' ছেলেমানুষ তখন, আবার তাতে ইংরেজী-পড়া !

শ্রীম ও স্বামী রাঘবানন্দ (সমস্বরে)—Re-incarnationএ (পুনর্জন্মে) বিশ্বাস করেন নাই।

অন্তেবাসী—আমার ভুল ধারণা দূর হলো। আমার মনে হয়েছিল চৈতন্যদেবের অবতারত্ব ঠাকুর দাবী করায় স্বামীজী পাগল বলেছিলেন।

শ্রীম—ছেলেমানুষরা যে ভাবে নেয় স্বামীজীও সেই ভাবে নিয়েছিলেন। ইংরেজী পড়ে তখন অনেকে sceptical (সংশয়বাদী) হয়ে পড়েছিল। পুনর্জন্মে বিশ্বাস করতেন না। ইংরেজরা যে মানে না, তাই।

তাই তো ঠাকুর অত জোর দিয়ে প্রতিজ্ঞা করে ঐ সব লোকের কাছে কথা কইতেন। সব ইংরেজী পড়া লোক যেতো কিনা ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর বলতেন, মাইরি বলছি, মা এসেছেন। এই যে আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা কইছেন। তবে scepticদের (সংশয়াপন্নদের) মনে বিশ্বাস হবে। যতটুকু সম্ভব সাধারণের কাছে ভগবানকে প্রকট করা, ঠাকুর ততটুকু দেখিয়ে গেছেন এই নাস্তিক যুগে।

শ্রীম (সহাস্যে)—নরেন্দ্র বলেছিলেন, এদিকে তো কত টান টানছেন আমায়, তখন আমি কিন্তু সিমলার বাড়ীতে আরামে ঘুমুচ্ছি।

দেখ, যে ব্যক্তি পাগল বললেন, সেই তিনিই আবার স্তবে কি বলেছেন তাঁকে—তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো। অর্থাৎ হে দীনের বন্ধু, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, তাই তুমিই আমার একমাত্র শরণ।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি)—অবতার আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ, অনেক তফাৎ। যেমন সূর্য আর তাঁর রশ্মি। রশ্মি সাঙ্গোপাঙ্গ।

শ্রীমর হাতের বেদনা চলিতেছে। কষ্ট হইতেছে। অতক্ষণ কথামৃত-বর্ষণে তিনি সব ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সাধুরাও অমৃতপানে মগ্ন। অন্তেবাসী বুঝিতে পারিয়া পাখার হাওয়া করিতেছেন। শ্রীম বলিলেন, এ দরজাটা খুলে দাও। স্বামী সৎস্বরূপানন্দ পূর্বদিকের দরজা খুলিয়া দিলেন। দুই মিনিট পর শ্রীম হাওয়া বন্ধ করিতে বলিলেন। সাধুর সেবা নিবেন না।

ঘোষমহাশয়ের প্রবেশ। শ্রীম রসিকতার সহিত বলিতে লাগিলেন, আসুন, ঘোষমশায়, আসুন। (সহাস্যে) সন্দেশমশায়ও বলা যায়, কেন না, সন্দেশের দোকানে কাজ করেন (সকলের হাস্য)।

শ্রীম (ঘোষমহাশয়ের প্রতি)—আপনার সন্দেশ খেতে ইচ্ছা হয় না? Environment এর influence (পরিবেশের প্রভাব) আছে কি না।

(গম্ভীরভাবে) মন যে রংএ ছোপাবে সেই রং ধরবে। (কাঁচা মন) পাকা হলে সে ভয় নাই। পাকা হয় তাঁকে দর্শন করলে। (ঘোষমহাশয়ের প্রতি) হাওয়া করুন সাধুদের।

ঘোষমহাশয়ের বয়স প্রায় পঞ্চাশ। স্থূলকায়, ভালমানুষ। মুখে সদা প্রসন্ন ভাব। সর্বদা চুপ থাকেন।

শ্রীম কথামৃতের পরিশিষ্ট হাতে লইয়া পৃষ্ঠা গণনা করিতেছেন।

শ্রীম—মাত্র তের পৃষ্ঠা বাকী আছে ছাপা হতে।

স্বামী রাঘবানন্দ—এ হয়ে গেলে নূতন কিছু দিতে হবে।

শ্রীম—হাঁ। উলটিয়ে দেখলাম (ডায়েরী) অনেক materials (সামগ্রী) দেবার আছে।

স্বামী রাঘবানন্দ—ফিফ্‌থ পার্ট বড় হলে ভাল হয়। আর তো বের হবার সম্ভাবনা নাই। Humanityর (মানুষের) এতে অশেষ কল্যাণ হবে।

একজন সাধু—এঁর শরীর থাকলে মানুষের অধিক কল্যাণ হবে। লিখতে গিয়ে অত্যধিক পরিশ্রমে শরীর আরো খারাপ হলে সমূহ অকল্যাণ।

শ্রীম—লিখলে ঠাকুরের চিন্তা হয়ে যায়। তা না হলে শুধু বেদনার কথা মনে পড়ে। Labour of love (প্রেমের সেবা)।

স্বামী রাঘবানন্দ—দিনপঞ্জিকা দেওয়া যাবে এর পর।

শ্রীম—না, তা এখন চলবে না! নূতন লিখতে হবে।

অন্তেবাসী—দিনপঞ্জিকা কি?

স্বামী রাঘবানন্দ—Date and year (তারিখ ও সাল) অনুযায়ী একটা arrangement (সূচী রচনা)।

শ্রীম—এটা পড়লে কোথায় কি আছে সব জানা যাবে।

শ্রীম ঐ দিনপঞ্জিকার একটা কপি স্বামী সৎস্বরূপানন্দের হাতে দিলেন। অন্তেবাসীও দেখিতেছেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—এঁদের নিয়ে গিয়ে, সকলে ও ঘরে বসলে হয়।

সাধুরা উঠিয়া গিয়া পূর্বপার্শ্বের ঘরে মাদুর পাতিয়া বসিলেন। শ্রীম বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। বেদনা বাড়িয়াছে। ঘোষমহাশয় পাখা করিতেছেন।

সাধুরা দেখিতেছেন। কিন্তু কিছু করিবার উপায় নাই। বেদনায় অজ্ঞান না হইলে শ্রীমর সেবা করিবার উপায় নাই।

স্বামী সৎস্বরূপানন্দ (অন্তেবাসীর প্রতি)—কেন বললেন না আগে উঠে আসতে? আমি বুঝতে পেরেছিলাম বেদনা বেড়েছে। আপনারা কিছু না বলায় আমিও বলি নি।

অন্তেবাসী—মার কাছে ছেলে। সে মার কষ্ট বোঝে না, খালি স্নেহ চায় আমরাও তাই।

ঘোষমহাশয় একটা হ্যারিকেন আনিয়াছেন, সেক দিতে হইবে। শ্রীম গামছা দিয়া ডান হাতের কনুই চাপিয়া ধরিলেন। কথা কহিবার সময়ও ফ্লানেলে কনুইটা বাঁধা ছিল। আজ আট মাস বেদনা চলিতেছে।

বেলা এগারটা, সাধুরা বিদায় লইলেন। বাহির হইবার সময় শ্রীমর ঘরের পশ্চিম দেয়ালে ডিমে-তা-দেওয়া পাখীর একটি ছবি আছে—অন্তেবাসী স্বামী সৎস্বরূপানন্দকে উহা দেখাইয়া বলিলেন, এ-টি ঠাকুরের কথায় করান হয়েছিল শরীর যাওয়ার পর।

১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে আগস্ট দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর মণিকে বলিয়াছিলেন, যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে—সর্বদা আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যালফেলে, দেখলেই বোঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে—সব মনটা সেই ডিমের দিকে; উপরে নামমাত্র চেয়ে রয়েছে। আচ্ছা, আমায় সেই ছবি দেখাতে পার?

সাধুরা সকলে রাস্তায় চলিতেছেন আর ভাবিতেছেন—এমন মহাপুরুষেরও রোগের হাত হতে রক্ষা নাই। আর জগৎ স্বার্থপর, আমরাও স্বার্থপর। শ্রীম আমাদের দিলেন অমৃত। আর আমরা চলে এলাম বেদনার সময়! ঈশ্বর ও গুরুর ঋণ কি কেউ শোধ করতে পারে?

*বেলুড় মঠ।
১০ই মে ১৯৩২ খ্রীঃ, মঙ্গলবার,
বৈশাখ, শুক্লা পঞ্চমী, ১৩৩৮ সাল

॥ এই গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ ॥

শ্রীম-দর্শন (বাংলায় মূল গ্রন্থ)

প্রথম ভাগ	২০·০০	॥	দ্বিতীয় ভাগ	১৫·০০
তৃতীয় ভাগ	১৮·০০	॥	চতুর্থ ভাগ	১২·০০
পঞ্চম ভাগ	১২·০০	॥	ষষ্ঠ ভাগ	১২·০০
সপ্তম ভাগ	১৮·০০	॥	অষ্টম ভাগ	১৮·০০
নবম ভাগ	১২·০০	॥	দশম ভাগ	১২·০০
একাদশ ভাগ	৮·০০	॥	দ্বাদশ ভাগ	৮·০০
ত্রয়োদশ ভাগ	১২·০০	॥	চতুর্দশ ভাগ	১২·০০
পঞ্চদশ ভাগ	১৫·০০	॥	ষোড়শ ভাগ	৮·০০

শ্রীম-দর্শন (হিন্দী অনুবাদ)

এ-পর্যন্ত দুইটি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীম-দর্শন (ইংরাজি অনুবাদ)

M. The Apostle and the Evangelist.

এ পর্যন্ত দুইটি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।